

সাধারণ বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সাধারণ বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী

রচনা

ড. আ. খ. ম. শামসুদ্দোহা
ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া
ড. মোঃ আব্দুল ওহাব
জহুরুল ইসলাম খান
ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

সম্পাদনা

ড. আয়েশা খাতুন
ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম
নূরুনবী তালুকদার
ড. গাজী মো. আহসানুল কবির

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন
সুভাস চন্দ্র সুতার
কাজী সাইফুদ্দিন আব্বাস
শওকাতুজ্জামান

মানচিত্রাঙ্কন
গ্রাফোসম্যান
দি ম্যাপ্পা

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য :

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং পরিবেশের উপাদানগুলোর সহাবস্থানের উপযোগী রাখার বিষয়ে সচেতন থাকা। বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে ও নিজ হাতে কাজ করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দান করে। সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষাক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা করা যায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের এ সকল শাখার বিষয়বস্তুর তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক দক্ষতাগুলোও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্ছাদি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মো: মোস্তফা কামাল উদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	পদার্থের গঠন : অণু, পরমাণু	১
দ্বিতীয়	প্রতীক, সংকেত ও যোজনী	১১
তৃতীয়	রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ	২০
চতুর্থ	অম্ল, ক্ষারক ও লবণ	৩০
পঞ্চম	পানির খরতা	৪১
ষষ্ঠ	ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি	৪৯
সপ্তম	পরিমাপ	৫৯
অষ্টম	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ	৬৫
নবম	সরল যন্ত্র	৭১
দশম	তাপ	৮০
একাদশ	শব্দ	৯০
দ্বাদশ	আলোর প্রতিসরণ	৯৮
ত্রয়োদশ	বিদ্যুৎ	১০৫
চতুর্দশ	দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১১৭
পঞ্চদশ	উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান : ফল ও বীজ	১২৫
ষোড়শ	একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ : মরিচ গাছ	১৩৪
সপ্তদশ	জীব ও তার পরিবেশ	১৩৮
অষ্টাদশ	বন ও পরিবেশ	১৪৭
উনবিংশ	শক্তি, জীব ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৫৩
বিংশ	মেবুদভী প্রাণী : মুরগি	১৬০
একবিংশ	কোষ বিভাজন	১৭২
দ্বাবিংশ	মানব দেহ	১৭৭
ত্রয়োবিংশ	কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি	১৯৩
চতুর্বিংশ	পৃথিবীর আবর্তন : সময় ও ঋতু পরিবর্তন	২০৭
পঞ্চবিংশ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	২১৫
ষষ্ঠবিংশ	জনসংখ্যা ও পরিবেশ	২২২

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের গঠন : অণু, পরমাণু

পদার্থের গঠন

আমাদের এ পৃথিবীতে কত অজস্র কত বিচিত্র বস্তু রয়েছে। কিন্তু আসলে এ বৈচিত্র্যময় বস্তুরাশি মাত্র কয়েকটি মূল পদার্থ দ্বারা গঠিত। প্রাচীনকালে গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পানি, বায়ু এবং মাটি এ তিনটি মূল পদার্থ দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরাশি গঠিত। ভারতীয় দার্শনিকরা আগুন এবং আকাশকেও মূল পদার্থ বলে মনে করতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে আগুন বা আকাশ কোনটিই পদার্থ নয়, আবার পানি, বায়ু, মাটিও কোনো মূল পদার্থ নয়। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিস প্রমাণ করেন যে পানি কোনো মূল পদার্থ নয়, পানি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন নামক দুইটি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

তোমরা পূর্বেই পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার কথা জেনেছ। পদার্থ যে অবস্থায়ই অবস্থান করুক না কেন গঠন অনুসারে বিজ্ঞানীরা পদার্থকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন যথা- মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ কাকে বলে সে সম্পর্কে তোমরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছ। এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

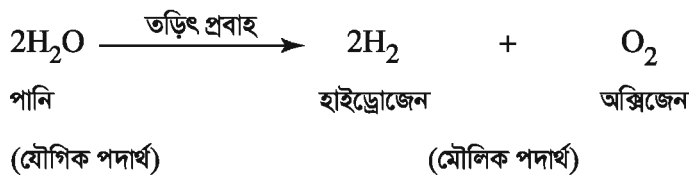
মৌলিক পদার্থ : যে পদার্থকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলে ঐ পদার্থ ছাড়া পৃথক ধর্ম বিশিষ্ট অন্য কোনো নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, গন্ধক, তামা, দস্তা, পারদ, সোনা, রূপা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১১১ টি। এর মধ্যে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় ৯২টি, অবশিষ্ট মৌলগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকাংশ মৌলিক পদার্থ কঠিন, পাঁচটি তরল এবং ১১টি গ্যাসীয়। লোহা, তামা, দস্তা, সোনা, রূপা, গন্ধক, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, কার্বন, ফসফরাস, সিলিকন ইত্যাদি কঠিন মৌল।

পারদ, ব্রোমিন, গ্যালিয়াম, সিজিয়াম, ও ফ্রান্সিয়াম তরল মৌল আবার হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন ও রেডন হল গ্যাসীয় মৌল।

যৌগিক পদার্থ : যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। অন্য কথায় ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। পানি, চিনি, সাবান, সোডা, লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের উদাহরণ। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা সীমিত হলেও যৌগিক পদার্থের সংখ্যার সীমা নেই। প্রতিদিন নতুন নতুন যৌগ তৈরি হচ্ছে। ফলে যৌগিক পদার্থের সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে।

উদাহরণ



অণু ও পরমাণু, মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের গঠন

প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক কণাদ এবং গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মনে প্রশ্ন জাগে এ পৃথিবীর অসংখ্য পদার্থ কীভাবে গঠিত? তারা বলেন, কোনো একটি পদার্থকে যদি বারবার খণ্ড খণ্ড করা যায় তাহলে এমন এক অবস্থায় আসে যে সেই ক্ষুদ্রতম পদার্থ খণ্ডকে আর খণ্ড করা যায় না। কণাদ এ ক্ষুদ্রতম পদার্থ কণার নাম দেন পরমাণু এবং ডেমোক্রিটাস এর নাম দেন অ্যাটম (Atom)। অ্যাটম শব্দের অর্থ অখণ্ডনীয়। অর্থাৎ যাকে আর ভাগ করা যায় না।

এর প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৃটেনের গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক জন ডালটন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এ পরমাণু বা অ্যাটমের নতুন ধারণা দেন। তিনি বলেন যে, প্রতিটি মৌলিক পদার্থ ঐ পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। মৌলের এরূপ ক্ষুদ্রতম কণাকে বলা হয় সেই মৌলের পরমাণু বা অ্যাটম। অর্থাৎ মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা সংশ্লিষ্ট পদার্থের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যাকে আরও ভাগ করা হলে ঐ পদার্থের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় তাকে পরমাণু (Atom) বলে।

পৃথিবীর সকল বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণু খুবই সূক্ষ্ম। অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও পরমাণু দেখা যায় না। দশ কোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে মাত্র আধ ইঞ্চি বা ১.২৫ সেন্টিমিটার এর মত লম্বা হয়। একশ এগারটি(১১১)মৌলে ১১১ রকম পরমাণু আছে। প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর নিজস্ব ওজন ও ধর্ম আছে। আবার একটি মৌলে যতগুলো পরমাণু আছে তাদের প্রত্যেকটি একই রকম। হাইড্রোজেন শুধু হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা, অক্সিজেন শুধু অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা এবং লোহা শুধু লোহার পরমাণু দ্বারা গঠিত। বিশেষ অবস্থায় পরমাণুকেও ভাগ করা সম্ভব। পরমাণুকে ভাঙলে পারমানবিক শক্তির উদ্ভব হয়। পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানী ডালটন যে মতবাদ দেন তা ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্বে তিনি বলেন :

(ক) মৌলিক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র অখণ্ডনীয় পরমাণু কণা দ্বারা গঠিত।

(খ) একই মৌলিক পদার্থের প্রতিটি পরমাণু প্রকৃতিতে, ধর্মে ও ভরে একরকম। তাই হাইড্রোজেনের প্রতিটি পরমাণু ভরে ও ধর্মে একরকম। তেমনি লোহার প্রতিটি পরমাণুও ভরে ও ধর্মে একই রকম।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু ধর্মে ও ভরে একটি অন্যটি থেকে আলাদা। তাই হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, সালফার, সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি মৌলের পরমাণু ধর্মে ও ভরে পরস্পর হতে ভিন্ন। এ জন্য সোনার সাথে রূপার বা হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের ধর্ম ও ভরের কোনো মিল নেই।

(ঘ) বিভিন্ন মৌলের পরমাণু অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যার সরল অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।

বিজ্ঞানী ডালটন প্রথম এ মতবাদ বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এটি ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অণু : বিজ্ঞানীদের মতে এ বিশ্বের সকল পদার্থই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বা কণার সমষ্টি। কোনো পদার্থকে ভাগ করতে করতে যদি এমন সূক্ষ্ম কণায় পৌঁছানো যায়, তাকে আরও ভাগ করলে ঐ পদার্থের অস্তিত্ব নষ্ট হয়, স্বাধীন অস্তিত্ব আর থাকে না, এ অবস্থায় পদার্থের এ ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলে।

যৌগ বা যৌগিক পদার্থের কণাগুলো কীভাবে গঠিত বিজ্ঞানী ডালটনের পক্ষে তা বলা সম্ভব হয়নি। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় মৌলগুলো প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে কী অবস্থায় থাকে সে সম্বন্ধে ডালটনের জীবিতকালেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। ১৮১১ সালে অ্যামেদেও অ্যাভোগ্যাড্রো নামে একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী বলেন যে, গ্যাসীয় মৌল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রকৃতিতে স্বাধীন পরমাণু রূপে থাকে না, থাকে দুটো পরমাণুর যুক্ত কণা রূপে। তিনি এরূপ কণার নাম দেন মলিকুল (Molecule) বা অণু। মলিকুল শব্দের অর্থ পুঞ্জ বা স্তূপ অর্থাৎ একাধিক পরমাণুর জোট। অর্থাৎ অণু হল একাধিক পরমাণুর জোট। অ্যাভোগ্যাড্রোর মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর তার এক ছাত্র ক্যানিজারো মলিকুল বা অণুর উক্ত ধারণাগুলোকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেন।

অণু সম্পর্কে উপর্যুক্ত ধারণাগুলোকে নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়-

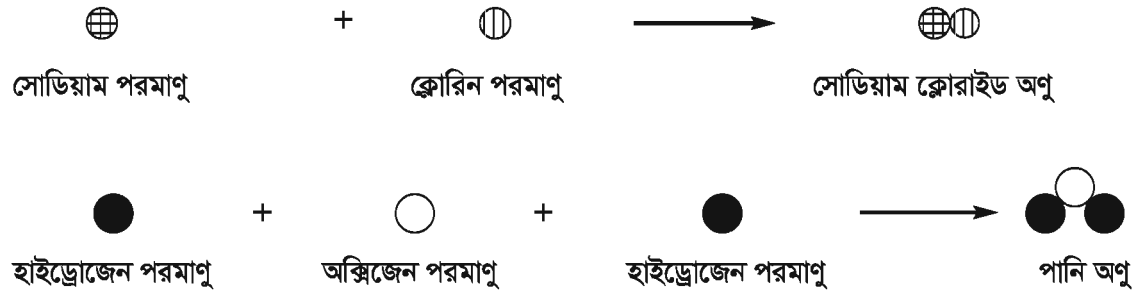
মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ঐ পদার্থের গুণাবলি বজায় রেখে স্বাধীনভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে তাকে অণু বলে। সাধারণত অণুতে একাধিক পরমাণু থাকে। দুই বা ততোধিক পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে অণু গঠিত হয়। অণু দুই প্রকার - মৌলিক অণু ও যৌগিক অণু।

(১) **মৌলিক বা মৌল অণু** : একই মৌলের দুইটি বা তার বেশি পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে যে অণু গঠন করে তাকে মৌলিক বা মৌল অণু বলে।



চিত্র ১.১ : মৌলিক অণু

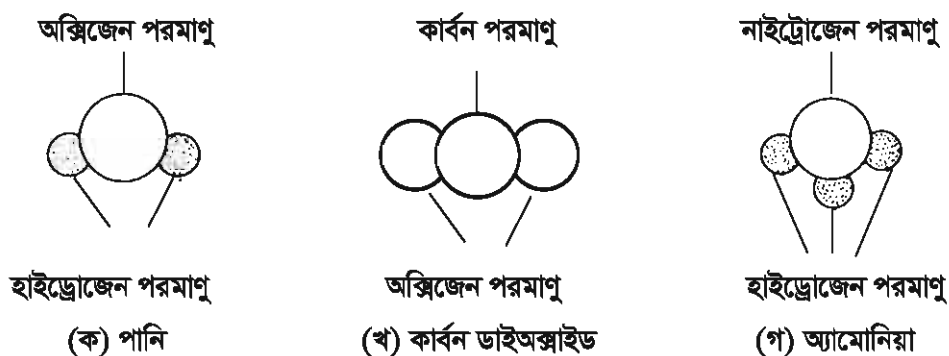
(২) **যৌগিক বা যৌগ অণু** : ভিন্নরকম বা ভিন্নধর্মী মৌলের দুইটি বা তার বেশি পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে যে অণু গঠন করে তাকে যৌগিক বা যৌগ অণু বলে।



চিত্র ১.২ : যৌগিক অণু

তবে পদার্থ মৌলিক হোক আর যৌগিক হোক প্রত্যেক পদার্থের অণু নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু নিয়েই গঠিত। প্রায় সবগুলো মৌলিক গ্যাস যেমন- হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতির অণুতেই দুইটি করে পরমাণু থাকে। কিন্তু হিলিয়াম, নিয়ন ও আরগন গ্যাসের প্রতি অণুতেই শুধু একটি করে পরমাণু আছে। আবার যৌগের অণু যেমন পানির অণু হাইড্রোজেনের দুইটি ও অক্সিজেনের একটি পরমাণু নিয়ে গঠিত। অতএব তোমরা বুঝতে পেরেছ যৌগ বা যৌগিক পদার্থ দুই বা ততোধিক মৌলের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত হয়। যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে ভাঙলে তা আর যৌগ থাকে না, যৌগ গঠনকারী মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণুতে ভাগ হয়ে যায়। পানির অণুকে ভাঙলে তা আর পানি থাকে না, পানির উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পানি যৌগিক অণুর উদাহরণ। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির অণু মৌলিক অণু কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু যৌগিক অণু। অক্সিজেনের অণু ভাঙলে শুধু অক্সিজেনের পরমাণু পাওয়া যায় কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু ভাঙলে কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণু পাওয়া যায়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু কার্বনের একটি পরমাণু অক্সিজেনের দুইটি পরমাণু নিয়ে গঠিত।



চিত্র ১.৩ : কয়েকটি যৌগিক অণু

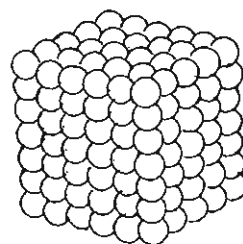
ছক ১.১ : অণু ও পরমাণুর পার্থক্য

পরমাণু	অণু
১। পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।	১। অণু মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা
২। সাধারণত পরমাণু স্বাধীনভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না, তবে কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। যেমন- হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি।	২। অণু স্বাধীনভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।
৩। পরমাণু সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	৩। সাধারণত : অণু সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে অণু পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়।
৪। বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর সংখ্যা সীমিত। এ পর্যন্ত ১১১ প্রকারের পরমাণু আবিষ্কৃত হয়েছে।	৪। পৃথিবীতে যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অসংখ্য বলে অণুর সংখ্যাও অসংখ্য।
৫। পরমাণুকে ভাঙলে ঐ মৌলের আর অস্তিত্ব থাকে না।	৫। অণুকে ভাঙলে একই বা ভিন্ন মৌলের পরমাণু পাওয়া যায়।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের গঠনে অণু ও পরমাণুর সমাবেশ

আমরা জানি যে আমাদের চারপাশে অগণিত পদার্থ রয়েছে। ভৌত অবস্থা ভেদে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা - কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

কঠিন পদার্থ : ইট, কাঠ, চেয়ার, টেবিল, কয়লা, পাথর, লোহা, বিভিন্ন প্রকার ধাতু ইত্যাদি কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ আকার বা আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি সব পদার্থই সেই পদার্থের অসংখ্য অণু নিয়ে গঠিত। কঠিন পদার্থের মধ্যে এ অণুগুলো পরস্পরের প্রচণ্ড



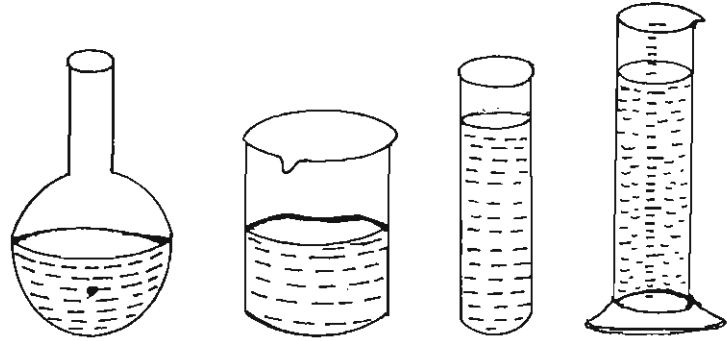
চিত্র ১.৪ : কঠিন পদার্থের অণু

আকর্ষণে একটা পিণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত কাছাকাছি নিবিড়ভাবে থাকে। এ অণুগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো ফাঁক থাকে না। তাই কঠিন পদার্থের উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়েও তার আকার বা আয়তনের পরিবর্তন করা যায় না।

তরল পদার্থ : তরল অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট আকার থাকে না। তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

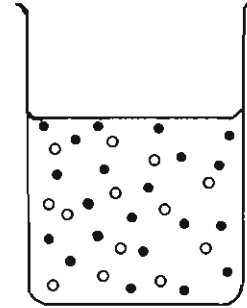
পরীক্ষা : একটি গোলতলী ফ্লাস্ক, একটি কাচের বিকার এবং একটি কাচের জার নাও এবং মাপ চোঙ দিয়ে মেপে প্রত্যেকটিতে ১০০ ml করে পানি নাও। যদিও সবগুলো পাত্রে সমপরিমাণ পানি নিয়েছে কিন্তু পানি এক একটি পাত্রে এক এক রকম আকারে দেখাচ্ছে।

অতএব যে পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার থাকে না, যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে তাকে তরল পদার্থ বলে। পানি, তেল, দুধ, পেট্রোল ইত্যাদি তরল পদার্থের উদাহরণ।



চিত্র ১.৫ : তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার নেই।

কঠিন পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থও অণুর জোঁট বা সমষ্টি নিয়ে গঠিত। কিন্তু এক্ষেত্রে কণাগুলো পরস্পরের সাথে শিথিলভাবে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ তরল পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ফাঁক থাকে। তাই তরল পদার্থের মধ্যে একটা ঢলঢলে ভাব দেখা যায়। সে জন্য তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে। কিন্তু এর আয়তন একই থাকে।

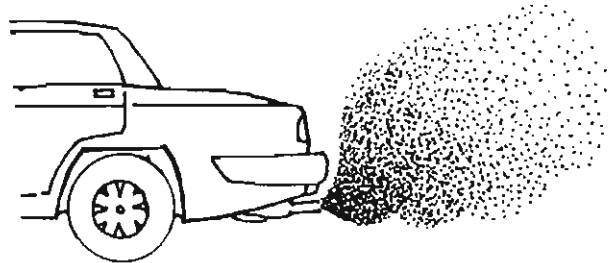


চিত্র ১.৬ : তরল পদার্থের অণুর অবস্থান

বায়বীয় পদার্থ : বায়বীয় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই। মুক্ত অবস্থায় রাখলে গ্যাস চারদিকে ছড়িয়ে যায়। বায়ু একটি গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থ। তাই বায়ু পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

যে পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই এবং যা মুক্ত অবস্থায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাকে গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থ বলে।

বায়বীয় পদার্থও অণুর সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এক্ষেত্রে অণুগুলো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অণুগুলো বেশ দূরে দূরে অবস্থান করে। ফলে অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি অতি সামান্য বলেই অণুগুলো



চিত্র ১.৭ : বায়বীয় পদার্থের অণুর অবস্থান

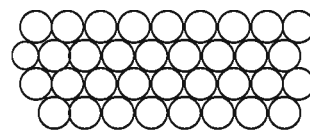
ছড়িয়ে পড়ে। সে জন্য গ্যাসীয় পদার্থ কোনো পাত্রে রেখে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। পাত্রের মুখ খুললে বা সামান্য ফাঁক থাকলে গ্যাস উড়ে যায়।

ছক ১.২ : কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য

কঠিন পদার্থ	তরল পদার্থ	বায়বীয় পদার্থ
কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে।	তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট আকার থাকে না।	বায়বীয় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন থাকে না।
কঠিন পদার্থের অণুগুলো পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে। অণুগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না।	তরল পদার্থের অণুগুলো পরস্পরের সাথে শিথিলভাবে সংযুক্ত থাকে এবং অণুর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি ফাঁক থাকে।	বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো পরস্পর দূরে দূরে অবস্থান করে।
কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে প্রবল আকর্ষণ থাকে।	অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ কঠিন পদার্থের তুলনায় কম থাকে।	বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ প্রায় নেই বললেই চলে।

আন্তঃআণবিক দূরত্ব

প্রত্যেক পদার্থের অণুর বিশেষ আকার আছে। পদার্থ মাত্রই অনেকগুলো অণুর সমষ্টি। পদার্থের মধ্যে অণুগুলো একত্রে পাশাপাশি থাকে। অণুগুলো একত্রে পাশাপাশি থাকার কারণে এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। যেমন, ছোট ছোট অনেকগুলো মার্বেল একত্রে স্তূপীকৃত করলে তাদের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে। দুইটি অণুর মধ্যবর্তী এ দূরত্বকে আন্তঃআণবিক দূরত্ব বলে।



চিত্র ১.৮ : কঠিন পদার্থের অণুর সমাবেশ

আন্তঃআণবিক দূরত্ব আছে বলেই কাঠের মধ্যে পেরেক ঢুকানো যায়। এতে কাঠের অণুগুলো পরস্পরের আরও কাছে আসে। ফলে আন্তঃআণবিক দূরত্ব কমে যায়। এ কারণে পদার্থের আয়তন কমে যায়। আবার চাপ কমালে আন্তঃ আণবিক দূরত্ব বেড়ে যায় ফলে আয়তন বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে পদার্থকে তাপ দিলে অণুগুলো গতিপ্রাপ্ত হয় এবং অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক দূরত্ব বেড়ে যায়। সে জন্য তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের আয়তন বাড়ে। আবার তাপ কমালে বা ঠান্ডা করলে আন্তঃআণবিক দূরত্ব কমে যাওয়ায় পদার্থের আয়তনও কমে।

আন্তঃআণবিক শক্তি

পরীক্ষা-১ : একটি বিকারে সামান্য পরিমাণ কপার সালফেট এর গুঁড়া বা ভুঁতে নাও এবং খুব সাবধানে বিকারটিতে পানি ভর্তি কর। এরপর বিকারটি নাড়াচাড়া না করে টেবিলের উপর রেখে দাও।

পরীক্ষা-২ : একটি আতর বা সেন্টের শিশির মুখ খুলে টেবিলের উপর কিছুক্ষণ রেখে দাও।

উপরের পরীক্ষা দুটোতে কী লক্ষ করছ। বিকারে পানির কী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? বিকারের সব জায়গায় পানির রং কি একই রকম? ভালভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে বিকারে পানি কিছুটা নীল রং ধারণ করেছে এবং বিকারের তলায় যেখানে ভুঁতের গুঁড়া ছিল তার আশপাশে নীল রং অনেক বেশি।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতে সেন্টের শিশির মুখ খোলার পর প্রথমে শিশির নিকটের শিক্ষার্থীরা গন্ধ পেয়েছিল এবং তারপর ক্রমান্বয়ে সমস্ত শ্রেণীকক্ষে সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা জানি তুঁতের গুড়া, আতর, সেন্ট সবই অণু দিয়ে গঠিত। সেন্টের অণু বাতাসে এবং তুঁতের অণু পানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করতে পারার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। পদার্থের অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে এক আকর্ষণ শক্তি কাজ করে। আর তাই অণুগুলো একে অন্যের কাছে থেকে দূরে সরে না গিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। অণুগুলোর একের প্রতি অন্যের এ আকর্ষণ শক্তিকে আন্তঃআণবিক শক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ শক্তি আছে যার ফলে অণুগুলো একে অন্যের সাথে পরস্পর নিবিড়ভাবে সংঘবদ্ধ থাকে। আবার অণুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি স্বাভাবিক বিকর্ষণ প্রবণতাও আছে। অণুগুলোর এ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মিলিত শক্তিকে আন্তঃআণবিক শক্তি বলে।

কঠিন পদার্থের আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে বেশি। এ জন্যই অণুগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং নড়াচড়া করলেও স্থানান্তরিত হতে পারে না। নিজের জায়গা থেকেই অনবরত কাঁপতে থাকে। এ কারণে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে। তরল পদার্থের আন্তঃআণবিক শক্তি কঠিন পদার্থের তুলনায় কিছুটা কম সে জন্য অণুগুলো কিছুটা দূরে অবস্থান করে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। এ কারণে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও নির্দিষ্ট আকার নেই।

বায়বীয় পদার্থের আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে কম। সে জন্যই অণুগুলো বেশ দূরে দূরে অবস্থান করে এবং কোনো আবদ্ধ পাত্রে না রাখলে স্থানান্তরিত হয়ে চলে যেতে পারে। এ জন্যই গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই। সামান্য পরিমাণ গ্যাস একটি বড় পাত্রে রাখলে তা সমস্ত পাত্রে ছড়িয়ে পড়ে পাত্রটিকে ভরে ফেলে। এ নগণ্য আন্তঃআণবিক শক্তির কারণেই সেন্টের শিশি থেকে সুগন্ধ বহনকারী অণুগুলো প্রথমে শিশির নিকটের শিক্ষার্থীদের তারপর দূরের শিক্ষার্থীদের নাকে পৌঁছে ছিল।

তাপের প্রভাবে অণুর গতির পরিবর্তন এবং পদার্থের অবস্থান পরিবর্তন

আমরা জানি প্রকৃতিতে যে পদার্থগুলো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় তাপ বাড়িয়ে বা কমিয়ে সেই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। কঠিন বরফ একটু তাপেই গলে তরল পানিতে পরিণত হয়। তরল পানিকে তাপ দিলে গ্যাসীয় অবস্থায় জলীয় বাষ্প পরিণত হয়। আবার জলীয় বাষ্পকে শীতল করলে তরল পানিতে এবং তরল পানিকে আরও শীতল করলে কঠিন বরফে পরিণত হয়। এভাবে তাপের পরিবর্তনের ফলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

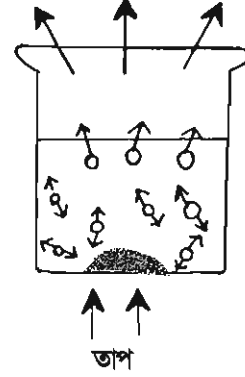


স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের অণুগুলো নিজের জায়গায় থেকেই অনবরত কাঁপতে থাকে। তাপ প্রয়োগ করলে অতিরিক্ত শক্তি লাভের ফলে অণুর কম্পন বেড়ে যায় ফলে অণুগুলো পরস্পর হতে একটু দূরে সরে যায়। আরও বেশি তাপ প্রয়োগ করলে পরস্পরের মধ্যকার দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। ফলে আন্তঃআণবিক শক্তি কমে যায়। এতে অণুগুলো বেশ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। এ অবস্থায় পদার্থ কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত হয়। এর পরে আরও তাপ

প্রয়োগ করলে অণুগুলো এত দ্রুতগতিতে চলাচল করে যে কিছু অণু আন্তঃআণবিক শক্তিকে পরাভূত করে তরল পদার্থের অন্যান্য অণুকে ছেড়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে পদার্থ তরল থেকে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

বিপরীতভাবে বায়বীয় পদার্থকে ঠান্ডা করলে অণুর গতি কমে যায় এবং অণুগুলো পরস্পরের কিছুটা কাছে আসে। ফলে আন্তঃআণবিক শক্তি বেড়ে যায় এবং আন্তঃআণবিক দূরত্বও কমে যায়। আরও ঠান্ডা করলে আন্তঃআণবিক শক্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়ে গ্যাসীয় পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। আবার তরল পদার্থকে ঠান্ডা করলে অণুগুলো পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসে এবং অণুগুলোর মধ্যকার দূরত্ব একেবারেই কমে

যায়। অণুগুলোর গতিও কমে যায়। অণুগুলো পরস্পরের কাছাকাছি আসে বলে আন্তঃআণবিক শক্তি বেড়ে যায়। তরল পদার্থ অবশেষে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এভাবে তাপের প্রভাবে পদার্থের গতি ও পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।



চিত্র ১.৯ : কঠিন পদার্থের অণুর সমাবেশ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- কাঠে পেরেক ঠুকানো সহজ কেন?
 - অণুর মধ্যে ফাঁক থাকার কারণে
 - অণুর আকর্ষণ শক্তির কারণে
 - অণুর দ্রুত কম্পনের কারণে
 - আন্তঃআণবিক শক্তির কারণে
- কোন পদার্থের আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে কম?
 - লোহা
 - পানি
 - বাতাস
 - বরফ
- পদার্থ তিন অবস্থায় রূপান্তরের কারণ কী?
 - তাপের প্রভাব
 - অণুর বিন্যাস
 - পরমাণুর বিন্যাস
 - রাসায়নিক পরিবর্তন
- গরমের দিনে সাইকেলের চাকা অনেক সময় ফেটে যায়, কারণ-
 - চাকার রবারের আয়তন বেড়ে যায়
 - আগের তুলনায় ভেতরের বায়ুর অণুর সংখ্যা বেড়ে যায়
 - ভেতরের বায়ুর অণুগুলো তাপের প্রভাবে দ্রুত চলাচল করে ও চাকার গায়ে জোরে ধাক্কা দেয়
 - ভেতরের বায়ুর অণুগুলো ভারী হয়ে যায়
- যখন মুখ বম্ব টিনের কৌটার মধ্যকার জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করে পানিতে পরিণত করা হয় তখন কোনটি ঘটে?
 - অণুগুলোর গতি বেড়ে যায়
 - অণুর সংখ্যা কমে যায়
 - অণুগুলোর গতি হ্রাস পায়
 - কৌটার ওজন বেড়ে যায়

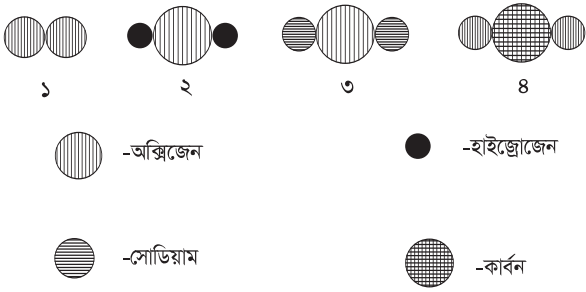
৬. একটি গ্যাসীয় পদার্থে চাপ প্রদান করে ঠান্ডা করা হলে যা ঘটবে-

- তরলে পরিণত হবে এবং আন্তঃআণবিক শক্তি কমে যাবে
- তরলে পরিণত হবে এবং আন্তঃআণবিক শক্তি বেড়ে যাবে
- তরলে পরিণত হবে এবং আন্তঃআণবিক দূরত্ব কমে যাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রের আলোকে ৭, ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



৭. উপরের চিত্রের কোনটি মৌলিক অণু ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. ১ | খ. ৩ |
| গ. ১ ও ৪ | ঘ. ২ ও ৩ |

৮. কোন অণু ধাতু ও অধাতুর সমন্বয়ে গঠিত ?

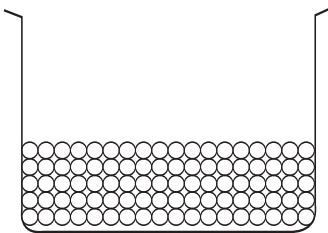
- | | |
|------|----------|
| ক. ২ | খ. ৩ |
| গ. ৪ | ঘ. ৩ ও ৪ |

৯. কোন যৌগ অধাতু ও অধাতুর সমন্বয়ে গঠিত ?

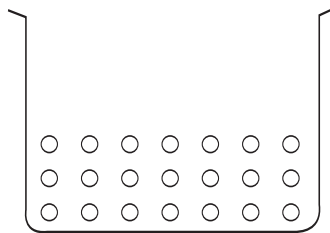
- | | |
|----------|----------|
| ক. ১ | খ. ৪ |
| গ. ২ ও ৩ | ঘ. ২ ও ৪ |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

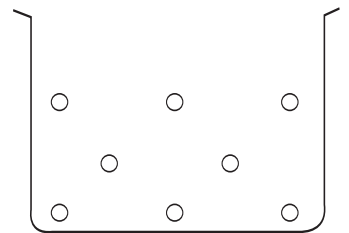
১.



১ নং-



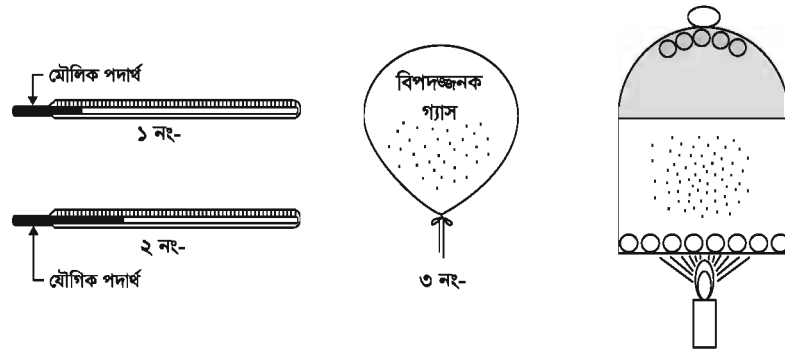
২ নং-



৩ নং-

- ক. কোন পাত্রের পদার্থের আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে কম ও আন্তঃআণবিক দূরত্ব সবচেয়ে বেশি?
- খ. ২নং পাত্রের পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
- গ. ১নং পাত্রের মুখ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাপ প্রয়োগ করা হলে কী ঘটবে বর্ণনা কর।
- ঘ. প্রতিটি পাত্রে চাপ প্রয়োগ করলে পদার্থগুলোর অবস্থার কী পরিবর্তন হবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২.



কক্ষ তাপমাত্রায় অধিকাংশ ধাতু কঠিন এবং অধাতু গ্যাসীয়। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

- ক. ১নং থার্মোমিটারে ব্যবহৃত তরলটি ধাতু না অধাতু?
- খ. ৩নং চিত্রের বেলুনটিকে ছেড়ে দিলে তা আকাশে উড়ে যাবে, এটা বিপদজ্জনক কেন, ব্যাখ্যা কর।
- গ. ২নং চিত্রের পদার্থটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।
- ঘ. চিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী মৌলিক পদার্থগুলোর ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতীক, সংকেত ও যোজনী

প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে গঠন অনুসারে পৃথিবীর সকল পদার্থকে মৌলিক ও যৌগিক এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এ পর্যন্ত মোট মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কত মনে পড়ে কি? হ্যাঁ, ১১০টি। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম পরমাণু বা অ্যাটম। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে তার নাম অণু। একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে অণু গঠিত। এ অধ্যায়ে আমরা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রতীক, সংকেত এবং যোজনী সম্বন্ধে জানবো।

প্রতীক

রসায়নবিদগণ মৌলের নামকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এ পদ্ধতিতে কোনো মৌলের পুরো নাম না লিখে ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের একটি বা দুইটি অক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে মৌলটিকে প্রকাশ করা হয়। মৌলের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলা হয়। যেমন হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N) ইত্যাদি।

প্রতীক লেখার নিয়ম

১। সাধারণত মৌলিক পদার্থের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরটিকে বড় হরফে লিখে মৌলটির প্রতীকরূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন-

ছক ২.১ : মৌলের প্রতীক

ইংরেজি নাম		প্রতীক	ইংরেজি নাম		প্রতীক
হাইড্রোজেন	(Hydrogen)	H	সালফার	(Sulphur)	S
অক্সিজেন	(Oxygen)	O	বোরন	(Boron)	B
নাইট্রোজেন	(Nitrogen)	N	ফসফরাস	(Phosphorus)	P
কার্বন	(Carbon)	C	ইউরেনিয়াম	(Uranium)	U
ফ্লোরিন	(Flourine)	F	আয়োডিন	(Iodine)	I

২। দুই বা ততোধিক মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর একই হলে এগুলোর মধ্যে একটি মৌলের প্রতীক নামের প্রথম অক্ষরটি দিয়ে সূচিত করে অপর মৌলগুলোর জন্য প্রথম অক্ষরের সাথে উচ্চারণ ধ্বনিতো অপর যে অক্ষরটি

প্রাধান্য পায় তাকে ছোট হরফে যোগ করে প্রতীক চিহ্ন লেখা হয়। যেমন-

ছক ২.২ : বিভিন্ন মৌলের প্রতীক

মৌলের ইংরেজি নাম		প্রতীক	মৌলের ইংরেজি নাম		প্রতীক
কার্বন	(Carbon)	C	বোরন	(Boron)	B
ক্যালসিয়াম	(Calcium)	Ca	বেরিয়াম	(Barium)	Ba
কোবাল্ট	(Cobalt)	Co	বিসমথ	(Bismuth)	Bi
ক্যাডমিয়াম	(Cadmium)	Cd	ব্রোমিন	(Bromin)	Br
ক্লোরিন	(Chlorine)	Cl	বেরিলিয়াম	(Beryllium)	Be

৩। কতগুলো মৌলের প্রতীক মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষর বা প্রথম দুই অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়, কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন-

ছক ২.৩ : বিভিন্ন মৌলের প্রতীক

ইংরেজী নাম/ ল্যাটিন নাম		প্রতীক	ইংরেজী নাম/ ল্যাটিন নাম		প্রতীক
সোডিয়াম	(Sodium) Natrium	Na	সিলভার	(Silver) Argentum	Ag
পটাসিয়াম	(Potassium) Kalium	K	লেড	(Lead) Plumbum	Pb
কপার	(Copper) Cuprum	Cu	টিন	(Tin) Stannum	Sn
আয়রন	(Iron) Ferrum	Fe	মার্কারী	(Mercury) Hydrargyrum	Hg
গোল্ড	(Gold) Aurum	Au			

প্রতীকের তাৎপর্য

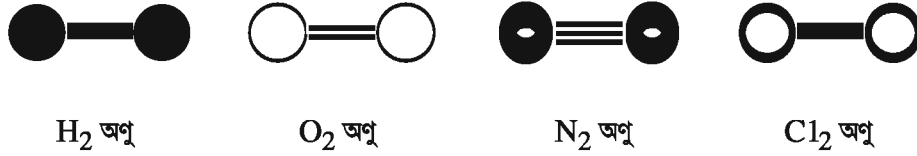
- (১) মৌলের প্রতীক মৌলিক পদার্থটির নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করে। যেমন- হাইড্রোজেন H, অক্সিজেন O, সোডিয়াম Na দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- (২) মৌলের প্রতীক মৌলের একটি পরমাণুকে নির্দেশ করে যেমন- হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর পরিবর্তে H লেখা হয়। সেভাবে অক্সিজেনের একটি পরমাণুকে O, কার্বনের একটি পরমাণুকে C, সোডিয়ামের একটি পরমাণুকে Na ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- (৩) কোনো মৌলের প্রতীক ঐ মৌলের পারমাণবিক ভর প্রকাশ করে। যেমন- H দ্বারা ১ ভাগ ভরের হাইড্রোজেন এবং O দ্বারা ১৬ ভাগ ভরের অক্সিজেনকে প্রকাশ করা হয়।

সংকেত

কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুর সংক্ষিপ্তরূপকে সংকেত বলা হয়। অর্থাৎ কোনো পদার্থের অণুতে কী কী মৌল আছে এবং প্রতিটি মৌলের কতটি পরমাণু আছে তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে ঐ পদার্থটির সংকেত বলে।

মৌলিক পদার্থের সংকেত

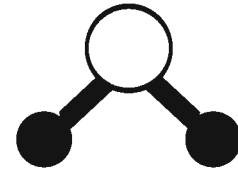
মৌলিক পদার্থের সংকেত লেখার সময় মৌলের প্রতীকের ডানদিকে একটু নিচে মৌলটির একটি অণুতে যে কয়টি পরমাণু আছে সেই সংখ্যাটি লিখে মৌলের সংকেত প্রকাশ করা হয়। যেমন- হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরিন এর প্রত্যেকটি অণুতে দুইটি করে পরমাণু আছে। অতএব এগুলোর সংকেত হল H_2 , O_2 , N_2 , Cl_2 । ওজোন, সালফার ও ফসফরাসের অণুর সংকেত যথাক্রমে O_3 , S_6 ও P_4 । আবার সোডিয়াম, পটাসিয়াম, কপার, হিলিয়াম, আর্গন প্রভৃতি মৌলের অণু ১টি করে পরমাণু দিয়ে গঠিত। তাদের সংকেত যথাক্রমে Na, K, Cu, He ও Ar। আবার অসংযুক্ত ও পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন কোনো মৌলের সংকেত প্রকাশ করতে হলে ঐ মৌলের প্রতীকের বাম পাশে পরমাণুর মোট সংখ্যা চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন- $2H$ দ্বারা দুইটি অসংযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু বুঝায় কিন্তু H_2 দ্বারা হাইড্রোজেনের একটি অণু এর দুইটি পরমাণু দ্বারা গঠিত বুঝায়।



চিত্র ২.১ : (ক) হাইড্রোজেন অণু (খ) অক্সিজেন অণু (গ) নাইট্রোজেন অণু (ঘ) ক্লোরিন অণু

যৌগিক পদার্থের সংকেত

যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। অতএব এ অণুর মধ্যে পরমাণুগুলো এক রকমের নয়। যে যে মৌলের পরমাণু নিয়ে যৌগিক অণু গঠিত সেগুলোর প্রতীক পাশাপাশি লিখে প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সেই প্রতীকের ডানে একটু নিচে লিখে যৌগের সংকেত সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। যেমন, পানির একটি অণু হাইড্রোজেনের ২টি ও অক্সিজেনের ১ টি পরমাণু নিয়ে গঠিত; সুতরাং পানির অণুর সংকেত H_2O । যৌগের অণুতে কোনো মৌলের ১টি পরমাণু থাকলে ঐ পরমাণুর প্রতীকের পাশে সংখ্যা চিহ্ন ১ লেখা হয় না। কারণ প্রতীক দ্বারা ১টি পরমাণু বুঝায়। তাই পানির অণুর সংকেত লেখার সময় অক্সিজেন প্রতীকের ডান পাশে এর পরমাণু সংখ্যাটি লেখা হয়নি।



চিত্র ২.২ : পানির অণু

যৌগিক পদার্থের নাম

কার্বন ডাইঅক্সাইড

অ্যামোনিয়া

সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাবার লবণ)

জিঙ্ক অক্সাইড

ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথর

অণুর সংকেত

CO_2

NH_3

$NaCl$

ZnO

$CaCO_3$

এবার উপরের সংকেতগুলো দেখে বলতো কোন মৌলের কতটি পরমাণু নিয়ে প্রতিটি যৌগ অণু গঠিত ?

সংকেতের তাৎপর্য : সংকেত থেকে পদার্থের গুণগত ও পরিমাণগত কয়েকটি তথ্য জানা যায়। যেমন-

গুণগত তথ্য

- সংকেত দ্বারা পদার্থটি কী তা বুঝা যায় যেমন- H_2O দ্বারা পানি বুঝা যায়।
- সংকেত দ্বারা পদার্থটি কী কী মৌলের পরমাণু নিয়ে গঠিত তা জানা যায়। যেমন, $NaCl$ দ্বারা বুঝা যায় যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ও ক্লোরিন মৌল দ্বারা গঠিত।

পরিমাণগত তথ্য

- সংকেত পদার্থের একটি অণুকে বুঝায়। যেমন- $NaCl$ দ্বারা সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি অণুকে বুঝায়।
- প্রতিটি মৌলের কোনটির কতটি পরমাণু নিয়ে পদার্থের অণুটি গঠিত তা সংকেত থেকে বুঝা যায়। যেমন, CO_2 দ্বারা বুঝা যায় যে, কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু একটি কার্বন ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।
- সংকেত দ্বারা পদার্থটির আণবিক ভর বুঝায়। আবার ঐ ভরের মধ্যে উপাদান মৌলগুলোর আপেক্ষিক ভরের অনুপাত কত তাও জানা যায়। CO_2 থেকে জানা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক ভর, $12 + (16 \times 2) = 44$ । এ ভরের মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত ১২: ৩২ বা ৩:৮।

ছক ২.৪ : প্রতীক ও সংকেতের পার্থক্য

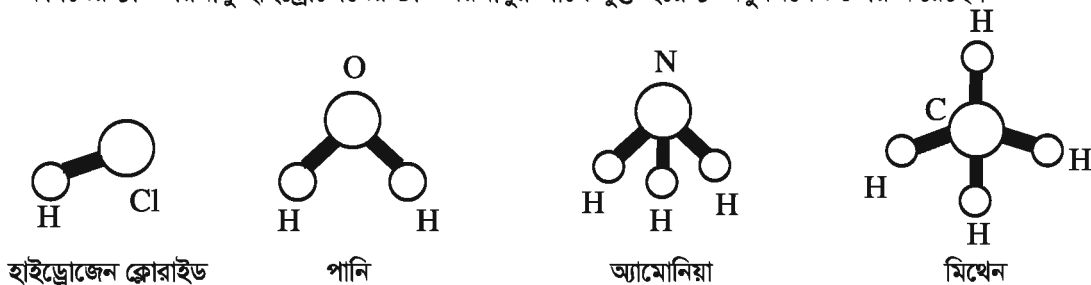
প্রতীক	সংকেত
১। মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ পায়।	১। মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ সংকেত দ্বারা প্রকাশ পায়।
২। প্রতীক মৌলের একটি পরমাণুকে নির্দেশ করে।	২। সংকেত পদার্থের একটি অণুকে নির্দেশ করে।
৩। মৌলের প্রতীক ঐ মৌলের পারমাণবিক ভরকে প্রকাশ করে।	৩। সংকেত দ্বারা পদার্থের আণবিক ভর প্রকাশ পায়।
৪। প্রতীকে কেবলমাত্র একটি মৌলের পরমাণু থাকে।	৪। কী কী মৌলের কতটি পরমাণু নিয়ে পদার্থের অণুটি গঠিত হয় তা সংকেত দ্বারা বোঝা যায়।

যোজনীর ধারণা

আমরা জানি দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণুতে পরমাণুগুলো রাসায়নিক আসক্তি দ্বারা সংযুক্ত থাকে। পরমাণুগুলোর এ সংযুক্তি বিশৃঙ্খলভাবে ঘটে না বরং একটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। যখন দুই বা ততোধিক মৌল যুক্ত হয়ে একটি যৌগ গঠন করে তখন দেখা যায় একটি মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু অপর মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যৌগটির অণু সৃষ্টি করেছে। যেমন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত HCl , পানির সংকেত H_2O , অ্যামোনিয়ার সংকেত NH_3 এবং মিথেনের সংকেত CH_4 । এখন কথা হল এগুলোর সংকেত এমনটি হল কেন? এর উত্তরে দেখা যায় :

- ১। ক্লোরিনের ১টি পরমাণু হাইড্রোজেনের ১টি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ১ অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করেছে।

- ২। অক্সিজেনের ১টি পরমাণু হাইড্রোজেনের ২টি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ১ অণু পানি উৎপন্ন করেছে।
 ৩। নাইট্রোজেনের ১টি পরমাণু হাইড্রোজেনের ৩টি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ১ অণু অ্যামোনিয়া তৈরি করেছে।
 ৪। কার্বনের ১টি পরমাণু হাইড্রোজেনের ৪টি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ১ অণু মিথেন তৈরি করেছে।



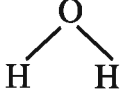
চিত্র ২.৩ : বিভিন্ন অণুর বল ও কাঠি মডেল

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ক্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য বা ক্ষমতা এক নয়। কোনোটির বেশি আবার কোনোটির কম। এক পরমাণু ক্লোরিন এক পরমাণু হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা উভয়ের সমান অর্থাৎ ১। পানির ক্ষেত্রে এক পরমাণু অক্সিজেন দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ অক্সিজেনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা হাইড্রোজেনের ২ গুণ। অনুরূপভাবে অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা হাইড্রোজেনের ৩ গুণ এবং মিথেনে কার্বনের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা হাইড্রোজেনের ৪ গুণ। একটি মৌলের অন্য মৌলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সামর্থ্যকে যোজ্যতা বলে। কোনো মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেনের পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় অথবা যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারিত করে সেই সংখ্যা দ্বারা ঐ মৌলের যোজ্যতা প্রকাশ করা হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর যোজ্যতাকে একক বা ১ ধরে অন্যান্য মৌলের যোজ্যতা নিরূপণ করা হয়।

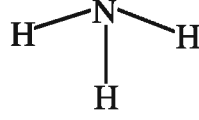
উপরের উদাহরণগুলোতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে ক্লোরিনের যোজ্যতা ১, পানিতে অক্সিজেনের যোজ্যতা ২, অ্যামোনিয়ায় নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ৩ এবং মিথেনে কার্বনের যোজ্যতা ৪। কোনো মৌলের যোজ্যতার পরিমাণ হল ঐ মৌলের একটি পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় অথবা কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুকে কোনো যৌগ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। মৌলের যোজ্যতা নির্ণয়ে হাইড্রোজেনের যোজ্যতাকে একক ধরা হয়। এর কারণ হল হাইড্রোজেনের যোজ্যতা সবচেয়ে কম। অর্থাৎ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অন্য কোনো মৌলের একাধিক পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে না [শুধুমাত্র হাইড্রোজয়িক এসিড (N_3H) ছাড়া]।

যৌগের সংকেত লেখার সময় আমাদেরকে মৌলের যোজনী সংখ্যা সম্পর্কে ভাবতে হবে। মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। মৌলিক পদার্থের যোজনীকে আমরা এক একটি হাত বা আংটার সাথে তুলনা করতে পারি। যে মৌলের একটি হাত তার যোজনী হবে এক। তাই এক হাত বিশিষ্ট মৌলের একটি পরমাণু অপর কোনো এক হাত বিশিষ্ট একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হবে। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়েই এক হাত বিশিষ্ট মৌল। অর্থাৎ উভয়ের যোজনী এক। তাই এদেরকে আমরা যথাক্রমে এভাবে লিখতে পারি HCl । হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত HCl । অক্সিজেনের যোজনী ২ অর্থাৎ অক্সিজেনের একটি পরমাণুর দুইটি হাত আছে। এ দুইটি হাত দিয়ে অক্সিজেন এক যোজী বা এক হাত বিশিষ্ট দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ধরতে পারে।

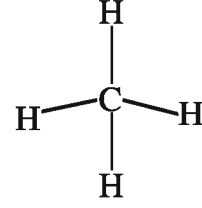
পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের অণুকে নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে।



পানির অণু (H_2O)



অ্যামোনিয়ার অণু (NH_3)



মিথেন অণু (CH_4)

কোনো যৌগ গঠনের সময় সাধারণভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মৌলের সবগুলো হাত বা যোজনী কাজে লাগে।

ছক ২.৫ : কয়েকটি মৌল ও যৌগমূলকের যোজনী

	যোজনী - ১	যোজনী - ২	যোজনী - ৩	যোজনী - ৪
অধাতু (মৌল)	হাইড্রোজেন (H) ফ্লোরিন (F) ক্লোরিন (Cl) ব্রোমিন (Br) আয়োডিন (I)	অক্সিজেন (O) সালফার (S) কার্বন (C)	নাইট্রোজেন (N) ফসফরাস (P)	কার্বন (C) সালফার (S)
ধাতু (মৌল)	সোডিয়াম (Na) পটাশিয়াম (K) কপার (Cu) (আস) সিলভার (Ag) গোল্ড (Au) (আস)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ক্যালসিয়াম (Ca) আয়রন (Fe) (আস) কপার (ইক) জিঙ্ক (Zn) টিন (Sn) লেড (Pb)	অ্যালুমিনিয়াম (Al) আয়রন (Fe) (ইক) গোল্ড (ইক)	টিন (Sn) লেড (Pb)
যৌগমূলক	অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) হাইড্রক্সিল (OH^-) নাইট্রাইট (NO_2^-) নাইট্রেট (NO_3^-) হাইড্রোজেন কার্বনেট (HCO_3^-)	কার্বনেট (CO_3^{2-}) সালফাইট (SO_3^{2-}) সালফেট (SO_4^{2-})	ফসফেট (PO_4^{3-})	

উপরের ছক দেখে বল ক্যালসিয়ামের যোজনী কত? ক্যালসিয়ামের কয়টা হাত থাকবে? ক্লোরিন পরমাণুর যোজনী কত? ক্যালসিয়ামের যোজনী ২, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম পরমাণুর ২টা হাত থাকবে। ক্লোরিন পরমাণু ১ যোজনী। ক্যালসিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গঠিত দ্রব্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কী হবে?

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হবে, $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ / \quad \backslash \\ \text{Ca} \\ \backslash \quad / \\ \text{Cl} \end{array}$ বা CaCl_2

ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন উভয়ের যোজনী ২। তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সংকেতটি হবে $\text{Ca}=\text{O}$ বা CaO , কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত CO_2 । এ সংকেত থেকে কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হাতের সাহায্যে দেখিয়ে তাদের যোজনী বের করতে পারবে কি? হ্যাঁ এটাকে এভাবে দেখানো যায়, $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ বা CO_2 । এখানে কার্বনের যোজনী ৪ এবং অক্সিজেনের যোজনী ২।

অনেক সময় একাধিক পরমাণু মিলে একটি পরমাণু গুচ্ছ গঠন করে এবং ঐ পরমাণু গুচ্ছ একটি পরমাণুর মত আচরণ করে। তোমরা সালফিউরিক এসিড H_2SO_4 , কপার সালফেট CuSO_4 , ক্যালসিয়াম কার্বনেট CaCO_3 এবং নাইট্রিক এসিড HNO_3 এর কথা শুনে থাকবে। এ সব পদার্থের SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , NO_3^- ইত্যাদি পরমাণু গুচ্ছ স্বাধীনভাবে থাকে না। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ন্যায় যৌগ গঠনে অংশ নেয়। এ জাতীয় পরমাণু গুচ্ছকে যৌগমূলক বা র‍্যাডিকেল বলে।

সালফেট SO_4^{2-} , কার্বনেট CO_3^{2-} , নাইট্রেট NO_3^- ইত্যাদি যৌগমূলকের উদাহরণ। সালফেট মূলকের যোজনী ২, কার্বনেট মূলকের যোজনী ২ এবং নাইট্রেট মূলকের যোজনী ১। অর্থাৎ সালফেট এবং কার্বনেট মূলকের দুইটি করে হাত এবং নাইট্রেট মূলকের ১টি হাত আছে।

হাইড্রোজেন সালফেট বা সালফিউরিক এসিডের সংকেত,

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagdown \\ \text{SO}_4 \\ \diagup \\ \text{H} \end{array} \text{ বা } \text{H}_2\text{SO}_4$$

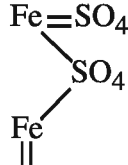
অনুরূপভাবে কপার সালফেটের সংকেত, $\text{Cu}=\text{SO}_4$ বা CuSO_4 ।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট যৌগে ক্যালসিয়ামের যোজনী ২ এবং কার্বনেটের যোজনী ২। অতএব ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সংকেত হবে $\text{Ca}=\text{CO}_3$ বা CaCO_3 ।

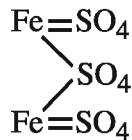
আয়রন (III) সালফেটে আয়রনের যোজনী ৩। তাহলে আয়রন (III) সালফেটের সংকেত কী হবে? $\text{Fe}=\text{SO}_4$ লিখলে আয়রনের একটি হাত খালি থেকে যায়। যৌগ গঠনের সময় কোনো হাত খালি থাকলে চলবে না। তাহলে কী হবে? আরও একটি সালফেট মূলক যৌগ দিলে সংকেতটি হবে :



এক্ষেত্রে SO_4 যৌগমূলকের একটি হাত ফাঁকা থেকে যায়। যদি আর একটি আয়রন (III) পরমাণু এতে যোগ করা হয় তাহলে এর সংকেত হবে



এখানেও আয়রন (III) পরমাণুর দুইটি হাত খালি থেকে যায়। তাহলে এবারে আরও একটি সালফেট মূলক যৌগ করে তার সংকেত লেখা যায়।



এবারে আয়রন(III) পরমাণু এবং SO_4 যৌগমূলকের কোনো হাত খালি নেই। অতএব আয়রন(III) সালফেট যৌগের সংকেত $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ।

এ অধ্যায়ে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড CaCl_2 , ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO , পানি H_2O , হাইড্রোক্লোরিক এসিড HCl , সালফিউরিক এসিড H_2SO_4 , নাইট্রিক এসিড HNO_3 , কপার সালফেট CuSO_4 , আয়রন(III) সালফেট $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ইত্যাদি যৌগগুলোর সংকেত লিখতে শিখেছি। এ সংকেতগুলো তোমরা লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, প্রত্যেকটির দুটো অংশ আছে। H, Ca, Cu, Fe ইত্যাদি ধনাত্মক অংশ এবং O, Cl, NO_3 , CO_3 , SO_4 ইত্যাদি

খানাত্ত্বক অংশ বা মূলক। পরবর্তীতে রসায়ন বিজ্ঞান পাঠের সময় এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। সাধারণত যৌগ গঠনের সময় ধাতব অংশটি অপর একটি অধাতব অংশ বা অধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল একটি যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধাতব মৌলগুলো পরস্পর যুক্ত হয়েও যৌগ গঠন করে। যেমন, H_2O , HNO_3 ইত্যাদি। ছক - ২.৫ এ অধাতু মৌল, ধাতু মৌল এবং র্যাডিকেল বা যৌগমূলকের প্রতীক এবং যোজনী দেওয়া আছে। এ ছক থেকে তোমরা নতুন নতুন যৌগ গঠন করতে চেষ্টা কর। তাহলে যোজনী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে এবং তোমরা আনন্দও পাবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি যৌগের সংকেত লেখার চেষ্টা কর। যেমন- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সিলভার সালফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- মৌলের প্রতীক নিচের কোনটি প্রকাশ করে?

ক. মৌলের একটি পরমাণু	খ. মৌলের একটি অণু
গ. মৌলের নামের প্রথম অক্ষর	ঘ. মৌলের ল্যাটিন নাম
- নিচের কোন প্রতীকটি ল্যাটিন নাম থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. S	খ. P
গ. Cu	ঘ. Cl
- নিচের কোন সংকেতটি অশুদ্ধ?

ক. $CuSO_4$	খ. H_2O
গ. H_2Cl	ঘ. $ZnCO_3$
- ধাতু M এর যোজনী 4। উক্ত ধাতুর M(IV) সালফেটের ঠিক সংকেত কোনটি?

ক. M_4SO_4	খ. $M(SO_4)_4$
গ. $M_2(SO_4)$	ঘ. $M(SO_4)_2$
- আয়রন (III) কার্বনেটের ঠিক সংকেত কোনটি?

ক. $Fe_3(CO_3)_2$	খ. $FeCO_3$
গ. $Fe_2(CO_3)_2$	ঘ. $Fe_2(CO_3)_3$
- $Al(PO_4)_3$, KCl_2 , P_2Br_5 , $(NH_4)_2SO_4$, $KHCO_3$, $ZnCO_3$, H_2O_2 , Na_2O_2 , N_3H যৌগ গুলোকে তিনটি ক্রমে সাজান হল-
 - $Al(PO_4)_3$, KCl_2 , P_2Br_5 ,
 - $(NH_4)_2SO_4$, $KHCO_3$, $ZnCO_3$
 - H_2O_2 , Na_2O_2 , N_3H

নিচের কোনটি সঠিক ?

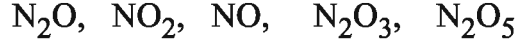
ক. i

খ. iii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ :



উপরের তথ্যের আলোকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭. কোন যৌগটিতে নাইট্রোজেনের যোজনী সবচেয়ে কম?

ক. NO

খ. N_2O

গ. NO_2

ঘ. N_2O_3

৮. উপরিউক্ত অক্সাইডগুলোতে নাইট্রোজেনের ব্যবহৃত যোজনী-

ক. ৩ ও ৫

খ. ১, ৩ ও ৫

গ. ১, ২, ৩ ও ৫

ঘ. ১, ২, ৩, ৪ ও ৫

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. Pb, Sn ও Fe আলাদা আলাদাভাবে উত্তম ক্রোরিন গ্যাসে চালনা করা হল।

ক. কতটি যৌগ উৎপন্ন হবে?

খ. যৌগগুলোর সংকেত লিখ।

গ. যে ধরনের চিত্র থেকে এদের যোজনী বোঝা যায় সেগুলো আঁক।

ঘ. যৌগগুলোর সংকেত লেখায় যোজনীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২. কপার, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, ক্রোরিন, অ্যামোনিয়াম, ফসফেট, হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি মৌল এবং যৌগমূলকের নাম।

ক. এখানে কোনটি ধনাত্মক যৌগমূলক?

খ. যৌগমূলকগুলোর সমন্বয়ে গঠিত যৌগগুলোর সংকেত লিখ।

গ. উপরের মৌলগুলোর মধ্যে কোনটি ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যৌগ গঠন করবে তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরে উল্লিখিত ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম মৌল বা মূলকের সমন্বয়ে গঠিত যৌগসমূহের সংকেত থেকে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক মৌল বা মূলকের অবস্থান যৌগের কোন পাশে হবে তা পর্যালোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

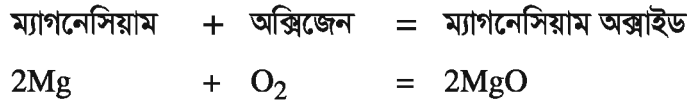
রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিচয়

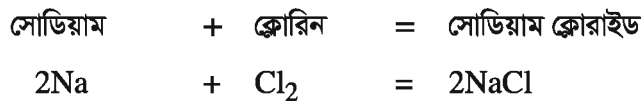
পৃথিবীতে প্রতিদিন কত পরিবর্তন ঘটে। সূর্যের তাপে নদনদী, খালবিলের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ জমে আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে। দিন শেষে রাত আসে, আবার রাতের পর সকাল হয়। বীজ থেকে গাছ হয়, গাছে পাতা হয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে, ফল পাকে, ফল থেকে আবার বীজ হয়। রান্নাঘরে রান্না হয়। দুধ থেকে তৈরি হয় দই, ঘি, মাখন, ছানা। ছানা দিয়ে তৈরি হয় কত রকম মিষ্টি। চাল থেকে তৈরি হয় চিড়া, মুড়ি, পিঠা। তেল ও কয়লা পোড়ে, গ্যাস পোড়ে। আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে প্রতিদিন ঘটে এমন কত পরিবর্তন।

একটু লক্ষ করলেই দেখবে এসব পরিবর্তন এক রকম নয়। এক রকমের পরিবর্তনে পদার্থের মূল গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার অন্য রকম পরিবর্তনে মূল পদার্থ ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যায় যে, পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকারের। যথা— ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তন। রাসায়নিক পরিবর্তনের মূল কারণ হল রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ অধ্যায়ে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রথমেই রাসায়নিক বিক্রিয়া কী সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হয় সাধারণভাবে সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। যেমন, অক্সিজেনপূর্ণ জারে ম্যাগনেসিয়াম দহন করলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়।



অনুরূপভাবে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের কথা ধরা যাক। সাধারণ তাপমাত্রায় সোডিয়াম একটি নরম সাদা ধাতু। এটি সোডিয়াম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। অপরপক্ষে ক্লোরিন একটি গন্ধযুক্ত সবুজাভ হলুদ বর্ণের বিষাক্ত গ্যাস। এর অণুতে দুইটি পরমাণু আছে। উপযুক্ত পরিবেশে সোডিয়াম ও ক্লোরিন রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ সোডিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়।



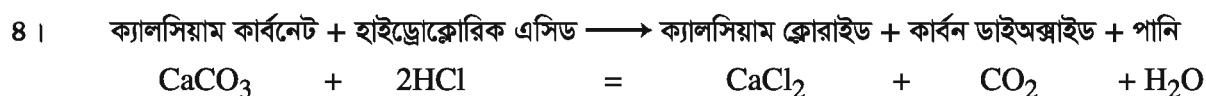
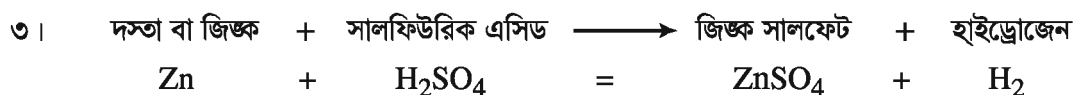
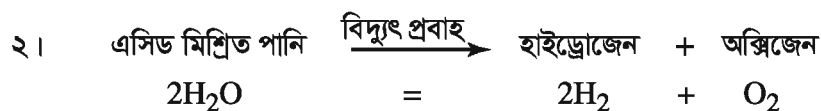
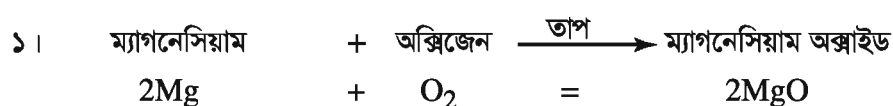
এটি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। যে পদার্থ বা পদার্থগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সেগুলোকে বিক্রিয়ক পদার্থ বা রিঅ্যাকট্যান্ট এবং বিক্রিয়া শেষে যে সব নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা প্রোডাক্ট বলা হয়। উপরের উদাহরণে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন রিঅ্যাকট্যান্ট এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড হল প্রোডাক্ট। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুসমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটে। বিক্রিয়ার ফলে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে যা আমরা খাবার লবণ হিসেবে ব্যবহার করি।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণু ও অণু পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন পদার্থ গঠিত হয়। এ কারণে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় সাধারণভাবে তা থেকে আর পূর্বের বিক্রিয়ক পদার্থগুলো ফিরে পাওয়া যায় না। তোমাদের হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে রাসায়নিক বিক্রিয়া কেন সংঘটিত হয়? যে কোনো পদার্থ কি অন্য যে কোনো পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল। এ সম্পর্কে তোমরা উচ্চতর শ্রেণীতে রসায়ন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারবে। তবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর মধ্যে প্রবল আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন। এ আকর্ষণকে রাসায়নিক আসক্তি বলে। এছাড়াও রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। যেমন- তাপ, চাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহ ইত্যাদি। তবে এক এক ক্ষেত্রে এক এক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে বিক্রিয়া ঘটে না। যেমন, একটি ফ্লাস্কে বা বোতলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ভর্তি করে বছরের পর বছর রেখে দিলেও কোনো পানি উৎপন্ন হবে না। কিন্তু ঐ মিশ্রণে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে সঙ্গে সঙ্গে পানি উৎপন্ন হবে।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

কঠিন বরফকে তাপ দিলে তরল পানি এবং পানিকে তাপ দিলে বাষ্প পরিণত হয়। আবার জলীয়বাষ্পকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করলে প্রথম তরল পানি এবং তরল পানি পরে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পানি, বরফ এবং বাষ্প সব একই পদার্থের তিনটি রূপ, এ রূপগুলোতে পানির অণুর গঠনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এরূপ পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন।

পক্ষান্তরে এসিড মিশ্রিত পানিতে তড়িৎ প্রবাহ চালালে পানি ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। পানি আর পানি থাকে না। সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মেশালে পানি তৈরি হয় না। এ পরিবর্তনে পদার্থের মূল গঠন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল গঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং এক প্রকার পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তাপ, চাপ, তড়িৎ প্রবাহ, বায়ু প্রবাহ, এসিডের সংস্পর্শ, আলোর উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। নিম্নে কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ দেয়া হল :



উপরিউক্ত বিক্রিয়াগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ এবং পরিবর্তনগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন।

ছক ৩.১ : ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের পার্থক্য

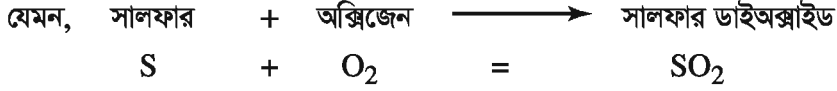
ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
১। যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধু বাইরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।	১। যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল গঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন ধর্মবিশিষ্ট অন্য এক বা একাধিক পদার্থে পরিণত হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।
২। ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী	২। রাসায়নিক পরিবর্তন স্থায়ী।
৩। ভৌত পরিবর্তনের ফলে পদার্থের ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।	৩। মূল পদার্থের পরিবর্তনের ফলে ভিন্ন ধর্মের পদার্থ গঠিত হয়।
৪। ভৌত পরিবর্তনের সময় তাপের পরিবর্তন ঘটতে পারে, নাও পারে।	৪। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে।

ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ	রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ
(ক) বরফ $\xrightarrow[\text{ঠান্ডা}]{\text{তাপ}}$ পানি $\xrightarrow[\text{ঠান্ডা}]{\text{তাপ}}$ বাষ্প	(ক) পানি $\xrightarrow{\text{বিদ্যুৎ প্রবাহ}}$ হাইড্রোজেন + অক্সিজেন
(খ) লোহার পাতকে চুম্বকে পরিণত করা।	(খ) লোহা $\xrightarrow{\text{আর্দ্র বাতাস}}$ লোহার মরিচা
(গ) কঠিন মোম $\xrightarrow[\text{ঠান্ডা}]{\text{তাপ}}$ গলিত মোম	(গ) $C + O_2 \xrightarrow{\text{দহন}} CO_2$
(ঘ) চুন + পানি \longrightarrow চুনের পানি (দ্রবণ)	(ঘ) চুনের পানি + $CO_2 \longrightarrow$ চুনের পানি ঘোলা হয়।
(ঙ) চিনি + পানি \longrightarrow চিনির দ্রবণ	(ঙ) ধাতু + এসিড = হাইড্রোজেন + লবণ $Zn + H_2SO_4 = H_2 + ZnSO_4$
(চ) কঠিন আয়োডিন $\xrightarrow[\text{ঠান্ডা}]{\text{তাপ}}$ আয়োডিন বাষ্প	(চ) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} 2HCl$
(ছ) বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো	(ছ) গাছের পাতায় খাদ্য তৈরি

রাসায়নিক সমীকরণ

যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিবরণ দিতে হলে যে যে মৌল বা যৌগের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে তাদের নাম, পরমাণু ও অণুর সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নতুন পদার্থ বা পদার্থসমূহের নাম এবং সংশ্লিষ্ট পরমাণু ও অণুর সংখ্যা এবং তাদের ভৌত অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছু উল্লেখ করতে হয়। আমাদের চারপাশে প্রাকৃতিক উপায়ে বা মানুষের প্রচেষ্টায় অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে। এ সমস্ত বিবরণ যদি ভাষায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে একদিকে যেমন অনেক শব্দ ও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, অন্যদিকে বিক্রিয়াটিকে ভাষার মাধ্যমে পড়ে বুঝাও বেশ কঠিন কাজ। এ জন্য

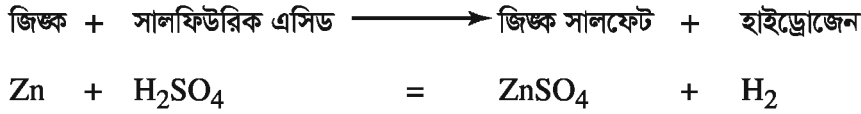
মৌল এবং যৌগকে মনে রাখার সুবিধার জন্য যেমন প্রতীক ও সংকেত ব্যবহার করা হয়, তেমনিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকেও মনে রাখার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে সমীকরণরূপে প্রকাশ করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে বিক্রিয়ক পদার্থ এবং অন্য অংশে থাকে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নতুন পদার্থ।



বিক্রিয়ক পদার্থগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের পূর্বাবস্থা এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ হল রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের শেষ বা পরবর্তী অবস্থা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিন্তু কোনো পরমাণু ধ্বংস বা নতুন করে সৃষ্টি হয় না, অণুর বা পরমাণুর শুধু পুনর্বিন্যাস ঘটে। অতএব বিক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিক্রিয়ক পদার্থে যতগুলো পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরে বিভিন্ন বিক্রিয়াজাত পদার্থেও ততগুলো পরমাণু থাকে। তাই বিক্রিয়ক দ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পরমাণু সংখ্যার সমতা বিরাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে রাসায়নিক সমীকরণকে নিম্নরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক দ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রতীক, সংকেত ও কতগুলো চিহ্নের (+, = বা \rightarrow) সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। যেমন,



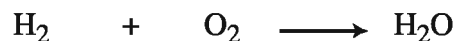
রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম

রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মগুলো নিম্নরূপ

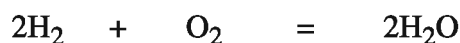
- ১। রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির সমান চিহ্নের (=) বাম দিকে লিখতে হয়। বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির সমান চিহ্নের (=) ডানদিকে লিখতে হয়।
- ২। বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ একাধিক হলে তাদের সংকেতের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) দেওয়া হয়।
- ৩। কোনো পদার্থের অণুর সংখ্যা একাধিক হলে অণুর সংকেতের আগে সেই সংখ্যা লেখা হয়।
- ৪। বিক্রিয়ক বা রিঅ্যাকট্যান্ট পদার্থগুলোর দিক থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থের দিকে একটি তীর চিহ্ন (\rightarrow) বসাতে হবে। তীর চিহ্নের পরিবর্তে সমান চিহ্নও (=) বসানো যায়। তবে এক্ষেত্রে উভয় পাশে পরমাণুর সমতাকরণ প্রয়োজন।
- ৫। বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরে গঠিত নতুন অণুগুলোর মধ্যেও ঠিক ততসংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকতে হবে। তাই সমীকরণের উভয় পাশে মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমতা আনার জন্য প্রতীক ও সংকেতগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

রাসায়নিক সমীকরণের সমতািকরণ

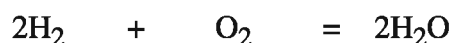
১। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমতা চিহ্নের বাম পাশে বসবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর সংকেত এবং ডান পাশে বসবে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ পানির অণুর সংকেত। সুতরাং বিক্রিয়টিকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :



কিন্তু বিক্রিয়ার আগে যত সংখ্যক H পরমাণু এবং O পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়াজাত পদার্থে ততসংখ্যক H এবং O পরমাণু থাকা উচিত। তাই বিক্রিয়ার সমতা স্থাপনের জন্য H_2 অণু, O_2 অণু এবং H_2O অণুর সংখ্যা এবং সমীকরণ হবে-



এ সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ার পূর্বে এবং বিক্রিয়ার পরে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মোট পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা যায়।



$$(2 \times 2) + (1 \times 2) = 2 \times (2 + 1)$$

$$\text{বা, } 8 + 2 = 2 \times 3$$

$$\text{বা, } 6 = 6$$

সুতরাং এ সমীকরণে বিক্রিয়ার আগের পরমাণুর সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার পরের পরমাণুর সংখ্যা সমান।

আরও কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণের উদাহরণ।



$$(1 \times 2) + (1 \times 2) = 2(1 + 1)$$

$$\text{বা, } 2 + 2 = 2 \times 2$$

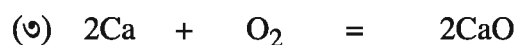
$$\text{বা, } 8 \text{ পরমাণু} = 8 \text{ পরমাণু}$$



$$(2 \times 1) + (1 \times 2) = 2 \times (1 + 1)$$

$$\text{বা, } 2 + 2 = 2 \times 2$$

$$\text{বা, } 8 \text{ পরমাণু} = 8 \text{ পরমাণু}$$



$$(2 \times 1) + (1 \times 2) = 2 \times (1 + 1)$$

$$\text{বা, } 2 + 2 = 2 \times 2$$

$$\text{বা, } 8 \text{ পরমাণু} = 8 \text{ পরমাণু।}$$



$$(1 \times 1) + \{(1 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 8)\} = \{(1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 8)\} + (1 \times 2)$$

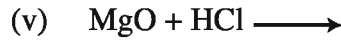
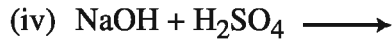
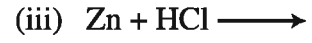
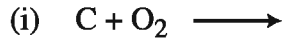
$$\text{বা, } 1 + \{2+1+8\} = \{1+1+8\} + 2$$

$$\text{বা, } 1 + 9 = 6 + 2$$

$$\text{বা, } 8 \text{ পরমাণু} = 8 \text{ পরমাণু।}$$

নিজে নিজে চেষ্টা কর

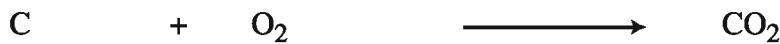
নিচের রাসায়নিক সমীকরণগুলো সমতা বিধান করে সমাধান কর এবং পরমাণুর সংখ্যা দেখাও



বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া

রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন -

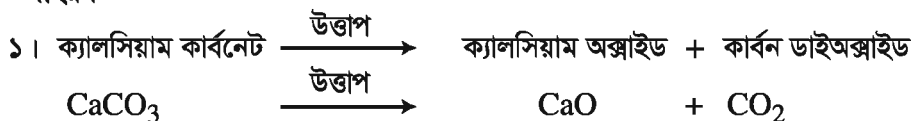
- (১) **সংযোজন বিক্রিয়া** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ পরস্পর বিক্রিয়া করে একটি মাত্র যৌগ উৎপন্ন করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। তবে যে সংযোজন বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটি মাত্র যৌগ উৎপন্ন করে তাকে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে।

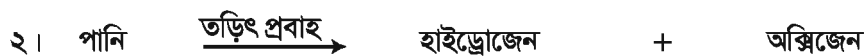


উপরের ৩টি বিক্রিয়াই সংযোজন বিক্রিয়া। তবে এর মধ্যে ২য় এবং ৩য় বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটি যৌগ গঠন করায় এ দুটো বিক্রিয়াকে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বলা হয়। সুতরাং সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়াই সংযোজন বিক্রিয়া। তবে সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়।

- (২) **বিয়োজন বিক্রিয়া** : যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ বিভক্ত হয়ে দুই বা ততোধিক মৌল বা যৌগে পরিণত হয় তাকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। এটি সংযোজন বিক্রিয়ার বিপরীত বিক্রিয়া। তবে যে বিয়োজন বিক্রিয়ায় একটি যৌগিক পদার্থ ভেঙে দুই বা ততোধিক মৌলে পরিণত হয় তাকে বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে।

উদাহরণ

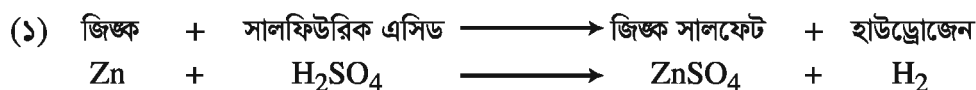




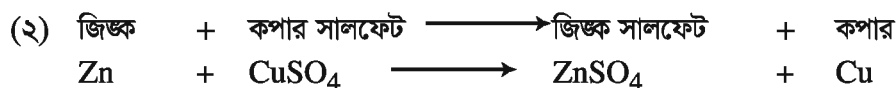
উপরের তিনটি বিক্রিয়াই বিয়োজন বিক্রিয়া। তবে এর মধ্যে ২য় ও ৩য় বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে শুধু মৌলে পরিণত হয়েছে বলে এ দুটো বিশ্লেষণ বিক্রিয়া। সুতরাং বলা যায় সকল বিশ্লেষণ বিক্রিয়াই বিয়োজন বিক্রিয়ার অন্তর্গত। তবে সব বিয়োজন বিক্রিয়া বিশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়।

(৩) **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি মৌল অন্য যৌগের অণুর এক বা একাধিক পরমাণুকে সরিয়ে নিজেই তার স্থান দখল করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে সে বিক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয়।

উদাহরণ



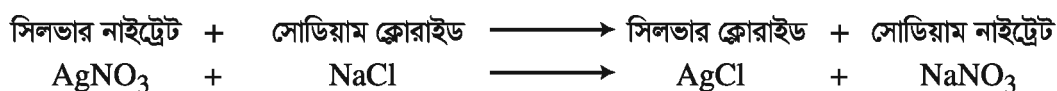
এ বিক্রিয়ায় দস্তা সালফিউরিক এসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে H_2 অণুকে মুক্ত করে।



এ বিক্রিয়ায় দস্তা কপার সালফেট থেকে কপারকে প্রতিস্থাপন করে Cu অণুকে মুক্ত করে দেয়।

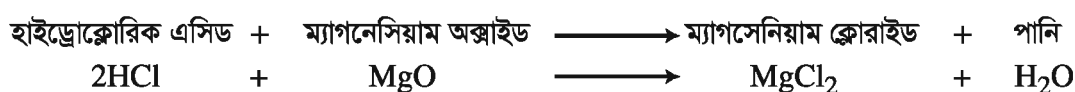
(৪) **দ্বিবিয়োজন বা বিনিময় বিক্রিয়া** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুইটি ভিন্ন যৌগের অণুর মৌল বা মূলকগুলো স্থান অদল বদল বা বিনিময় করে একাধিক নতুন অণু গঠন করে তাকে বলা হয় পারস্পরিক দ্বিবিয়োজন বা বিনিময় বিক্রিয়া।

উদাহরণ

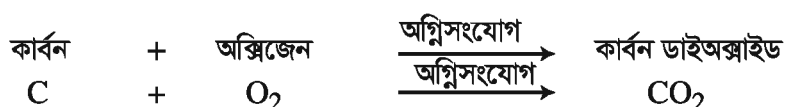


এ বিক্রিয়ায় সিলভার (Ag) ও সোডিয়াম (Na) এবং নাইট্রেট (NO_3) ও ক্লোরিন (Cl) পরস্পর স্থান বিনিময় করে।

(৫) **প্রশমন বিক্রিয়া** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি এসিড ও একটি ক্ষারকের সংযোগে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে।



(৬) **দহন** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বায়ু বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোনো পদার্থে অগ্নিসংযোগ করলে তা ভিন্ন কোনো পদার্থে পরিণত হয় তাকে দহন বলে।



অণু ও যৌগ গঠনে যোজনীর ব্যবহার

মনে কর A মৌল B মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। আরও মনে কর A মৌলের যোজনী x এবং B মৌলের যোজনী y।

এখন A এবং B মৌলের সংযোগে যৌগ গঠনের সময়ে A মৌলের যোজনী B মৌলের ডানপাশে সামান্য নিচে ছোট করে লিখতে হয়, যথা B_x । অনুরূপভাবে B মৌলের যোজনী সংখ্যা A মৌলের ডানপাশ নিচের দিকে ছোট করে লিখতে হয়, যথা A_y । এক্ষেত্রে A ও B মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেতটি হবে A_yB_x ।

উদাহরণ

- (১) সোডিয়ামের যোজনী ১ এবং ক্লোরিনের যোজনী ১। তাই সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সংযোগে গঠিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণুর সংকেত হবে Na_1Cl_1 বা $NaCl$ ।
- (২) হাইড্রোজেনের যোজনী ১ এবং অক্সিজেনের যোজনী ২। সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত পানির সংকেত হবে H_2O_1 বা H_2O ।
- (৩) নাইট্রোজেনের যোজনী ৩ এবং হাইড্রোজেনের যোজনী ১। সুতরাং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন নিয়ে গঠিত অ্যামোনিয়ার সংকেত হবে N_1H_3 বা NH_3 ।

মৌলের যোজনী অনুযায়ী অণুর সংকেত লিখন প্রণালির কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

ছক ৩.২ : যৌগে মৌলের যোজনী ও অণুর সংকেত লিখন প্রণালি

উপরে যোজনী নিচে প্রতীক	বিপরীত কোণে যোজনী লিখন	গঠিত অণুর সংকেত	যৌগের নাম
1 1 H Cl	1 1 H Cl	HCl	হাইড্রোক্লোরিক এসিড
2 2 Mg O	2 2 Mg O	Mg_2O_2 বা MgO	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড
1 2 H O	1 2 H O	H_2O_1 বা H_2O	পানি
3 1 N H	3 1 N H	N_1H_3 বা NH_3	অ্যামোনিয়া

কোনো যৌগে মূলকের উপস্থিতি থাকলে ঐ যৌগের আণবিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে ওপরের নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

ছক ৩.৩ : যৌগ মূলকের যোজনী ও অণুর সংকেত লিখন প্রণালি

উপরে যোজনী নিচে প্রতীক	বিপরীত কোণে যোজনী লিখন	গঠিত অণুর সংকেত	যৌগের নাম
1 1 Na + OH	1 1 Na OH	Na_1OH_1 বা $NaOH$	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড
1 2 H + SO ₄	1 2 H SO ₄	$H_2(SO_4)_1$ বা H_2SO_4	সালফিউরিক এসিড
2 2 Mg CO ₃	2 2 Mg CO ₃	$Mg_2(CO_3)_2$ বা $MgCO_3$	ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট
1 2 Na + CO ₃	1 2 Na CO ₃	$Na_2(CO_3)$ বা Na_2CO_3	সোডিয়াম কার্বনেট

যৌগে উভয় মৌল বা মূলকের যোজনী একই হলে এক্ষেত্রে সংকেতে যোজনী লেখার প্রয়োজন হয় না। শুধু মৌল কিংবা মূলকগুলো পাশাপাশি লিখলেই চলে। উভয় মৌলের কিংবা উভয় মূলকের যোজনী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক হলে ঐ সংখ্যা দিয়ে যোজনীকে ভাগ করে বিনিময় করে লিখতে হয়। যেমন, ক্যালসিয়ামের যোজনী ২ এবং অক্সিজেনের যোজনী ২। সুতরাং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সংকেত CaO । আবার কার্বনের যোজনী ৪ এবং অক্সিজেনের যোজনী ২। সুতরাং কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত C_2O_4 না লিখে CO_2 লেখা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- N_2O_3 যৌগ নাইট্রোজেনের যোজনী কত ?
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৬
- সালফিউরিক এসিডের একটি অণুতে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত ?
ক. ২
খ. ৫
গ. ৭
ঘ. ৮
- আয়রন (II) সালফেটের সঠিক সংকেত কোনটি?
ক. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
খ. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_2$
গ. FeSO_4
ঘ. Fe_2SO_4
- SO_2 ও SO_4 এর মধ্যে পার্থক্য কী?
ক. SO_2 একটি মৌল এবং SO_4 একটি যৌগ
খ. SO_2 এবং SO_4 দুইটি যৌগ
গ. SO_2 একটি যৌগ এবং SO_4 একটি মূলক
ঘ. SO_2 এবং SO_4 দুইটি মৌল
- $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$ এটি কোন ধরনের বিক্রিয়া?
ক. বিনিময় বিক্রিয়া
খ. প্রশমন বিক্রিয়া
গ. বিশ্লেষণ বিক্রিয়া
ঘ. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
- 2O ও O_2 এর মধ্যে পার্থক্য কী?
ক. 2O অক্সিজেনের দুইটি বিচ্ছিন্ন পরমাণু এবং O_2 অক্সিজেনের একটি অণু
খ. 2O অক্সিজেনের দুইটি অণু এবং O_2 অক্সিজেনের দুইটি পরমাণু
গ. 2O মৌলিক পদার্থ এবং O_2 যৌগিক পদার্থ
ঘ. 2O এবং O_2 এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই
- A ও B মৌল দুটি যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। এখানে A এর যোজনী x এবং B এর যোজনী y. A ও B দ্বারা গঠিত যৌগ হল-
ক. AB
খ. AyBx
গ. AxBy
ঘ. xAB_y

চতুর্থ অধ্যায়

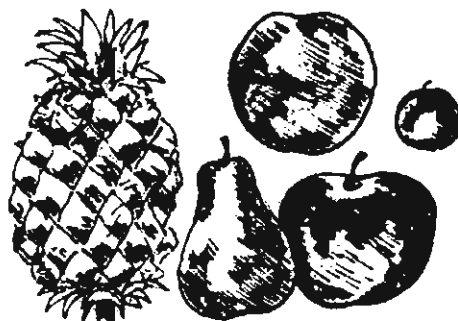
অম্ল, ক্ষারক ও লবণ

যৌগিক পদার্থসমূহকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এরূপ তিনটি প্রধান শ্রেণীকে বলা হয় অম্ল বা এসিড, ক্ষারক বা বেস এবং লবণ বা সল্ট। প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন পদার্থের গুণাগুণের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। এ অধ্যায়ে আমরা অম্ল, ক্ষারক ও লবণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অম্ল বা এসিড : অম্লের ইংরেজি শব্দ এসিড। টক স্বাদযুক্ত সব বস্তুই এসিড থাকে। তেঁতুল, লেবু, টমেটো, কমলা, টক ফল, দই, ভিনেগার ইত্যাদির মধ্যে জৈব এসিড থাকে। এগুলো সবই জৈব এসিডের উদাহরণ। এ থেকে দেখা যায় আমাদের খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত এসিডগুলো জৈব এসিড। এ এসিডগুলো মৃদু বলে সাধারণত ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু পরীক্ষাগারের ব্যবহৃত কয়েকটি এসিড অত্যন্ত তীব্র। সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড এ তিনটি এসিড পরীক্ষাগারে ও রসায়ন শিল্পে প্রচুর পরিমানে ব্যবহৃত হয়। এ এসিডগুলো অজৈব এসিড বা খনিজ এসিড। প্রশ্ন হল - এসিড কাকে বলে ?

যদি কোনো যৌগের অণুতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং ঐ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল কোনো যৌগমূলক দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত করা যায় এবং যা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে অম্ল বা এসিড বলে। এসিডের স্বাদ টক এবং এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে।

পরীক্ষা ৪.১ : ৪/৫টি টেস্ট টিউব নাও। প্রত্যেকটিতে পৃথকভাবে ২/৩ ফোঁটা করে ভিনেগার, লেবুর রস, টমেটো বা কমলার রস, তেঁতুল গোলা পানি, দইয়ের পানি নাও। এবার নিচের পরীক্ষাগুলো কর এবং ফলাফল ছকে লেখ -



চিত্র ৪.১ : এসিডযুক্ত ফল

ছক ৪.১ : বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত এসিড

পরীক্ষণীয় দ্রব্য	স্বাদ	নীল লিটমাসের রং	মন্তব্য
ভিনেগার	টক	লাল	অম্ল বা এসিড
লেবুর রস	টক	লাল	অম্ল বা এসিড
কমলার রস	টক	লাল	অম্ল বা এসিড
তেঁতুল পানি	টক	লাল	অম্ল বা এসিড
টক দইয়ের পানি	টক	লাল	অম্ল বা এসিড

পরীক্ষা ৪.২ : পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয় এমন তিনটি এসিড নাও। এসিডগুলোর নাম ও সংকেত লেখ। এসিডগুলোর সংকেত ভালভাবে লক্ষ কর। যে যে মৌলিক পদার্থ নিয়ে এসিডগুলো গঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে একটা সাধারণ মৌলিক পদার্থ আছে। বলতো এ সাধারণ মৌলিক পদার্থটির নাম কী? এটি হল হাইড্রোজেন (H)।

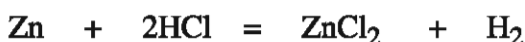
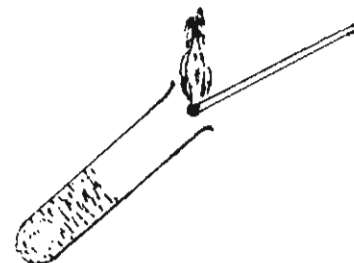


চিত্র ৪.২ : এসিডের বোতল

ছক ৪.২ : কয়েকটি খনিজ এসিডের পরিচয়

এসিডের নাম	এসিডের সংকেত	এসিডে সাধারণ মৌলিক পদার্থের নাম
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	HCl	হাইড্রোজেন H
সালফিউরিক এসিড	H ₂ SO ₄	হাইড্রোজেন H
নাইট্রিক এসিড	HNO ₃	হাইড্রোজেন H

এবারে একটি টেস্টটিউবে ছোট এক টুকরা দস্তা (Zn) নিয়ে তার মধ্যে ২/৩ ফোঁটা পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড মেশাও। কী দেখছ? তীব্র বিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। টেস্ট টিউবের মুখে একটা জ্বলন্ত পাটকাঠি ধর। কী ঘটছে? একটা দপ শব্দ হল এবং পাটকাঠিও নিভে গেল তাই না। তাহলে এবারে ভেবে দেখতো উৎপন্ন গ্যাসটির নাম কী? হাইড্রোজেন গ্যাস। দস্তা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে তা সমীকরণের সাহায্যে লেখ।

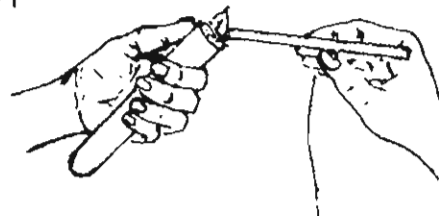


চিত্র ৪.৩ : এসিডে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি পরীক্ষা

উপরের পরীক্ষা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এসিডে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। এসিড ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন তৈরি করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ধাতু, যেমন, তামা ও সীসা সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না। আবার সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K) ও ক্যালসিয়াম (Ca) ধাতু এসিডের সংস্পর্শে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যা খুবই বিপজ্জনক। তাই পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করার সময় এসব ধাতু ব্যবহার করা হয় না।

এবার এসিডের অন্যান্য গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

পরীক্ষা ৪.৩ : একটি টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ চুনাপাথর (CaCO₃) নাও এবং তাতে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড মেশাও। কী দেখছ? তীব্রভাবে বিক্রিয়া ঘটছে এবং বুদ বুদ আকারে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। একটা জ্বলন্ত পাটকাঠি এখন টেস্ট টিউবের মুখে ধর। কী ঘটলো? জ্বলন্ত কাঠিটি সাথে সাথে নিভে গেল। তাহলে এবারে বলতো নির্গত গ্যাসটি কী? বিক্রিয়াটিকে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যাক।

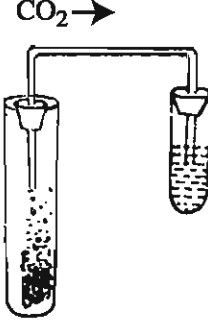
চিত্র ৪.৪ : CO₂ পূর্ণ টেস্টটিউবে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করানো হচ্ছে



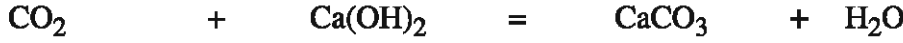
ক্যালসিয়াম কার্বনেট + হাইড্রোক্লোরিক এসিড = ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি

উৎপন্ন গ্যাসটি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তা সনাক্ত করার জন্য আরও একটি পরীক্ষা আছে। আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা করে।

এবার অন্য একটি টেস্টটিউবে কিছু পরিষ্কার চুনের পানি নাও এবং চুনের পানির মধ্যে উৎপন্ন গ্যাসটি চালনা কর। কী দেখছ? পরিষ্কার চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেল। এ পরীক্ষা থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? উৎপন্ন গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড। এ বিক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্য এভাবে লেখা যায়।



চিত্র ৪.৫ : চুনের পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড চালনা



কার্বন ডাইঅক্সাইড + ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড = ক্যালসিয়াম কার্বনেট + পানি
বা চুনের পানি অধঃক্ষেপ

এ পরীক্ষা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এসিড কার্বনেট লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।



ক্যালসিয়াম কার্বনেট + হাইড্রোক্লোরিক এসিড = কার্বন ডাইঅক্সাইড + ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড + পানি

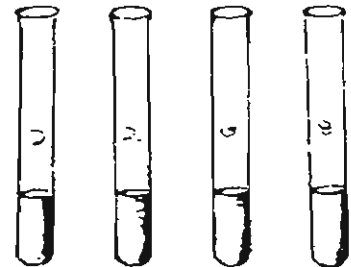


কপার কার্বনেট + সালফিউরিক এসিড = কার্বন ডাইঅক্সাইড + কপার সালফেট + পানি

নির্দেশকের ব্যবহার

এসিড চেনার বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা উপরের পরীক্ষাগুলো থেকে জানলাম। এসিড সনাক্ত করার একটি সহজ উপায় হল নির্দেশকের ব্যবহার। নির্দেশক ব্যবহার করে খুব সহজেই এসিড ও ক্ষারক সনাক্ত করা যায়। নির্দেশক একটি রাসায়নিক পদার্থ যা এসিড বা ক্ষারকের সংস্পর্শে এসে রং বদলায়। এ রং বদলানো থেকে আমরা বলতে পারি কোনটি এসিড, কোনটি ক্ষারক আর কোনগুলো দুটোর কোনটিই নয়। সাধারণত বিজ্ঞানাগারে এসিড ও ক্ষারক সনাক্ত করার জন্য লিটমাস দ্রবণ বা লিটমাস, মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনোফথ্যালিন (Phenolphthalein) এ তিন রকমের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া আমরা নিজেরাও গাছের ফুল ও মূল থেকে এ ধরনের নির্দেশক তৈরি করতে পারি।

পরীক্ষা ৪.৪ : চারটি টেস্ট টিউব নাও। এগুলোর প্রত্যেকটিতে ২/৩ ফোঁটা করে পাতলা এসিড দাও। টেস্ট টিউবগুলোকে ১, ২, ৩, ও ৪ নম্বর দিয়ে চিহ্নিত কর। ১ নং টেস্ট টিউবে ২/৩ ফোঁটা নীল লিটমাস দ্রবণ মিশাও। ২ নং টেস্ট টিউবে ২/৩ ফোঁটা ফেনোফথ্যালিন ও ৩ নং টেস্ট টিউব ২/৩ ফোঁটা মিথাইল অরেঞ্জ দ্রবণ এবং ৪নং টেস্টটিউবে জবা ফুলের রস মিশাও। এসিডের সংস্পর্শে এগুলোর রঙের পরিবর্তন লক্ষ কর এবং নিচের ছকে লেখ। একইভাবে ৪টি টেস্ট টিউবে পাতলা ক্ষারক যেমন সোডিয়াম



চিত্র ৪.৬ : পাতলা এসিড ও বিভিন্ন নির্দেশক

হাইড্রক্সাইড অথবা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড নিয়ে পরীক্ষাগুলো কর এবং নির্দেশকের উপস্থিতিতে দ্রবনের কোনো রং পরিবর্তন হলে সেগুলো ছকে লেখ।

ছক ৪.৩ : এসিড ও ক্ষার দ্রবণে বিভিন্ন নির্দেশকের বর্ণ

নির্দেশকের নাম	এসিডের মধ্যে রং	ক্ষারকের মধ্যে রং
লিটমাস দ্রবণ	লাল	নীল
ফেনোফথ্যালিন	বর্ণহীন	গোলাপী
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল	হলুদ
জবা ফুলের রস	লাল	নীল

এসিডের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

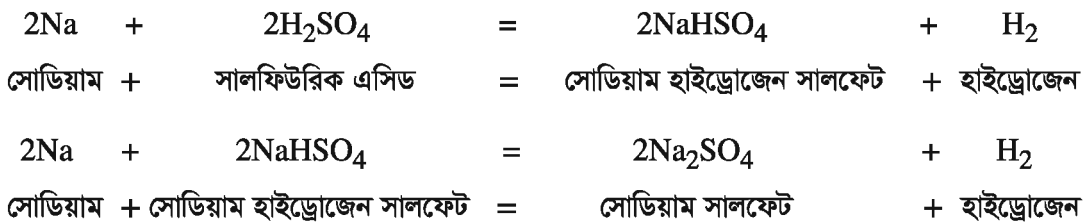
এ পর্যন্ত এসিড সম্পর্কে যে সব পরীক্ষাগুলো করা হল তা থেকে আমরা এসিডের কয়েকটি ধর্ম নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করতে পারি -

- (১) এসিডের অণুতে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে।
- (২) ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলক দ্বারা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে।
- (৩) এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে।
- (৪) এসিডের সাথে ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। [ক্ষারের ৪ নং ধর্ম পরীক্ষা দ্রষ্টব্য]
- (৫) এসিড সাধারণত টক স্বাদযুক্ত।
- (৬) এসিড কার্বনেটযুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

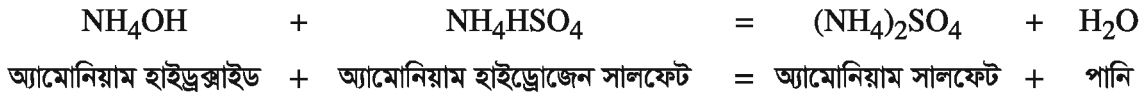
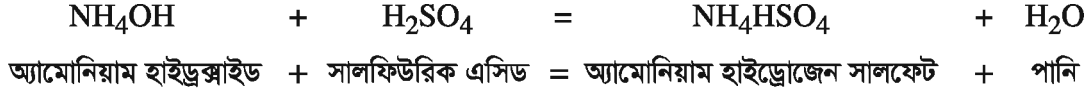
সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) একটি এসিড তার যৌক্তিক প্রমাণ

সালফিউরিক এসিড একটি এসিড তা আমরা নিম্নরূপ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি :

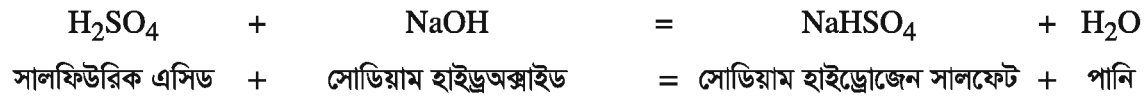
- (১) সালফিউরিক এসিডের সংকেত H_2SO_4 । অর্থাৎ সালফিউরিক এসিডের অণুতে দুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।
- (২) প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু দুইটিকে কোনো ধাতু যেমন, সোডিয়াম (Na) দ্বারা আংশিকরূপে ও সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করে যথাক্রমে সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ($NaHSO_4$) ও সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) দুইটি লবণ তৈরি করা যায়।



আবার এ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু দুইটিকে ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল কোনো যৌগমূলক যেমন অ্যামোনিয়াম মূলক (NH_4^+) দ্বারা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপন করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট NH_4HSO_4 অথবা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করে অ্যামোনিয়াম সালফেট লবণ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ তৈরি করা যায়।



(৩) সালফিউরিক এসিড স্কারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



(৪) সালফিউরিক এসিডের পাতলা জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাস নির্দেশকের বর্ণ লাল করে।

(৫) পাতলা সালফিউরিক এসিড টক স্বাদযুক্ত।

উপর্যুক্ত যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে সালফিউরিক এসিড একটি এসিড।

সতর্কতা

- (১) সালফিউরিক এসিড একটি তীব্র এসিড। লঘু বা পাতলা করার জন্য সালফিউরিক এসিডে পানি ঢাললে এসিড গরম হয়ে ফুটতে আরম্ভ করে। তাই লঘু সালফিউরিক এসিড তৈরি করার জন্য কখনও এসিডের মধ্যে পানি মিশাবে না। পানির মধ্যে ফোঁটায় ফোঁটায় এসিড ঢেলে পাতলা করবে।
- (২) সালফিউরিক (H_2SO_4) এসিড ঘন অথবা পাতলা কোনোটিই মুখে দিয়ে স্বাদ নেবে না।
- (৩) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এবং নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ইত্যাদি দিয়ে কাজ করার সময় সতর্ক থাকবে যেন হাতে না লাগে।

স্কারক

এসিডের বিপরীতধর্মী পদার্থগুলো বেস (Base) বা স্কারক নামে পরিচিত। এসিড ও স্কারক একত্রে মিশালে এমন পদার্থ গঠন করে যার মধ্যে এসিড বা স্কারক কারও গুণ প্রকাশ পায় না। এসিড ও স্কারকের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।

সাধারণত ধাতুর অক্সাইড (ধাতু ও অক্সিজেনের যৌগ) ও হাইড্রক্সাইড (ধাতু, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ) কে স্কারক বলে।

নিম্নে কয়েকটি ক্ষারকের উদাহরণ দেওয়া হল:

Na_2O
সোডিয়াম অক্সাইড

K_2O
পটাসিয়াম অক্সাইড

CaO
ক্যালসিয়াম অক্সাইড

ZnO
জিঙ্ক অক্সাইড

NaOH
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড

KOH
পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড

Ca(OH)_2
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড

Zn(OH)_2
জিঙ্ক হাইড্রক্সাইড

উপরের যৌগগুলোর প্রত্যেকটির সংকেত লক্ষ করলে দেখা যায় এগুলো ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড। এগুলো ক্ষারক। অতএব যে কোনো ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড যৌগ যা এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এসিডের ধর্মকে বিলুপ্ত করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বা বেস বলে। অধিকাংশ ক্ষারকই পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যে সমস্ত ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাকে ক্ষার বলে। অর্থাৎ পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারককেই ক্ষার বলে। কাজেই ক্ষার একটি বিশেষ শ্রেণীর ক্ষারক। অর্থাৎ সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়। উদাহরণস্বরূপ জিঙ্ক অক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, আয়রন(III) হাইড্রক্সাইড, কপার(II) হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি সবগুলো ক্ষারক। এদের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষারক দুইটি পানিতে দ্রবীভূত হয় বলে ঐ হাইড্রক্সাইড দুইটি ক্ষার। কিন্তু আয়রন(III) হাইড্রক্সাইড এবং কপার(II) হাইড্রক্সাইড ক্ষারক দুইটি পানিতে অদ্রবণীয়। তাই এ ক্ষারক দুইটি ক্ষারকই, ক্ষার নয়। ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে কিন্তু ক্ষার মাত্রেই পানিতে দ্রবণীয়।

ছক ৪.৪ : ক্ষারক ও ক্ষারের পার্থক্য

ক্ষারক	ক্ষার
১। যে কোনো ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড যৌগ যা এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে। যেমন ZnO , CaO , NaOH , KOH , Ca(OH)_2 ইত্যাদি।	১। পানিতে দ্রবীভূত হয় এমন সব ক্ষারককে ক্ষার বলে। যেমন- NaOH , KOH , Ca(OH)_2 , NH_4OH ইত্যাদি ক্ষার।
২। ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হতেও পারে নাও হতে পারে।	২। ক্ষার মাত্রই পানিতে দ্রবণীয়।
৩। সকল ক্ষারক ক্ষার নয়।	৩। সকল ক্ষারই ক্ষারক।

ক্ষারের ধর্ম

- (১) ক্ষার পানিতে দ্রবণীয়।
- (২) ক্ষার জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়ন দেয়।
- (৩) ক্ষারের জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। [‘নির্দেশকের ব্যবহার’ অংশের ছক ৪.৩ দ্রষ্টব্য]

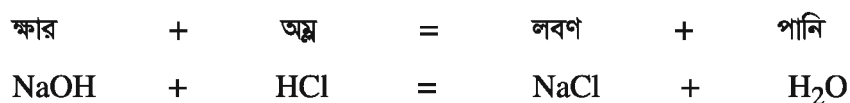
পরীক্ষা ৪.৪ : তোমরা টেস্ট টিউবে কয়েক ফোঁটা পাতলা স্কার যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অথবা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড নিয়ে বিভিন্ন নির্দেশকের উপস্থিতিতে রঙের কী পরিবর্তন হয় তা ছকে লিখে রেখেছিলে। এবার নিচের পরীক্ষাটি করে দেখ।

পরীক্ষা ৪.৫ : একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ চুনের পানি নিয়ে তার মধ্যে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন লক্ষ কর। দেখবে চুনের পানিতে লাল লিটমাস কাগজের রং নীল হয়েছে। একটু চুনের পানির স্বাদ নিয়ে দেখ। এটি কটু বা কষা স্বাদযুক্ত। এভাবে সোডা বা অন্যান্য সকল ক্ষারধর্মী পদার্থের দ্রবণে লাল লিটমাসের রং নীল হয়ে যায়। স্বাদে এরা কটু।

(৪) স্কার এসিডের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

পরীক্ষা ৪.৬ : একটি বিকারে মাপ চোঙ দিয়ে মেপে ২০ ml সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নাও এবং তাতে ২/১ ফোঁটা ফেনোফথ্যালিন মিশাও। দেখবে দ্রবণটি সুন্দর গোলাপী রং ধারণ করেছে। এখন এ দ্রবণে ড্রপার থেকে আস্তে আস্তে ফোঁটা ফোঁটা করে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশাও। বিকারটি ভালভাবে নাড়তে থাক এবং এক ফোঁটা করে এসিড মিশাতে থাক। এমন এক সময় আসবে যখন গোলাপী রং পরিবর্তন হয়ে দ্রবণটি বর্ণহীন হবে। এ অবস্থায় আসতে ২০ ml দ্রবণে মোট কত ফোঁটা এসিড মিশিয়েছ তা খাতায় লিখে রাখ। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি তীব্র স্কার। এর মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশানোর ফলে নির্দেশকের রঙের পরিবর্তন হল কেন বলতে পার? কারণ স্কার ও এসিড তীব্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রশমিত হয়।

এবার আরেকটি বিকারে ২০ ml সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নিয়ে তাতে যত ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশিয়ে প্রশমিত করেছিলে ঠিক তত ফোঁটা এসিড মিশাও। এবার কিন্তু নির্দেশক মিশাতে হবে না। এখন এসিড ও স্কার মিশ্রিত বর্ণহীন দ্রবণটি তাপ দিয়ে আস্তে আস্তে বাষ্পায়িত করে প্রায় পানি শূন্য কর। বিকারের তলায় কী দেখছ? বিকারের তলায় সাদা রঙের তলানি পড়ে আছে। বিকারটি ঠাণ্ডা হওয়ার পর খুব সামান্য পরিমাণ সাদা তলানি বের করে আন এবং তার স্বাদ গ্রহণ কর। কী স্বাদ পেল? লবণাক্ত তাই না? কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে কি? ঘটলে বিক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্য প্রকাশ করতে চেষ্টা কর।

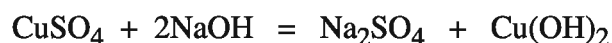


সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড + হাইড্রোক্লোরিক এসিড = সোডিয়াম ক্লোরাইড + পানি

অতএব এ পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল স্কার এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

(৫) অধিকাংশ ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে স্কার মিশালে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং ধাতুর হাইড্রক্সাইডের অধঃক্ষেপ বা তলানি পড়ে।

পরীক্ষা ৪.৭ : একটি বড় টেস্ট টিউবে ২ ml পরিমাণ কপার(II) সালফেট দ্রবণ নাও। এখন তাতে ১ ml পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মিশাও। কী ঘটলো? টেস্ট টিউবের নিচে তলানি পড়েছে। এটি কিসের তলানি বলতে পার কি? বিক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্য লিখতে চেষ্টা কর :



কপার সালফেট + সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড = সোডিয়াম সালফেট + কপার হাইড্রক্সাইড

(৬) স্কারের জলীয় দ্রবণ সাবানের মত পিচ্ছিল মনে হয়।

(৭) স্কারের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহী।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি ক্ষার তার যৌক্তিক প্রমাণ

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি ক্ষার। কারণ :

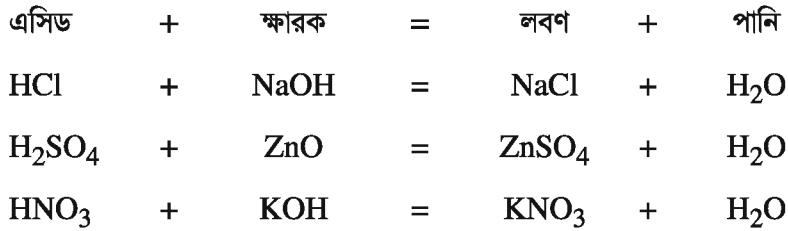
- (১) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষারকটি পানিতে দ্রবণীয়।
- (২) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে।
- (৩) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে এক ফোঁটা ফেনোফথ্যালিন দ্রবণ যোগ করলে দ্রবণের বর্ণ গোলাপী হয়।
- (৪) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে এক ফোঁটা মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করলে দ্রবণের বর্ণ হলুদ হয়।
- (৫) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে পাতলা এসিড মিশালে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
- (৬) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণের কিছু কিছু ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণ মিশালে ধাতব হাইড্রক্সাইডের তলানি পড়ে।
- (৭) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ সাবানের মত পিচ্ছিল।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্ষারের বৈশিষ্ট্য। অতএব আমরা এ সব যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি ক্ষার।

লবণ

রসায়ন শাস্ত্রে লবণ একটি বিশেষ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ। খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও সোডা, তুঁতে ইত্যাদি লবণ জাতীয় পদার্থ। এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ার ফলে ক্ষারকের ধাতু এসিডের হাইড্রোজেনের স্থান দখল করে যে নতুন যৌগিক পদার্থটি উৎপন্ন করে তাকে লবণ বলে।

নিচের উদাহরণ লক্ষ কর :



উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে দেখা যায় ক্ষারকের ধাতু যেমন, Na, Zn, K ইত্যাদি এসিডের হাইড্রোজেনকে সরিয়ে তার স্থান দখল করে যে নতুন যৌগ গঠন করে সেটিই লবণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি,

এসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু কোনো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল মূলক দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকে লবণ বলে।

লবণের যে অংশ ক্ষারক থেকে এসে এসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে ঐ স্থানে বসে তাকে ধাতব মূলক বা ক্ষারকীয় মূলক বলে। আর লবণের যে অংশ এসিড থেকে আসে তাকে এসিড মূলক বলে। যেমন, উপরের উদাহরণগুলোতে Na, Zn, K ইত্যাদি ধাতব মূলক এবং Cl, SO₄, NO₃ ইত্যাদি এসিড মূলক। সুতরাং আমরা বলতে পারি লবণ ধাতব মূলক ও এসিড মূলক দ্বারা গঠিত।

ক্ষার দ্রবণের মধ্যে এসিড মিশালে তীব্র বিক্রিয়া শুরু হয়। এরূপ বিক্রিয়ার ফলে এসিড ও ক্ষার উভয়ের রাসায়নিক ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে নতুন যৌগ লবণ ও পানি গঠিত হয়। এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল :

এসিড	+	ক্ষার	=	লবণ	+	পানি
HCl	+	NH ₄ OH	=	NH ₄ Cl	+	H ₂ O
হাইড্রোক্লোরিক এসিড		অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড		অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড		পানি
H ₂ SO ₄	+	Ca(OH) ₂	=	CaSO ₄	+	2H ₂ O
সালফিউরিক এসিড		ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড		ক্যালসিয়াম সালফেট		পানি

লবণের প্রকারভেদ

যে কোনো লবণের রাসায়নিক নাম সে লবণ উৎপাদনকারী এসিড ও ক্ষারকের নাম থেকে নেয়া হয়। লবণের নামের প্রথম অংশে থাকে ধাতুর নাম এবং শেষ অংশে এসিড মূলকের নাম।

- (১) হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণকে ক্লোরাইড লবণ বলে। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি।
- (২) সালফিউরিক এসিডের লবণকে বলা হয় সালফেট লবণ। যথা— সোডিয়াম সালফেট, কপার সালফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি।
- (৩) নাইট্রিক এসিডের লবণকে বলা হয় নাইট্রেট লবণ। পটাসিয়াম নাইট্রেট, কপার নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি।
- (৪) কার্বনিক এসিডের লবণকে কার্বনেট লবণ বলা হয়। যেমন— সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি লবণের সাধারণ নাম ও রাসায়নিক নাম লক্ষ কর।

খাবার সোডা	=	সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট	NaHCO ₃
সাবান	=	সোডিয়াম স্টিয়ারেট	C ₁₇ H ₃₅ COONa
কাপড় কাচা সোডা	=	সোডিয়াম কার্বনেট	Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O
খাবার লবন	=	সোডিয়াম ক্লোরাইড	NaCl
তুঁতে	=	কপার সালফেট	CuSO ₄ ·5H ₂ O

সোডিয়াম ক্লোরাইড যে একটি লবণ তার যৌক্তিক প্রমাণ

তিনটি কাচের বিকার নাও। একটিতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড, একটিতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ এবং অপরটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ নাও। তিনটি দ্রবণই দেখতে বর্ণহীন।

- (১) প্রথম বিকারে নীল লিটমাস কাগজ ভিজাও। লিটমাস কাগজ লাল হবে। অতএব প্রথম বিকারের দ্রবণ এসিড।
- (২) দ্বিতীয় বিকারের দ্রবণে লাল লিটমাস কাগজ ভিজাও। লিটমাস কাগজ নীল হবে। অতএব দ্বিতীয় বিকারের দ্রবণটি ক্ষার।
- (৩) তৃতীয় বিকারের দ্রবণে লাল বা নীল দুই ধরনের লিটমাস কাগজই ভিজাও। রঙের কোনো পরিবর্তন হলো না। অতএব তৃতীয় বিকারের দ্রবণটি লবণ।

তৃতীয় বিকারে তোমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণের দ্রবণ নিয়েছিলে। লবণ অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী কোনোটিই নয়। অম্ল ও ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় বলে লবণ সাধারণত একটি নিরপেক্ষ যৌগিক পদার্থ। সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ একটি নিরপেক্ষ যৌগ। তাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ নির্দেশকের রঙের কোনো পরিবর্তন করে না। তোমরা ৪.৪ নং পরীক্ষায় বিভিন্ন নির্দেশকের সাথে অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে রঙের পরিবর্তন লক্ষ করেছ। এবার লবণের জলীয় দ্রবণের সাথে ঐ নির্দেশকগুলোর রঙের পরিবর্তন হয় কিনা তা পরীক্ষা করে অনুরূপ একটি ছকে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- পাতলা এসিডের সাথে ধাতু বিক্রিয়া করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হয়?

ক. হাইড্রোজেন	খ. অক্সিজেন
গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড	ঘ. নাইট্রোজেন
- কপার (II) অক্সাইডকে পাতলা সালফিউরিক এসিডের সাথে গরম করলে কোন পদার্থটি উৎপন্ন হয়?

ক. কপার (II) সালফেট + পানি	খ. কপার (II) সালফেট + হাইড্রোজেন
গ. কপার হাইড্রোক্সাইড + পানি	ঘ. কোনো বিক্রিয়া হয় না
- নিচের কোনটি লবণ?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড	খ. অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড
গ. ক্যালসিয়াম অক্সাইড	ঘ. ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড
- ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে ক্ষারকের জলীয় দ্রবণ মিশালে কী উৎপন্ন হয়?

ক. কোনো বিক্রিয়া হয় না	খ. লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়
গ. ধাতুর হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে	ঘ. ভিন্ন ধরনের লবণ উৎপন্ন হয়
- H_3PO_3 যৌগটি এসিড কারণ-
 - এতে প্রতিস্থাপন যৌগ্য 'H' পরমাণু আছে
 - এটি দ্বিক্ষারকীয় এসিড
 - এটি ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করতে সক্ষম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

মসুর ডাল বেশি পরিমাণে খাবার পর কারও কারও পাকস্থলিতে এসিড উৎপন্ন হয় এবং পেটে ব্যাথা অনুভূত হয়। এরকম পেটের ব্যাথা উপশমে কেউ কেউ খাবার সোডা গ্রহণ করে থাকে।

৬. সোডাটির রাসায়নিক নাম-

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ক. সোডিয়াম সালফেট | খ. সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট |
| গ. সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট | ঘ. সোডিয়াম কার্বনেট |

৭. উক্ত সোডার সাথে পাকস্থলীতে উৎপন্ন এসিডের বিক্রিয়া-

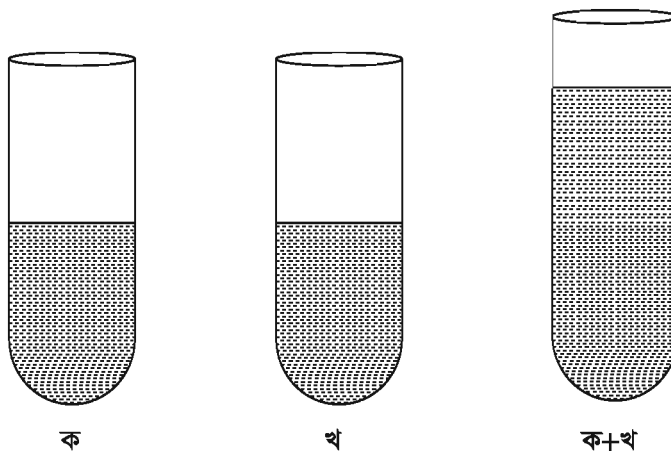
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
- প্রশমন বিক্রিয়া
- বিয়োজন বিক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. 'ক' ও 'খ' টেস্টটিউব দুইটিতে দুই ধরনের দুইটি যৌগের পাতলা দ্রবণ আছে। 'ক' ও 'খ' টেস্টটিউবে ফেনফথ্যালিন যোগ করায় 'ক' টেস্টটিউবে বর্ণহীন এবং 'খ' টেস্টটিউবে গোলাপী বর্ণ ধারণ করল। 'গ' টেস্টটিউবে 'ক' ও 'খ' এর দ্রবণ যোগ করলে উৎপন্ন যৌগসমূহের দ্রবণে ফেনফথ্যালিন এর বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না।



- ক. ফেনফথ্যালিন কী?
- খ. 'খ' যৌগের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'ক' টেস্টটিউবে 'খ' এর দ্রবণ যোগ করায় যে বিক্রিয়া ঘটে তা সমীকরণসহ লিখ।
- ঘ. বাসার থালাবাটি পরিষ্কার করার জন্য 'ক' অথবা 'খ' কোন টেস্টটিউবের যৌগ ব্যবহার করা সুবিধাজনক, যুক্তিসহ লিখ।
২. শুষ্ক চূনের মধ্যে পানি যোগ করায় একটি নতুন যৌগ উৎপন্ন হল। উৎপন্ন যৌগের সাথে ফেনফথ্যালিন দ্রবণ যোগ করার পর দ্রবণটি গোলাপী বর্ণ ধারণ করল। এরপর তাতে H_2SO_4 যোগ করা হলো।
- ক. উৎপন্ন যৌগটির নাম কী?
- খ. উৎপন্ন যৌগটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. উৎপন্ন যৌগের সাথে H_2SO_4 এর যে বিক্রিয়া হবে তা সমীকরণসহ লিখ।
- ঘ. H_2SO_4 এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগসমূহ বিক্রিয়ক যৌগ দুইটি থেকে ভিন্দধর্মী- ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

পানির খরতা

পানি একটি যৌগিক পদার্থ। দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগের ফলে পানি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিতে পানিই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। পৃথিবীর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ পানি ও এক ভাগ স্থল। প্রকৃতিতে পানি কঠিন, তরল ও বায়বীয় এ তিন অবস্থায় পাওয়া যায়।

অন্য বস্তুকে দ্রবীভূত করার প্রবল ক্ষমতা থাকায় পানিকে সার্বিক দ্রাবক বলা হয় এবং এজন্য প্রকৃতিতে পানি বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। এ অধ্যায়ে আমরা পানির একটি বিশেষ দিক পানির খরতা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

উৎস ও স্থানভেদে পানির প্রকারভেদ

উৎপত্তিস্থল অনুসারে পানিকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন (১) বৃষ্টির পানি (২) ঝরনার পানি (৩) নদীর পানি ও (৪) সমুদ্রের পানি।

(১) **বৃষ্টির পানি** : প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। পুকুর, খালবিল, নদীনালা ও সমুদ্রের পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টিরূপে পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ বৃষ্টির পানিতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক এসিড, বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালি, রোগজীবাণু প্রভৃতি মিশে থাকে। তাই বৃষ্টি শুরুর হওয়ার পর প্রথমদিকের পানি বিশুদ্ধ নয়। দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হলে শেষের দিকের পানি তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির পানি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জীবনের জন্য এবং কৃষিকাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

(২) **ঝরনা ও গভীর নলকূপের পানি** : বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন সচ্ছিদ্র কঠিন পদার্থ যেমন-মাটি, বালি, বালি-পাথর, পাথর ইত্যাদির স্তর ভেদ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করার সময় পরিস্রুত হয়ে এমন এক স্তরে উপনীত হয় যে তা ভেদ করে পানি আর প্রবেশ করতে পারে না। এ অভেদ্য স্তরে থাকে কাদা, গ্রানাইট, গ্রেট ইত্যাদি। এ অভেদ্য স্তরের উপর পানি জমা হতে থাকে এবং তারপর এ পানি ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে।

ঝরনার পানিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। এ জন্য ঝরনার পানিকে খনিজ পানি (Mineral Water) বলে।

(৩) **নদীর পানি** : বৃষ্টির পানিই প্রধানত নদীতে আসে। বৃষ্টির পানি, ঝরনা ও তুষার গলা পানি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে। এ সময়ে প্রবাহমান পানি ভূপৃষ্ঠের জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত করে এবং অদ্রবীভূত পদার্থ পানিতে ভাসমান থাকে। নদীর পানিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। তা ছাড়া নদীর পানিতে রোগজীবাণুও থাকে।

(৪) **সমুদ্রের পানি** : নদীর পানি সমুদ্রে এসে পড়ে। এ পানিতে অনেক ভাসমান পদার্থ থাকে। সমুদ্রের পানিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, সালফেট, কার্বনেট, আয়োডাইড ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। সমুদ্রের পানিতে ধাতব লবণের পরিমাণ প্রায় ৩.৬%। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণের পরিমাণ ২.৬৩%। এ জন্য সমুদ্রের পানি থেকে খাবার লবণ তৈরি করা হয়।

পানির খরতা, মৃদু পানি ও খর পানি

প্রাকৃতিক পানিকে দ্রবীভূত লবণের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন- (১) মৃদু পানি ও (২) খর পানি।

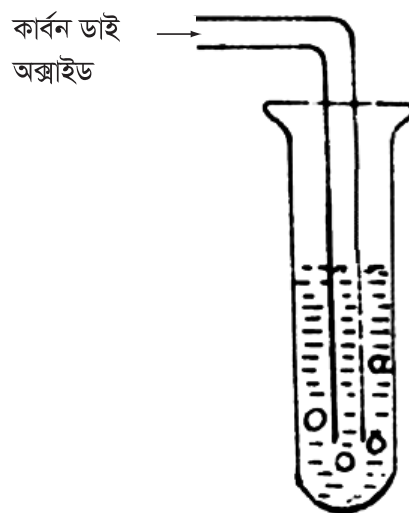
যে পানিতে অল্প সাবানে সহজেই প্রচুর ফেনা হয় তাকে মৃদু পানি বলে। বৃষ্টির পানি, পুকুরের পানি, রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি মৃদু পানি। প্রচুর সাবান খরচ করেও যে পানিতে সহজে ফেনা হয় না তাকে খর পানি বলে। সমুদ্রের পানি, ঝরনার পানি, নদীর পানি, গভীর নলকূপের পানি খর পানি। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য মৃদু পানিই উত্তম। প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই সবচেয়ে মৃদু।

পানির খরতার কারণ

আগেই বলা হয়েছে, যে পানিতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, অনেক সাবান খরচ করার পর ফেনা হয় সেই পানিকে খর পানি বলে। এখন প্রশ্ন হল পানিতে এমন কী পদার্থ দ্রবীভূত থাকে যা পানিকে খর করে? পানিতে কী কী পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে পানি খর হয় তা আমরা নিচের পরীক্ষাটি থেকে জানতে পারব।

পরীক্ষা ৫.১ : একটা বড় টেস্ট টিউবে পরিষ্কার চুনের পানি বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নাও এবং এতে ৪/৫ মিনিট ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা কর। এ সময়ে চুনের পানিতে কী পরিবর্তন হল? পরিবর্তনটি নিচের ছক অনুযায়ী তোমাদের খাতায় লিখে রাখ।

এবার দ্রবণটিতে আরও ৩/৪ মিনিট ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা কর। ঘোলা চুনের পানির অন্য কোনো পরিবর্তন দেখলে কি? হ্যাঁ পরিষ্কার চুনের পানির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে প্রথমে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হয়। ফলে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যায়। এর মধ্যে আরও ৩/৪ মিনিট কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট উৎপন্ন হয়। তাই চুনের পানি আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। টেস্ট টিউবের এ দ্রবণটিকে ‘ক’ দ্বারা চিহ্নিত কর। পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর জন্য এটি প্রয়োজন হবে।



চিত্র ৫.১ :
পানির খরতার পরীক্ষা

ছক ৫.১ : ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট দ্রবণ (খর পানি) প্রস্তুতি

পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
(১) পরিষ্কার চুনের পানিতে ৪/৫ মিনিট ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা কর।	চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেল।	পরিষ্কার চুনের পানি কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করেছে।
(২) এর মধ্যেও আরও ৩/৪ মিনিট ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা কর।	ঘোলা চুনের পানি পরিষ্কার হয়ে গেল।	অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মধ্যে আরও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট তৈরি হয় এবং এ জন্য চুনের পানি আবার পরিষ্কার হয়ে যায়।

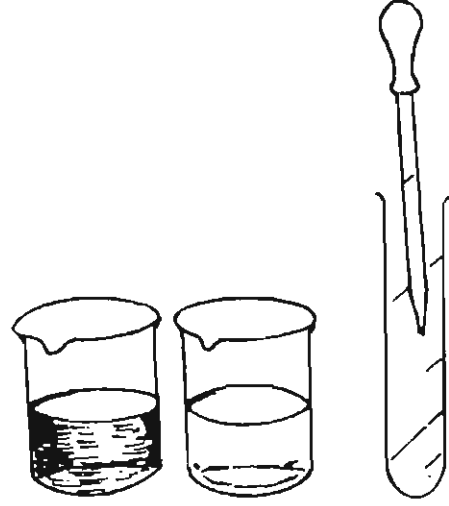
পরীক্ষণ ৫.২ : দুইটি বিকার নাও।

দুইটি বিকারের একটিতে সাবান পানির দ্রবণ এবং অন্যটিতে ফুটানো ঠান্ডা পানি নাও। একটি ড্রপারও লাগবে।

একটি টেস্ট টিউবে ২ ml ঠান্ডা ফুটানো পানি নাও এবং তাতে ড্রপারের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় সাবান পানির দ্রবণ মিশিয়ে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নাও। কত ফোঁটা সাবান পানির দ্রবণ মিশালে তা মনে রাখবে। সাবান পানির দ্রবণ মিশানোর সময় দেখবে যে এমন এক সময় আসবে যখন এক ফোঁটা সাবান দ্রবণ মিশিয়ে ঝাঁকানোর সাথে সাথে ঝকঝকে ফেনা হবে।

এ ফেনা তৈরি করতে কত ফোঁটা সাবান পানির দ্রবণ লেগেছে তা তোমাদের খাতায় লিখে রাখবে।

এবার অন্য একটি টেস্ট টিউবে ২ ml 'ক' দ্রবণ নিয়ে তাতে ড্রপার দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় সাবান পানির দ্রবণ মিশাও। ফেনা তৈরি করতে এবার কত ফোঁটা সাবান পানির দ্রবণ লেগেছে? ফুটানো পানি ও 'ক' দ্রবণে ফেনা তৈরির পর কোনো পার্থক্য বুঝতে পারলে কী?

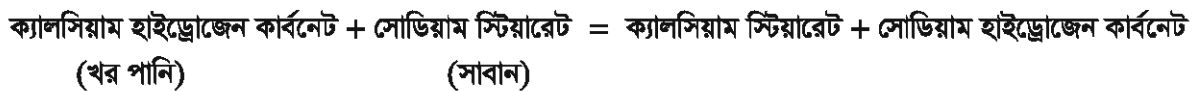


চিত্র ৫.২ : পানির খরতার পরীক্ষা

ফেনা তৈরি করতে ফুটানো পানির চেয়ে 'ক' দ্রবণে অনেক বেশি সাবানের পানি মিশাতে হয়েছে তাই না। এবার বলতে পারবে কোনটি খর পানি আর কোনটি মৃদু পানি?

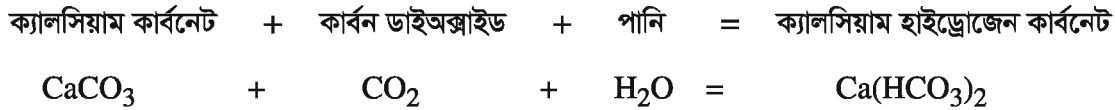
উপরের পরীক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি পানিতে যে সব পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে পানি খর হয় তাদের মধ্যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট একটি। প্রকৃতপক্ষে ক্যালসিয়ামের কোনো কোনো লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকলে পানি খর হয়। ম্যাগনেসিয়ামের লবণ দ্রবীভূত থাকলেও পানি খর হয়। অনেক সময় ক্যালসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পানিতে দ্রবীভূত থেকে পানিকে খর করে। তাহলে আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুদ্বয়ের দ্রবণীয় হাইড্রোজেন কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত থাকার কারণে পানি খর হয়। আয়রন বা লোহার লবণের উপস্থিতিও পানিকে খর করে।

খর পানিতে কাপড় কাচলে অনেক বেশি সাবান খরচ হয়। সাবানের মধ্যে সোডিয়াম স্টিয়ারেট আছে। সোডিয়াম স্টিয়ারেট পানিতে দ্রবণীয় বা কাপড়ের ময়লার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ময়লা পরিষ্কার করে। খর পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় এগুলোর সাথে সোডিয়াম স্টিয়ারেটের বিক্রিয়া ঘটে অদ্রব্য অধঃক্ষেপ হিসেবে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন স্টিয়ারেট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অধঃক্ষেপ গাদ হিসাবে পানিতে ভাসতে থাকে। ফলে সাবান ক্ষয় হতে থাকে কিছু ফেনা হয় না। শাব্দিক সমীকরণের সাহায্যে কথাগুলোকে এভাবে প্রকাশ করা যায়



পানিতে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সাবান বা সোডিয়াম স্টিয়ারেটের সাথে বিক্রিয়া করে নিঃশেষিত হওয়ার পর অবশিষ্ট সাবান পানিতে ফেনার সৃষ্টি করে। এভাবে সাবান নষ্ট করার পর খর পানি মৃদু হয়। কাপড় কাচতে খর পানির পরিবর্তে মৃদু পানি ব্যবহার করা কেন লাভজনক বুঝতে পেরেছে কি?

এখন প্রশ্ন হল পানিতে কী করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এলো? আমরা জানি পৃথিবীর অনেক স্থানে চুনাপাথর সমৃদ্ধ আছে। বাংলাদেশে সিলেটের ছাতকে, চট্টগ্রামের সেন্টমার্টিনস দ্বীপে, বগুড়ার, জয়পুরহাটে প্রচুর পরিমাণ চুনাপাথর আছে। চুনাপাথর হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। আর বাতাসে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। বাতাসের এ কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত হয়ে চুনাপাথরের সংস্পর্শে আসে। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি ও চুনাপাথর মিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



তাহলে এবার বুঝতে পেরেছ ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এলো কী করে এবং পানি খর হয় কীভাবে? পানির খরতাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) অস্থায়ী খরতা এবং (খ) স্থায়ী খরতা

পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন ধাতুর হাইড্রোজেন কার্বনেট লবণ দ্রবীভূত থাকার জন্য পানির যে খরতা হয় তাকে পানির অস্থায়ী খরতা বলে। পানির এ খরতাকে সহজেই দূর করা যায় বলে একে অস্থায়ী খরতা বলে। পানি ফুটিয়ে অথবা দ্রবণীয় হাইড্রোজেন কার্বনেটকে অদ্রবণীয় কার্বনেট রূপে অধঃক্ষিপ্ত করে পানির এ খরতা দূর করা যায়।

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকার কারণে পানির যে খরতা হয় তাকে পানির স্থায়ী খরতা বলে। পানির স্থায়ী খরতাকে সহজে দূর করা যায় না।

খরতা দূরীকরণের উপায়

আমরা জেনেছি পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতির হাইড্রোজেন কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকার জন্য পানি খর হয়। সুতরাং ঐ সকল দ্রবীভূত লবণকে রাসায়নিকভাবে অদ্রবীভূত লবণে পরিণত করে পানি থেকে পৃথক করলে পানির খরতা দূর হয়। পানির খরতা দূরীকরণকে পানির মৃদুকরণ বলে।

পানি ফুটিয়ে পানির অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

পরীক্ষা ৫.৩ : এ পরীক্ষা ৫.১ এ প্রস্তুতকৃত কিছু পরিমাণ ‘ক’ দ্রবণ ও সাবানের পানি প্রয়োজন। এ ছাড়াও একই রকমের দুটো টেস্ট টিউব, মোমবাতি বা স্পিরিট ল্যাম্প এবং কিছু সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ, কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম সালফেট ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দ্রবণ প্রয়োজন।

(ক) একটি টেস্ট টিউবে ২ ml ‘ক’ দ্রবণ ও অন্য একটি টেস্ট টিউবে ২ ml ক্যালসিয়াম সালফেট দ্রবণ নাও। এখন দ্রবণ দুইটিকে ১ মিনিট করে ফুটাও। কী দেখলে? ‘ক’ দ্রবণের টেস্ট টিউবে তলানি পড়েছে কি? এবারে টেস্ট টিউবের দ্রবণ দুইটি ঠান্ডা হওয়ার পর দুটোতে ৫ ফোঁটা সাবান দ্রবণ মিশিয়ে ভালভাবে ঝাকাও। কোন টিউবে কী পরিবর্তন দেখতে পেলো তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখে রাখ।

(খ) এবারে আরও দুটো টেস্ট টিউব নিয়ে তাতে ‘ক’ দ্রবণ ও ক্যালসিয়াম সালফেট দ্রবণ ২ ml করে নাও। দ্রবণ দুটিতে ২ ml করে সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ মিশাও। কী দেখছ? কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? এবারের টেস্ট টিউব দুইটিতে বেশি করে সাবানের দ্রবণ মিশিয়ে ভালভাবে ঝাকাও। কী দেখছ? তোমাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল খাতায় লিখে রাখ।

ছক ৫.২ : পানির অস্থায়ী ও স্থায়ী খরতা দূরীকরণ পরীক্ষা

ক্রমিক সংখ্যা	কর্ম পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া
১	(ক) ২ ml 'ক' দ্রবণ বা $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ দ্রবণ নাও। ১ মিনিট ধরে ফুটাও।	টেস্ট টিউবের তলায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়েছে। $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
	(খ) এবার টেস্ট টিউবের দ্রবণে ৫ ফোঁটা সাবান দ্রবণ মেশাও ও ভাল করে ঝাকাও।	ঝকঝকে সাবানের ফেনা তৈরি হয়েছে।
২	(ক) ২ ml ক্যালসিয়াম সালফেট দ্রবণ নাও। ১ মিনিট ধরে ফুটাও।	কোনো তলানি পড়েনি।
	(খ) টেস্ট টিউবের দ্রবণে ৫ ফোঁটা সাবান দ্রবণ মিশিয়ে ভাল করে ঝাকাও।	সাবানের ফেনা হয়নি।
৩	(ক) ২ ml 'ক' দ্রবণের সাথে কাপড় কাচা সোডা মেশাও।	ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়েছে। $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{CaCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
	(খ) দ্রবণে ৫ ফোঁটা সাবান দ্রবণ মেশাও ও ভাল করে ঝাকাও।	সাবানের ফেনা হয়েছে।
৪	(ক) ২ ml ক্যালসিয়াম সালফেট এর সাথে কাপড় কাচা সোডা মেশাও।	ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়েছে। $\text{CaSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{CaCO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4$
	(খ) দ্রবণে ৫ ফোঁটা সাবান দ্রবণ মেশাও ও ভাল করে ঝাকাও।	সাবানের ফেনা তৈরি হয়েছে।

উপরের পরীক্ষা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি :

- (১) পানির দুই রকমের খরতা আছে।
- (২) দ্রবণীয় হাইড্রোজেন কার্বনেট জনিত খরতা ফুটিয়ে দূর করা যায়। এ জাতীয় খরতাকে অস্থায়ী খরতা বলে।
- (৩) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সালফেট বা ক্লোরাইড লবণের উপস্থিতিতে পানি খর হলে তা ফুটিয়ে দূর করা যায় না। এজন্য ক্যালসিয়াম সালফেট দ্রবণকে তাপ দিয়ে তার মধ্যে সাবান দ্রবণ যোগ করলেও ফেনা হয় না। এ জাতীয় খরতাকে স্থায়ী খরতা বলে।

(৪) অস্থায়ী বা স্থায়ী উভয় প্রকার খরতাকে সোডিয়াম কার্বনেটের সাহায্যে দূর করা যায়। এ কারণে সোডিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত খর পানিতে সাবান যোগ করলেই সহজেই ফেনা হয়। সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম লবণের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করে। এ নিয়মেই পানির খরতা সাধারণত দূর করা যায়। এ পদ্ধতিকে সোডা প্রণালি বলে। এ ছাড়া পারমুটিট প্রণালিতে পানির স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার খরতা দূর করা যায়। এ পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী শ্রেণীতে বিস্তারিত জানতে পারবে।

খর পানি ও মৃদু পানির পার্থক্য : খর পানি ও মৃদু পানির কয়েকটি পার্থক্য নিচের ছকে দেখানো হল :

ছক ৫.৩ : খর ও মৃদু পানির পার্থক্য

খর পানি	মৃদু পানি
১। যে পানিতে অনেক সাবান দেওয়ার পরও সাবানের ফেনা হয় না তাকে খর পানি বলে।	১। যে পানিতে অল্প সাবানে খুব সহজেই সাবানের ফেনা হয় তাকে মৃদু পানি বলে।
২। পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের দ্রবণীয় ক্লোরাইড, সালফেট ও হাইড্রোজেন কার্বনেট উপস্থিতি থাকলে পানি খর হয়।	২। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির দ্রবণীয় লবণগুলো মৃদু পানিতে থাকে না।
৩। খর পানি ব্যবহার করলে গৃহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়।	৩। মৃদু পানি ব্যবহার করলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয় না।

খর পানি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

খর পানি ব্যবহারের অনেকগুলো অসুবিধা আছে, অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

(১) খর পানি ব্যবহারে সাবানের অপচয় ঘটে।

(২) খর পানি ব্যবহার করলে কারখানার বয়লারে, মোটর গাড়ির শীতক প্রকোষ্ঠে ও কেটলির তলায় অদ্রবণীয় ও তাপ অপরিবাহী ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি লবণের আবরণ পড়ে। বয়লারের গায়ে অদ্রবণীয় লবণের স্তর পড়ার কারণে বয়লারের তাপ পরিবাহিতা কমে যায়। ফলে জ্বালানি অপচয় ঘটে। বয়লার, কেটলিতে বা পানির পাইপে স্তর পড়ার কারণে পাইপের ব্যাসার্ধ কমে যায়। এমনকি পাইপ বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

(৩) কাপড় বা সুতাকে রং করার সময় খর পানি ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। কারণ খর পানির দ্রবীভূত লবণ বস্ত্রের রঙের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় পদার্থ সৃষ্টি করে এবং রঙের অপচয় ঘটে।

খর পানি ব্যবহারের কয়েকটি অসুবিধার কথা আমরা জানলাম। এখন ভেবে দেখ খর পানির ব্যবহারের কোনো সুবিধা আছে কিনা? খর পানি ব্যবহারের কয়েকটি সুবিধা নিচে আলোচনা করা হল।

(১) খর পানিতে দ্রবীভূত লবণগুলো দেহ গঠনের উপাদান বলে খর পানি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

(২) হাড় ও দাঁতের অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়াম লবণ হওয়ায় খর পানি শিশুর হাড় ও দাঁত গঠনে সহায়ক।

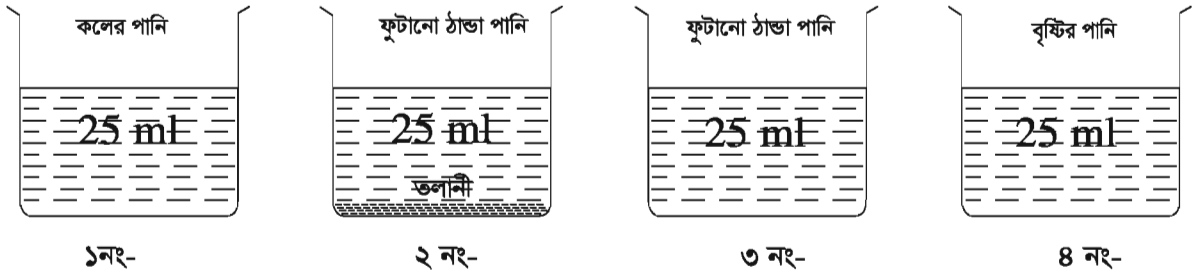
(৩) খর পানি অনেক সময় চর্মরোগ, বাতরোগ, বদহজম প্রভৃতি রোগের ওষুধরূপে কাজ করে।

এ অধ্যায়ে আমরা খর পানি ব্যবহারের অসুবিধাগুলো জেনেছি। খর পানি ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হল এ পানিতে কাপড় কাচলে প্রচুর সাবানের অপচয় হয়। সাবানের পরিবর্তে আজকাল অনেক পরিষ্কারক দ্রব্য যেমন, ডিটারজেন্ট, জেট পাউডার বাজারে বেিরিয়েছে। এগুলো তরল বা পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। এগুলো খর পানির দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা আয়রন লবণে সাথে বিক্রিয়া না করে সরাসরি ফেনা তৈরি করে এবং ময়লা পরিষ্কার করে। এ জন্য খর পানিতে কাপড় কাচার জন্য সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- নিচের কোন দ্রবণীয় লবণের জন্য পানি খর হয় ?
 ক. সোডিয়াম বাইকার্বনেট
 খ. ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট
 গ. পটাসিয়াম কার্বনেট
 ঘ. অ্যামোনিয়াম কার্বনেট
- অস্থায়ী খর পানিকে ফুটালে নিচের কোনটি উৎপন্ন হয়?
 ক. সোডিয়াম কার্বনেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি
 খ. সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি
 গ. ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি
 ঘ. ক্যালসিয়াম কার্বনেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি
- স্থায়ী খর পানি ও অস্থায়ী খর পানির জন্য কোন উক্তিটি সত্য?
 ক. স্থায়ী খর পানিকে কখনও মৃদু পানিতে পরিণত করা যায় না
 খ. অস্থায়ী খর পানি নিজে আস্তে আস্তে মৃদু পানিতে পরিণত হয়
 গ. অস্থায়ী খর পানি ফুটিয়ে মৃদু করা যায়
 ঘ. অস্থায়ী খর পানি অপেক্ষা স্থায়ী খর পানিতে ফেনা তৈরির জন্য সব সময় অধিক সাবানের প্রয়োজন হয়।
- বয়লার অথবা কেটলির তলায় কিসের স্তর পড়ে?
 ক. ক্যালসিয়াম কার্বনেট
 খ. সোডিয়াম সালফেট
 গ. অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট
 ঘ. ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড



- ১ম বিকারে ১০ ফোটা তরল সাবান মিশিয়ে ঝাঁকানোর পর সাবানের ফেনা তৈরি হল।
 ২য় বিকারে ৩ ফোটা তরল সাবান মিশিয়ে ঝাঁকানোর পর সাবানের ফেনা তৈরি হল।
 ৩য় বিকারে ৭ ফোটা তরল সাবান মিশিয়ে ঝাঁকানোর পর সাবানের ফেনা তৈরি হল।
 ৪র্থ বিকারে ৩ ফোটা তরল সাবান মিশিয়ে ঝাঁকানোর পর সাবানের ফেনা তৈরি হল।

উপরের তথ্যের আলোকে ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

- কোন বিকারে অস্থায়ী খর পানি ছিল-
 ক. ১নং
 খ. ২নং
 গ. ৩নং
 ঘ. ৪নং

৬. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ অথবা CaSO_4 , MgSO_4 ও $\text{CaCl}_2/\text{MgCl}_2$ লবণ কোন বিকারে উপস্থিত ছিল?

ক. ১নং ও ৩নং

খ. ৩নং

গ. ১নং

ঘ. ৪নং

৭. ২নং বিকারের পানিতে দ্রবীভূত লবণটি-

i. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

ii. CaSO_4

iii. CaCl_2

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মিনাদের বাসায় ট্যাপের পানি ফুটিয়ে পান করা হয়। যে পাতিলে তারা পানি ফুটায়, কিছুদিন পর দেখা গেল পাতিলের তলায় একটি আস্তরণ পড়েছে।

ক. পাতিলের তলায় আস্তরণটি কোন পদার্থের?

খ. আস্তরণ পড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আস্তরণ কীভাবে দূর করা যায়?

ঘ. মিনার পরিবার এভাবে পানি ফুটিয়ে খেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে- ব্যাখ্যা কর।

২. নাসিমা স্কুল ছুটির দিনে টিউবওয়েলের পানিতে সাবান দিয়ে কাপড় ধোয়ার সময় দেখল সহজে ফেনা হচ্ছে না কিন্তু পিচ্ছিল পদার্থ তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া ধোয়া কাপড়গুলোও ভালোভাবে পরিষ্কার হয়নি।

ক. টিউবওয়েলটির পানি কোন ধরনের?

খ. কাপড় ধোয়ার সময় ফেনা উৎপন্ন না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হবে?

ঘ. নাসিমা বৃষ্টির পানিতে কাপড় কাচলে সাবানের অপচয় হবে কিনা- মতামত দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি

বিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিষয়। ব্যবহারিক কাজ ছাড়া বিজ্ঞান কখনও পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য জানার সাথে সাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলো সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, এ বিষয়ের পাঠ অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে। কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। তোমরা নিজ হাতে কাজ করে বিজ্ঞান শিখলে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানাগার, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানাগার নেই এবং বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানাগার নেই, যন্ত্রপাতি নেই বলে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ বাদ দেওয়া যাবে না। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজের জন্য সব সময়ই যে উন্নতমানের দামী যন্ত্রপাতি লাগে এ ধারণা ঠিক নয়। আমাদের চারপাশের পরিবেশে অতি সহজে পাওয়া যায় এমন জিনিসপত্র ব্যবহার করেও বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়। এ জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল শেখার আগ্রহ ও সদিচ্ছা। এ অধ্যায়ে আমরা ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রশ্ন হল ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি বলতে আমরা কী বুঝি? হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখার জন্য আমরা ল্যাবরেটরিতে সাধারণত যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করি তাকে ল্যাবরেটরি সাধারণ প্রণালি বলে। এ ধরনের পরীক্ষার জন্য সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি বা দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান কক্ষ থাকলেই চলে। বিজ্ঞানের জন্য পৃথক কক্ষ না থাকলেও শ্রেণীকক্ষেই আমরা বিজ্ঞানাগার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

ছোটখাটো এ সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বাইরের থেকে কেনার প্রয়োজন নেই। একটু চেষ্টা করলে তোমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। এসো ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে আমরা ব্যবহারিক কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করি।

কয়েকটি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকরণ

(ক) কাচনল কাটা : ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার। সব যন্ত্রপাতি সব সময় পাওয়া যায় না, নিজে তৈরি করে নিতে হয়। বিশেষ করে কোনো যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ যেমন নির্গম নল, জেটনল, রবারের সংযোগ নল, প্রয়োজনীয় ছিদ্রসহ সঠিক মাপের কর্ক ইত্যাদি নিজেরাই ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে নিতে হয়।

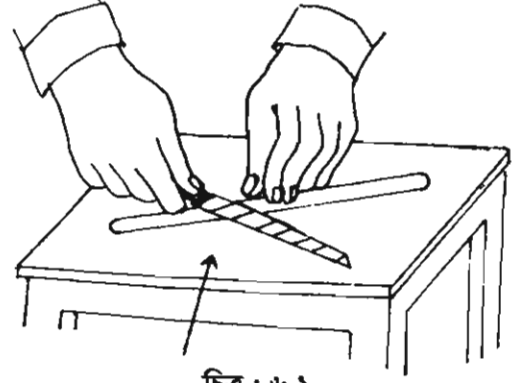
উদ্দেশ্য : নির্দিষ্ট মাপের কাচনল তৈরি।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : একটি ত্রিধারী রেতি, কাচনল, স্পিরিট ল্যাম্প, অ্যাসবেসটস।

কাজের প্রণালি

(১) একটি পরিষ্কার সরু কাচনল নিয়ে সমতল টেবিলের উপর স্থাপন কর এবং বাম হাত দিয়ে চেপে ধর।

(২) যে স্থানে নলটি দ্বিখন্ডিত করবে সে স্থানের উপর রেতিটির একটি ধার শক্ত করে চেপে ধরে রেতিটিকে সামনের দিকে টেনে আন।



চিত্র : ৬.১

(৩) নলটি উঠিয়ে হাতে নাও। দাগের বিপরীত দিকে দুই পাশে দুই হাতের বুড়ো আঙুল স্থাপন কর এবং বুড়ো আঙুল দুটো দিয়ে নলের গায়ে চাপ দিয়ে নলের প্রান্ত দুটো নিচের দিকে টেনে আন। নলটি দাগ বরাবর দ্বিখন্ডিত হবে।



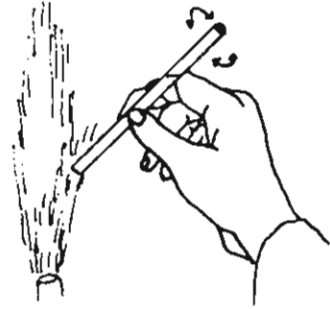
চিত্র : ৬.২

(৪) এভাবে নলটিকে কেটে নল থেকে প্রয়োজনমত টুকরো তৈরি করে নাও। লক্ষ কর কাটা প্রান্ত বেশ ধারালো। একে মসৃণ করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধর এবং আস্তে আস্তে ঘুরাও।



চিত্র : ৬.৩

(৫) শিখার মধ্যে নলের প্রান্তটি লাল তপ্ত হলে শিখা থেকে সরিয়ে নাও এবং অ্যাসবেসটাস বোর্ডের উপর রেখে ঠান্ডা কর।



চিত্র : ৬.৪

সতর্কতা

- (১) রেতিটি দিয়ে নলের গায়ে কেবলমাত্র একটি দাগ দেবে।
- (২) নলের লাল তপ্ত প্রান্তটিতে হাত দেবে না।
- (৩) স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধরা নলের প্রান্তটি আস্তে আস্তে ঘুরাবে। তা না হলে নলটি ফেটে যেতে পারে।

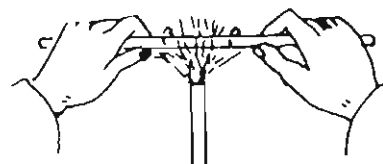
(খ) কাচনল বাঁকানো

উদ্দেশ্য : প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ত্রিধারী রেতি, স্পিরিট ল্যাম্প, অ্যাসবেসটস, চাঁদা ও পেন্সিল।

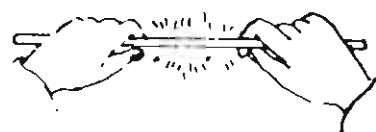
কাজের প্রণালি

(১) রেতি দিয়ে কাচনলটি কেটে পরিমাপ মত একটি টুকরো কর।



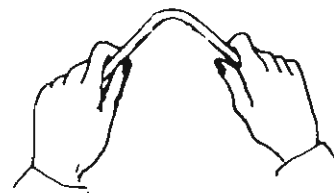
চিত্র : ৬.৫

(২) নলটি বাঁকিয়ে যত ডিগ্রী কোণ করতে চাও অ্যাসবেসটস বোর্ডের উপর চাঁদার সাহায্যে ততটুকু একটি কোণ এঁকে রাখ।



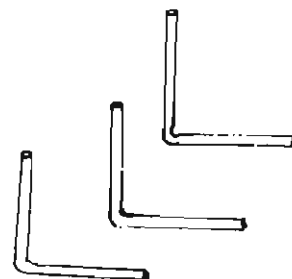
চিত্র : ৬.৬

(৩) পরিষ্কার কাচনলটিকে চিত্রের মত দুই হাতে ধরে শিখার উপর ধর এবং আস্তে আস্তে ঘুরাতে থাক। যাতে সব দিকে সমান উত্তপ্ত হয়। নলটির যে স্থানে বাকাতে হবে ঠিক সে স্থানটি শিখার উপর রাখবে।



চিত্র : ৬.৭

(৪) উত্তপ্ত স্থানটি নরম হলে নলটি নিজের ভারেই বাঁকতে শুরু করবে। এখন নলটিকে শিখা থেকে সরিয়ে এনে নরম থাকতে নলের দুই প্রান্ত ধরে প্রয়োজন মত চাপ দিয়ে অ্যাসবেসটস বোর্ডের উপর অঙ্কিত কোণের সমান কর। নলটি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।



চিত্র : ৬.৮

সতর্কতা

(১) উত্তপ্ত নলটি কোনো অবস্থাতেই হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না এবং টেবিলের উপর রাখবে না।

(২) নলটি সমানভাবে উত্তপ্ত করার জন্য আস্তে আস্তে ঘুরাতে হবে, না হলে এক দিকে উত্তপ্ত হলে নলটি বাঁকানো যাবে না এমনকি ফেটেও যেতে পারে।

- (৩) শিখাটি যেন অন্তত ৪-৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ নলকে উত্তপ্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখবে।
- (৪) বাঁকানো নলের কৌণিক শীর্ষ যেন কুঁচকে না যায়। চিত্র ৬.৮ দেখ। প্রথম নল দুইটি বাঁকানো ভাল হয়নি, শেষের নলটি বাঁকানো সঠিক হয়েছে।
- (৫) উত্তপ্ত নলটি যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে ঠান্ডা করবে।

(গ) জেটনল প্রস্তুত করা

উদ্দেশ্য : জেটনল এবং ওয়াশ বোতলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করা।

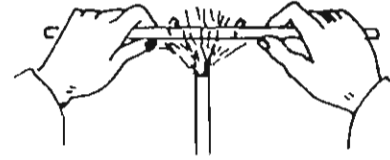
জেটনল কী ?

তোমরা কালি তোলার ড্রপার দেখেছ। এতে একটি কাচনলের এক প্রান্ত মোটা এবং অন্য প্রান্ত ক্রমশ সরু হয়ে কৈশিক নলে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের নলকে বলে জেটনল।

কাজের প্রণালি

(১) একটি সরু পাতলা কাচনল ১০ সেন্টিমিটার লম্বা করে কেটে নাও।

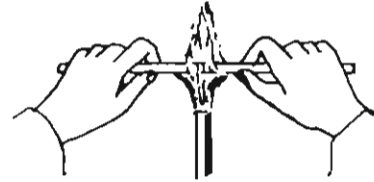
(২) ভূমির সমান্তরাল করে নলটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর ধর যেন নলের মাঝামাঝি স্থান শিখার উপর থাকে।



চিত্র : ৬.৯

(৩) নলটি আস্তে আস্তে ঘুরাও।

(৪) উত্তপ্ত স্থান যথেষ্ট নরম হলে নলটি শিখা থেকে সরিয়ে আন এবং উভয়দিকে সমান জোরে টানতে থাক। উত্তপ্ত স্থানটি থেকে নলটি সরু হয়ে যাবে। লক্ষ রাখবে, টানার সময় নলটি যেন সোজা থাকে, অন্যথায় জেটনল বাঁকা হয়ে যাবে। নলটি খুব জোরে বা তাড়াতাড়ি টানবে না তাহলে নলটি ছিঁড়ে যাবে এবং জেটের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

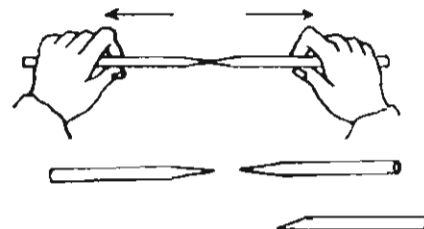


চিত্র : ৬.১০

(৫) অ্যাসবেসটস বোর্ডের উপর রেখে নলটি ঠান্ডা কর। নলটি ঠান্ডা হলে রেতির সাহায্য কৈশিক নলের মাঝখানে নলটি দ্বিখণ্ডিত কর। প্রয়োজনে কৈশিক নলের কিছু অংশ কেটে নাও।

সতর্কতা

- (১) নলটির উত্তপ্ত স্থান যথেষ্ট নরম না হলে সুক্ষ্ম জেট প্রস্তুত সম্ভব নয়। তাই নলটি যাতে যথেষ্ট উত্তপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে।
- (২) নলটি টানার সময় দুই প্রান্ত সমান রেখে খুব ধীরে টানবে।
- (৩) গরম নলটি হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না।



চিত্র : ৬.১১

(খ) কর্ক ছিদ্র করা

উদ্দেশ্য : (১) কর্ক ছিদ্র করতে শেখা

(২) ওয়াশ বোতল ফিট করতে শেখা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : কর্ক স্কুইজার, কর্ক বোরার, কর্ক, পানিপূর্ণ বিকার।

কর্ক স্কুইজার : এটি এক ধরনের চাপ যন্ত্র। এর মধ্যে কর্ক ঢুকিয়ে হাতলটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে চেপে দিলে কর্কটি একটি ঘূর্ণায়মান রোলারের চাকায় পিস্ট হয়ে সংকুচিত হয়। সামান্য বড় কর্ককে এভাবে সংকুচিত করে যন্ত্রে ব্যবহার করলে ছিপিটি অধিক শক্ত ও বায়ুরোধী হয়।

কর্ক বোরার : এটি কর্ক ছিদ্র করার এমন একটি যন্ত্র যা বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত কতগুলো নলের সমষ্টি। নলগুলোর এক মাথা ধারালো করা থাকে। অন্য মাথায় হাতল লাগানো থাকে।

কাজের ধারা

(১) একটি সুবিধা মত কর্ক বেছে নিয়ে ২/৩ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখ। ভেজা কর্ককে স্কুইজারের মধ্যে চেপে সংকুচিত কর।

(২) কর্কে যে মাপের ছিদ্র দরকার তার চাইতে সামান্য ছোট মাপের একটি বোরার নাও এবং এর ধারালো প্রান্ত পানি বা গ্লিসারিনে ভিজিয়ে নাও।

(৩) সবু দিকটা উপরের দিকে রেখে কর্কটিকে টেবিলের উপর রাখ। বাম হাত দিয়ে কর্কটি টেবিলের উপর চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে যেখানে ছিদ্র করবে সেখানে কর্ক বোরারের ধারালো প্রান্ত চেপে ধর।

(৪) বোরার নলটি খাড়া রেখে বোরারটি ধীরে ধীরে ডানে বাঁয়ে ঘুরাতে থাক। নলটি কাত হলে ছিদ্র সোজা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বোরার কর্কের অন্য প্রান্তে না পৌঁছায় ততক্ষণ এভাবে ঘুরাতে থাক।



চিত্র ৬.১২ : কর্ক ছিদ্রকরণ

(৫) কর্কের তলদেশে বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে বোরারটি টেনে বের কর এবং কর্কটি ঘুরিয়ে বিপরীত দিক থেকে নির্দিষ্ট স্থান বরাবর বোরার বসিয়ে ছিদ্রটি পূর্ণ কর।

সতর্কতা

(১) বোরারটি সর্বদা খাড়াভাবে চেপে রাখবে।

(২) তাড়াহুড়ো করে কর্ক ছিদ্র করলে বা স্কুইজার চাপলে কর্ক ফেটে যাবে।

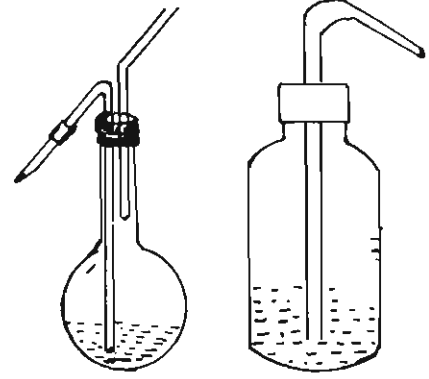
(৩) কর্কটি কখনও মোটা প্রান্ত থেকে ছিদ্র করবে না। এতে ছিদ্র বাকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) ওয়াশ বোতল তৈরি করা

উদ্দেশ্য : ল্যাবরেটরীর কাজের জন্য ওয়াশ বোতল তৈরি করা।

ওয়াশ বোতল কী?

একটি বায়ুরোধী গোলভলী ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ থাকে। ছিপির মাঝ দিয়ে দুটো নল ঢুকানো থাকে। একটি নল পাত্রের প্রায় তলা পর্যন্ত এবং অন্য নলটি ছিপির একটু নিচ পর্যন্ত ঢুকানো হয়। লম্বা নলটির বাইরের অংশ 60° কোণে বাঁকানো থাকে এবং প্রান্তে একটি জেটনল যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় নলটির বাইরের অংশ 120° কোণে বাঁকানো থাকে। এ ধরনের বোতলকে বলে ওয়াশ বোতল। কর্ক খুলে বোতলটিতে পানি ভর্তি করে কর্কটি পুনরায় ভাল করে বন্ধ করতে হয়। ছোট নলটির বাইরের প্রান্তে ফুঁ দিলে জেটের মধ্যদিয়ে তীব্র ধারায় পানি বের হয়। এ পানি ল্যাবরেটরীর অনেক যন্ত্রাংশ ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। আজকাল এ ধরনের কাচের ওয়াশ বোতলের পরিবর্তে প্লাস্টিকের ওয়াশ বোতল ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্র ৬.১৩ : ওয়াশ বোতল

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

একটি চ্যাপ্টাতলী ফ্লাস্ক (৫০০ ml), 120° কোণে বাঁকানো ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটি নল, 60° কোণে বাঁকানো ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা একটি নল, ৫ সেন্টিমিটার একটি জেট নল, ৩ সেন্টিমিটার লম্বা রবারের নল ও দুই ছিদ্র বিশিষ্ট একটি ছিপি।

কাজের ধারা

- (১) উপরের যন্ত্রাংশগুলো সংগ্রহ কর অথবা নতুনভাবে বানিয়ে নাও।
- (২) ফ্লাস্কটি পানিপূর্ণ করে ছিপিটি বায়ুরোধী করে ফ্লাস্কের মুখে আটকে দাও। ওয়াশ বোতল তৈরি সম্পন্ন হল।

সতর্কতা

- (১) সবগুলো কাচের নলের ব্যাস সমান হতে হবে।
- (২) কর্কটি যেন ফাটা এবং ছিদ্রটি যেন অতিরিক্ত ব্যাসযুক্ত না হয়। ছিপিটি বায়ুরোধী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

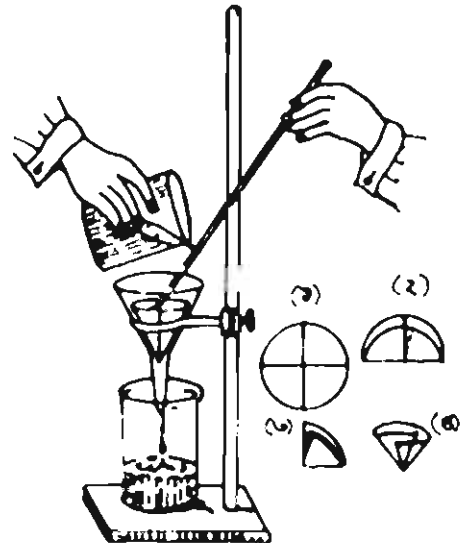
(৮) ছাকন কাগজ ভাঁজ করা

উদ্দেশ্য : ছাকন কাগজ ও ফিল্টার পেপার ভাঁজ করতে শেখা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ফিল্টার বা ছাকন কাগজ, ফানেল, গ্লাস রড, স্ট্যান্ড বা ধারক, পানিসহ বিকার।

কাজের ধারা

- (১) ফিল্টার কাগজটি চিত্র ৬.১৪ অনুযায়ী দুই ভাঁজ কর।
- (২) ভাঁজ করা কাগজটি চিত্রের ন্যায় আবার দুই ভাঁজ কর।
- (৩) চার ভাঁজ করা কাগজের একটি ভাঁজ খুলে একদিকে তিন ভাঁজ এবং অন্যদিকে এক ভাঁজ নিয়ে একে একটি ফানেলের মত গড়ন কর। এভাবে ফিল্টার কাগজটি দিয়ে একটি শঙ্কু বা কোণ তৈরি কর।



চিত্র ৬.১৪ : ছাকন কাগজ ভাঁজকরণ

(৪) এভাবে ভাঁজ করা ফিল্টার কাগজটি একটি ফানেলের মধ্যে বসাও এবং সামান্য পানি দিয়ে এমনভাবে ভিজাও যেন ফানেলের গায়ে কাগজটি সম্পূর্ণভাবে আটকে যায়। চিত্র ৬.১৪ অনুযায়ী ফানেলটিকে স্ট্যান্ডের সঙ্গে লাগাও। নিচে একটি পরিস্কার বিকার বসাও।

পাতন

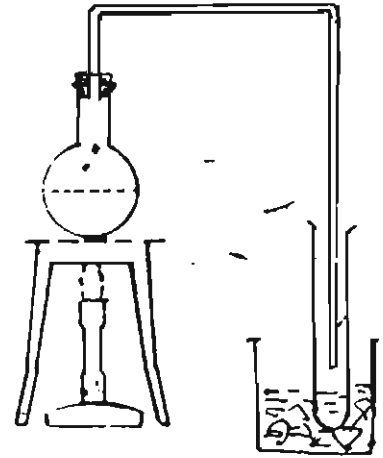
কোনো তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করলে বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্প শীতল করলে এটি আবার তরলে পরিণত হয়। এরূপ যুক্ত পদ্ধতিকে বলা হয় পাতন। এভাবে যে প্রণালিতে কোনো তরলকে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় তরল অবস্থায় পরিণত করা হয় তাকে বলা হয় পাতন। অর্থাৎ

তরলের পাতন = তরলের বাষ্পীভবন + বাষ্পের ঘনীভবন

লবণ ও পানির দ্রবণ থেকে লবণ ফিরে পেতে হলে দ্রবণকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করলে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। পাত্রের তলায় দানাদার লবণ পড়ে থাকে। এ পদ্ধতিকে বাষ্পীভবন বলে। এ প্রক্রিয়ায় দ্রাবক বা তরল পানি ফিরে পাওয়া যায় না, কারণ পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কঠিন ও তরল অথবা তরল ও তরলের মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত পদার্থ দুটোই ফিরে পেতে হলে পাতন প্রণালির সাহায্য নিতে হয়।

পরীক্ষা

চিত্র ৬.১৫ লক্ষ কর। একটি গোলতলী ফ্লাস্কে লবণ পানির দ্রবণ নাও। ফ্লাস্কের মুখ এক ছিদ্র বিশিষ্ট কর্ক দ্বারা বন্ধ কর। কর্কের ছিদ্রের মধ্যে দুইবার সমকোণে বাঁকানো নির্গম নল চিত্রের ন্যায় সংযুক্ত কর। নির্গম নলের অপর প্রান্তটি টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং টেস্ট টিউবটি বরফ মিশ্রিত ঠান্ডা পানির বিকারের মধ্যে স্থাপন কর। এবার গোলতলী ফ্লাস্কের দ্রবণটিকে বুনসেন বার্নার অথবা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দাও। পানি বাষ্প হয়ে নির্গম নলের মধ্যে দিয়ে আসার পথে কিছুটা ঠান্ডা হবে এবং অবশেষে বরফ মিশ্রিত ঠান্ডা পানির বিকারে রক্ষিত টেস্ট টিউবে এসে ঠান্ডায় ঘনীভূত হয়ে তরল পানিতে পরিণত হবে। এভাবে কোনো দ্রবণকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করে বাষ্পকে ঠান্ডা করে পুনরায় তরলে পরিণত করাকে পাতন বলে।

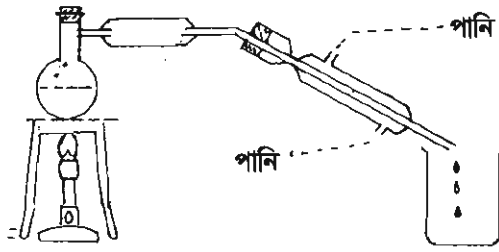


চিত্র ৬.১৫ : পাতন

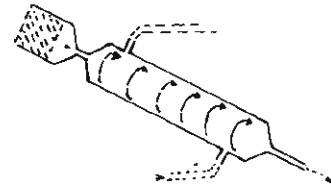
লিবিগ শীতক

চিত্র ৬.১৫ তে প্রদর্শিত যন্ত্রটি কিছু সময় পর আর কাজ করতে পারে না। কারণ নির্গম নল ও বিকারের রক্ষিত ঠান্ডা পানি কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম হয়ে যায়। ফলে বাষ্প ঠান্ডা হয়ে আর তরলে পরিণত হয় না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র এ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রের নাম লিবিগ শীতক যন্ত্র বা Liebig Condenser। লিবিগ নামক একজন বিজ্ঞানী এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন বলে তার নাম অনুসারে যন্ত্রটি এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

চিত্র ৬.১৬ তে লিবিগ শীতক যন্ত্রের সাহায্য পাতন এবং চিত্র ৬.১৭ তে লিবিগ শীতক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। একটি গোলতলী ফ্লাস্কে লবণ পানির দ্রবণ নাও। ফ্লাস্কের মুখে একটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক লাগাও এবং কর্কের মধ্যে চিত্র অনুযায়ী একটি নির্গম নল সংযুক্ত কর। লিবিগ শীতক যন্ত্র নাও। শীতক যন্ত্রের চওড়া মুখে এক ছিদ্রযুক্ত একটি কর্ক লাগাও। নির্গম নলের অপর প্রান্তটি কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লিবিগ শীতক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কর। শীতক যন্ত্রের অপর প্রান্তটি একটি বিকারের মধ্যে প্রবেশ করাও। শীতকের দুইটি পার্শ্বনল থাকে। নিচের দিকের পার্শ্ব নলটি পানির



চিত্র ৬.১৬ : পাতন



চিত্র ৬.১৭ : শীতক

ট্যাপের সাথে সংযুক্ত কর যাতে শীতল পানি চালনা করা যায়। উপর দিকের পার্শ্বনল দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। এখন গোলতলী ফ্লাস্কে বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিলে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে শীতকের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে তরল আকার ধারণ করে এবং গ্রাহক বিকারে জমা হয়। যে তরল পদার্থ গ্রাহক ফ্লাস্ক বা বিকারে জমা হয় তাকে পাতিত তরল বলে। এভাবে লিবিগ শীতক যন্ত্রের সাহায্য সহজেই কোনো দ্রবণ থেকে দ্রব এবং দ্রাবককে পৃথক করা যায়।

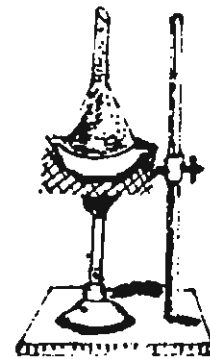
এ ধরনের পাতনকে সাধারণ পাতন বলে। এ ছাড়া নানা ধরনের পাতন রয়েছে। যেমন (১) আংশিক পাতন, (২) বিধ্বংসী পাতন, (৩) উর্ধ্বপাতন, (৪) নিম্নচাপে পাতন ও (৫) বাষ্প পাতন। এগুলো সম্পর্কে তোমরা উচ্চতর শ্রেণীতে বিস্তারিত জানতে পারবে।

উর্ধ্বপাতন : কর্পূর আয়োডিন বা ন্যাপথ্যালিন খোলা পাত্রে রেখে দিলে ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে উড়ে যায়। এ সব পদার্থ গরম করলে গলে না গিয়ে দ্রুতগতিতে বাষ্পাকারে বা গ্যাসরূপে উড়ে যায়। অর্থাৎ এগুলো সরাসরি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় না গিয়ে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়। এ সব পদার্থকে উদ্বায়ী পদার্থ বলে।

যে প্রণালীতে কোনো কঠিন পদার্থ তাপের প্রভাবে তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় এবং শীতল করলে সেই বাষ্প তরল অবস্থায় পরিণত না হয়ে সরাসরি কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে উর্ধ্বপাতন বলে। সংক্ষেপে উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

পরীক্ষা : একটি চিনামাটির বাটিতে কর্পূর ও চিনির মিশ্রণ নাও। এ মিশ্রণ একটি কাচের ফানেল দিয়ে ঢেকে দাও। কাচের ফানেলটি ভিজা কাপড় দিয়ে মুড়ে দাও। তারপর মিশ্রণসহ ভরা বাটিটি তারজালি বা বালি খোলার উপর বসিয়ে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর। দেখবে অল্পক্ষণের মধ্যে কর্পূর ফানেলের চোঙের মধ্যে কঠিনাকারে জমা হবে এবং চিনামাটির পাত্রে চিনি পড়ে থাকবে।

কর্পূর, ন্যাপথ্যালিন, আয়োডিন, নিশাদল ইত্যাদি কয়েকটি পদার্থ ছাড়া অন্যান্য পদার্থ উত্তপ্ত করলে প্রথমে তরলাকারে পরিণত হয়। এ তরল আরও উত্তপ্ত করলে বাষ্পে পরিণত হয়। যেমন, বরফ উত্তপ্ত করলে প্রথমে তা তরল পানিতে এবং পানি আরও উত্তপ্ত করলে বাষ্পে পরিণত হয়।



চিত্র : ৬.১৮ উর্ধ্বপাতন

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কর্ককে স্ক্রুইজারে চাপ দিলে কী হয়?

ক. কর্ক ছোট হয়	খ. কর্ক ফেটে যায়
গ. কর্ক বায়ুরোধী হয়	ঘ. কর্ক অধিক শক্ত ও বায়ুরোধী হয়
২. আয়োডিন ও চক পাউডার এক সাথে মিশে গেলে তা কোন প্রণালির সাহায্যে পৃথক করা যায়?

ক. ছাঁকন	খ. বাষ্পীভবন
গ. পাতন	ঘ. উর্ধ্বপাতন
৩. ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি অধ্যায়টি পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ক. কীভাবে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হয় তা জানা
খ. ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কীভাবে তৈরি করতে হয় তা মুখস্থ করে আয়ত্ত্ব করা
গ. নিজ হাতে কাজ করে কাজের দক্ষতা অর্জন করা
ঘ. দেখে শুনে বিজ্ঞান পাঠের প্রতি আগ্রহী হওয়া
৪. পাতন প্রণালির সাহায্যে কী করা হয়?

ক. মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে ছেকে পৃথক করা হয়
খ. বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলো পৃথক করা হয়
গ. মিশ্রণ থেকে তরল উপাদান ফিরে পাওয়া যায়
ঘ. মিশ্রণ থেকে কঠিন উপাদান ফিরে পাওয়া যায়
৫. ল্যাবরেটরিতে লিবিগ শীতক যন্ত্র না থাকলে কীভাবে পাতন কার্য সম্পাদন করা হয়?

ক. লিবিগযন্ত্র শীতক যন্ত্র ছাড়া পাতন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়
খ. গোলতলী ফ্লাস্কে দুইবার সমকোণে বাঁকানো কাচনল লাগিয়ে এর অপর প্রান্ত টেস্ট টিউবে রেখে ও ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে
গ. লিবিগ শীতক যন্ত্র বাজার থেকে কিনে নিয়ে করা যায়
ঘ. এ পরীক্ষাটি বাদ দেয়া যায়

মিতুল ১০ সে. মি. একটি কাচ দণ্ড নিয়ে তা দুই হাত সমান দূরত্বে রেখে উত্তপ্ত করল। উত্তপ্ত করার পর কাচ দণ্ডটি আস্তে আস্তে বাঁকা করার চেষ্টা করল। কাচ দণ্ডটি ভেঙে গেল। পুনরায় সে বইয়ে নিয়ম দেখল এবং কাচ দণ্ডটি উত্তপ্ত করল। দণ্ডটিকে এবার সে বাঁকা করতে সমর্থ হল।

উপরের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

৬. কাচ দণ্ডটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ কাচ দণ্ডটি-
 - i. চারপাশে সমভাবে উত্তপ্ত হয়নি
 - ii. ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তপ্ত করা হয়নি
 - iii. বেশি উত্তপ্ত করা হয়েছিল

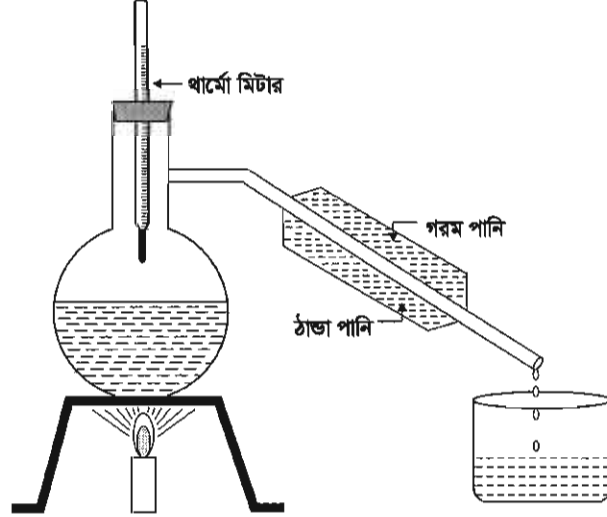
নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |
৭. কাচের বাঁকা স্থান নরম হওয়ার কারণ-

ক. কাচের ধর্ম	খ. পরমাণুর আকর্ষণ বল হ্রাস
গ. পরমাণুর আকর্ষণ বল বৃদ্ধি	ঘ. বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন

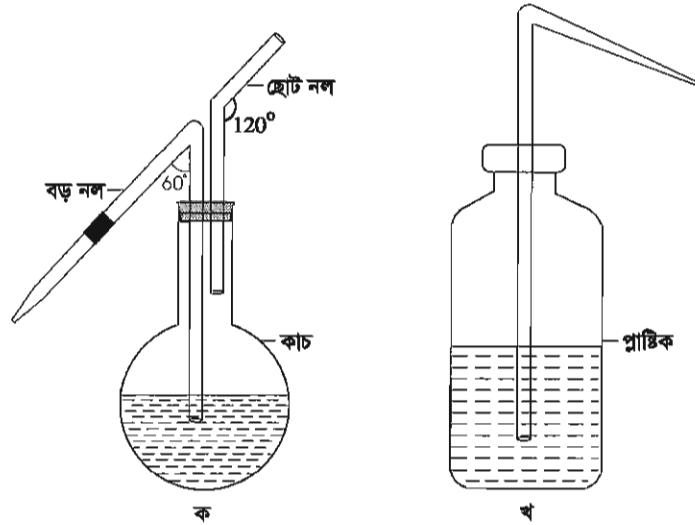
সৃজনশীল প্রশ্ন :

- একজন শিক্ষক ছাত্রদেরকে বিকারে কিছু পানি নিয়ে তাতে তুঁতে যোগ করতে বললেন। চিত্রের ন্যায় যন্ত্র দেখিয়ে তিনি বললেন এ যন্ত্রটি দ্বারা মিশ্রণ থেকে পানি পৃথক করা যায়। শিক্ষক আরও বললেন নিশাদল ও চক পাউডারের মিশ্রণ থেকে এদেরকে এ যন্ত্র দ্বারা পৃথক করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার।



- তুঁতের সংকেত লেখ।
- চিত্রের যন্ত্র দ্বারা পানি পৃথক করতে কী সাবধানতার প্রয়োজন?
- শীতককে ঠান্ডা পানি ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর?
- উল্লিখিত চিত্রের সাহায্যে নিশাদল এবং চক পাউডারের গুড়া পৃথক করা সম্ভব কিনা, যুক্তিসহ লিখ।

২.



- চিত্রে যা দেখানো হয়েছে তার নাম কী?
- ছোট নলটি ১২০° কোণে বাঁকানো হয়েছে কেন?
- 'ক' চিত্রের বড় নলটি কীভাবে ৬০° কোণে বাঁকানো হয়েছে?
- 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

সপ্তম অধ্যায়

পরিমাপ

পরিমাপ বিজ্ঞান শিক্ষার একটি অপরিহার্য পদ্ধতি। কোনো দৈর্ঘ্য, ভর বা সময়ের ঠিক মান বা পরিমাণ জানার জন্য পরিমাপের প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের জীবনে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মাপ-জোখ করতে হয়। যেমন, কাপড় কিনতে হলে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হয়, চাল ডাল কিনতে হলে ভর পরিমাপ করতে হয়, সময়মত স্কুলে যেতে হলে সময় পরিমাপ করতে হয়। কখনো ক্ষুদ্র কিছু পরিমাপ করতে হয়, কখনো বা বৃহৎ কিছু।

এক এক ধরনের পরিমাপের জন্য এক এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়, এক এক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সোনা ওজন করা হয় এক ধরনের নিক্তি দিয়ে, চাল ডাল ওজন করা হয় অন্য ধরনের নিক্তি দিয়ে। আবার সোনা যত নির্ভুলভাবে ওজন করা হয়, চাল-ডাল তত নির্ভুলভাবে ওজন করা হয় না।

এ অধ্যায়ে আমরা শুধু সূক্ষ্ম ও ঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপ

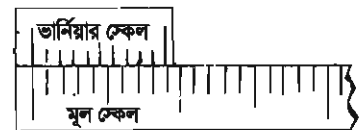
দৈনন্দিন কাজে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস ব্যবহার করি যেমন— পিন, সুই, তার, টিনের পাত, তালা-চাবি ইত্যাদি। সেলাই মেশিনে অথবা ইনজেকশন দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সাইজের সুই ব্যবহার করা হয়। এগুলো ঠিক সাইজের না হলে মেশিনে বা সিরিঞ্জের সাথে লাগানো যাবে না। তালা-চাবি যদি ঠিক মাপের না হয় তবে সে চাবি দিয়ে তালা খোলা যাবে না। এ সব জিনিস তৈরি করতে তাই প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপের।

রেডিও, টেলিভিশন, ঘড়ি, সাইকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ। এ যন্ত্রাংশ যদি ঠিক মাপের না হয় তবে সংযোজন করা যাবে না। এ সব যন্ত্রাংশ তৈরি করতেও প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপের।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাজে সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপের প্রয়োজন হয়। যেমন ধর, লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারাজ্ঞক নির্ণয় করতে হবে। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারাজ্ঞক হচ্ছে $0.000012/^\circ$ সেলসিয়াস। অর্থাৎ ১ মিটার লম্বা লোহার দণ্ডের উষ্ণতা 100° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ হবে মাত্র ১.২ মিলিমিটার। নিকেলের ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি ১.৩ মিলিমিটার অর্থাৎ পার্থক্য মাত্র ০.১ মিলিমিটার। সুতরাং অত্যন্ত ঠিক পরিমাপ করা না গেলে লোহা ও নিকেলের দৈর্ঘ্য প্রসারাজ্ঞক নির্ণয় নির্ভুল হবে না ও প্রসারাজ্ঞকের সাপেক্ষে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। মোট কথা, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের বহু জিনিস তৈরি করতে এবং বৈজ্ঞানিক কাজে সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপের প্রয়োজন হয়।

ভার্নিয়ার স্কেল

সাধারণ মিটার স্কেলের সবচেয়ে ছোট ঘরের দৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার। তাই এ স্কেল দিয়ে ১ মিলিমিটার এর চাইতে কম দৈর্ঘ্য নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। ঠিক সূক্ষ্মতর পরিমাপের জন্য বেলজিয়ামের গণিতবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ার একটি বিশেষ ধরনের স্কেল আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম অনুসারে এ স্কেলকে ভার্নিয়ার স্কেল বলা হয়। ভার্নিয়ার স্কেল দৈর্ঘ্যে ছোট (চিত্র ৭.১)। এটি মূল স্কেলের গায়ে এমনভাবে লাগান থাকে যাতে তার গা বরাবর ডানে বামে সরান যায়। এ স্কেল সাধারণত দশটি সমানভাগে বিভক্ত থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য মূল



চিত্র ৭.১ : ভার্নিয়ার স্কেল

স্কেলের ক্ষুদ্রতম নয় ভাগের দৈর্ঘ্যের সমান। অর্থাৎ মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ১ ভাগের বা ঘরের দৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার হলে, ভার্নিয়ার স্কেলের ১০ ভাগের দৈর্ঘ্য = মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ৯ ভাগের দৈর্ঘ্য = ৯ মিলিমিটার।

অতএব ভার্নিয়ার স্কেলের ১ ভাগের দৈর্ঘ্য = $৯/১০$ মিলিমিটার = ০.৯ মিলিমিটার

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য এবং ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলে।

$$\begin{aligned} \therefore \text{ভার্নিয়ার ধ্রুবক} &= \text{মূল স্কেলের ১ ভাগের দৈর্ঘ্য} - \text{ভার্নিয়ার স্কেলের ১ ভাগের দৈর্ঘ্য} \\ &= ১ \text{ মিলিমিটার} - ০.৯ \text{ মিলিমিটার} = ০.১ \text{ মিলিমিটার}। \end{aligned}$$

সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের n সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য, মূল স্কেলের $(n-১)$ সংখ্যক ক্ষুদ্রতম ঘরের দৈর্ঘ্যের সমান হয়।

অতএব ভার্নিয়ার স্কেলের ১ ঘরের দৈর্ঘ্য = মূল স্কেলের $\frac{n-1}{n}$ সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য।

অতএব ভার্নিয়ার ধ্রুবক = মূল স্কেলের ১ ঘরের দৈর্ঘ্য - ভার্নিয়ার স্কেলের ১ ঘরের দৈর্ঘ্য।

$$\begin{aligned} &= \text{মূল স্কেলের} \left\{ ১ - \frac{n-1}{n} \right\} \text{ ঘরের দৈর্ঘ্য} \\ &= \text{মূল স্কেলের} \frac{১}{n} \text{ ঘরের দৈর্ঘ্য} \\ &= \frac{১}{n} \times \text{মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য} \end{aligned}$$

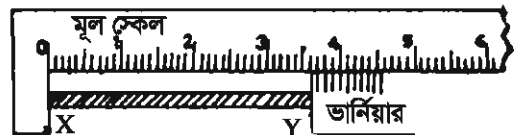
ভার্নিয়ার ধ্রুবক এর যা মান, ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে ততটুকু পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ যে ভার্নিয়ার স্কেলের ভার্নিয়ার ধ্রুবক ০.১ মিলিমিটার সেই ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে ০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়।

ব্যবহার : সাধারণ মিটার স্কেলে মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। ধর, একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে (চিত্র ৭.২)।

ভার্নিয়ার স্কেলটি ডান দিকে সরিয়ে দণ্ডটির বাম প্রান্ত মূল স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মেলাও এবং এটিকে গা ঘেঁষে স্কেলের দৈর্ঘ্য বরাবর রাখ। ভার্নিয়ার স্কেল সরিয়ে এর শূন্য দাগের সাথে দণ্ডের অন্য প্রান্ত মেলাও। এ অবস্থায় ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগের ঠিক আগের মূল স্কেলের দাগের পাঠ নাও। এটি হল মূল স্কেলের পাঠ। দেখবে ভার্নিয়ার স্কেলের কোনো একটি দাগের সাথে মূল স্কেলের একটি দাগ মিলে যাবে, অন্তত খুব কাছাকাছি মিলবে। ভার্নিয়ার স্কেলের সেই দাগটির ০ থেকে শুরু করে ভাগ সংখ্যা নাও। এটি ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ। চিত্রে মূল স্কেলের পাঠ হচ্ছে ৩.৬ সেন্টিমিটার এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা হচ্ছে ৪। ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দিয়ে গুণ করলে ভার্নিয়ার পাঠের মান পাওয়া যাবে।

\therefore ভার্নিয়ার পাঠের মান = ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ \times ভার্নিয়ার ধ্রুবক। এখান থেকে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের ৩.৬ সেন্টিমিটার দাগ থেকে কতটুকু এগিয়ে আছে তা জানা যাবে। এখানে ভার্নিয়ার ধ্রুবক ০.১ মিলিমিটার বা ০.০১ সেন্টিমিটার। অতএব ভার্নিয়ার পাঠের মান ৪×০.০১ সেন্টিমিটার = ০.০৪ সেন্টিমিটার।

$$\begin{aligned} \therefore \text{দণ্ডটির দৈর্ঘ্য} &= \text{মূল স্কেলের পাঠ} + \text{ভার্নিয়ার পাঠের মান} \\ &= ৩.৬ \text{ সেন্টিমিটার} + ০.০৪ \text{ সেন্টিমিটার} \\ &= ৩.৬৪ \text{ সেন্টিমিটার}। \end{aligned}$$

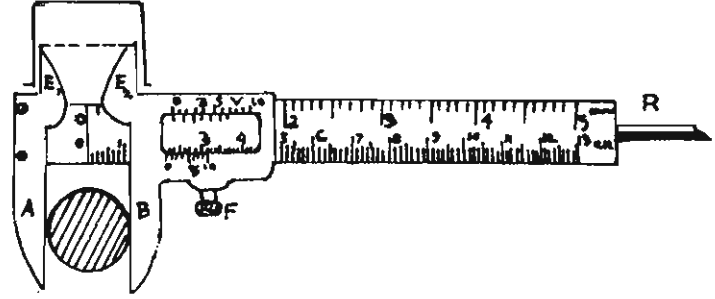


চিত্র ৭.২ : ভার্নিয়ার স্কেলে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

স্লাইড ক্যালিপার্স

স্লাইড ক্যালিপার্স ভার্নিয়ার স্কেলের বিশেষ রূপ; একই নীতি, গঠন ভিন্ন। এর মূল স্কেলটি ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি (চিত্র ৭.৩)। এ স্কেলের যে প্রান্তে শূন্য দাগ কাটা সেই প্রান্তে একটি স্থির ইস্পাতের চোয়াল (A) আছে। এটি মূল স্কেলের দৈর্ঘ্যের সাথে সমকোণে আটকানো থাকে। ইস্পাতের তৈরি একটি খোলার উপর ভার্নিয়ার স্কেলের দাগ কাটা থাকে। এটি মূল স্কেলের উপর পরানো থাকে। এর সাথেও মূল স্কেলের দৈর্ঘ্যের সমকোণে একটি চোয়াল (B) লাগানো থাকে। ভার্নিয়ার স্কেল (V) কে মূল স্কেলের গা বরাবর সামনে পিছনে সরানো যায়। এর সাথে একটি স্ক্রু (F) লাগানো থাকে। স্ক্রু সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে মূল স্কেলের গায়ে যে কোনো স্থানে আটকানো যায়। ভার্নিয়ার স্কেলের সাথে, পিছনের দিকে মূল স্কেলের দৈর্ঘ্য বরাবর একটি সরু ইস্পাতের দণ্ড (R) লাগানো থাকে। ভার্নিয়ার স্কেলের সাথে যুক্ত চোয়ালকে যখন মূল স্কেলের চোয়ালের সাথে লাগানো হয় তখন এ দণ্ডের প্রান্ত মূল স্কেলের প্রান্তের সাথে মিলে যায়। এ অবস্থায় ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ এবং মূল স্কেলের শূন্য দাগ পরস্পরের সাথে মিলে যায়। কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে

হলে বস্তুটি দুই চোয়ালের মধ্যে মূল স্কেলের গা ঘেঁষে এমন ভাবে রাখতে হয় যাতে এর দুই প্রান্ত চোয়ালটিকে স্পর্শ করে থাকে। এখন মূল স্কেল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ নিয়ে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়। এভাবে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যকে বস্তুর দৈর্ঘ্যের আপাত পাঠ বলে। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব, গোলকের ব্যাস, চোঙের ব্যাস, ফাঁপা চোঙের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস এবং কোনো পাত্রে গভীরতা মাপা যায়।



চিত্র ৭.৩ : স্লাইড ক্যালিপার্স

যান্ত্রিক ত্রুটি

ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল এবং মূল স্কেলের চোয়াল যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে তখন যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের সাথে না মেলে তবে বুঝতে হবে যন্ত্রে ত্রুটি আছে। এ ত্রুটিকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে পাঠকে উপযুক্ত সংশোধন করতে হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের ডান দিকে থাকলে যে ত্রুটি হয় তাকে ধনাত্মক ত্রুটি এবং বাম দিকে থাকলে যে ত্রুটি হয় তাকে ঋণাত্মক ত্রুটি বলে। ত্রুটি না থাকলে পাঠ হবে শূন্য। ধনাত্মক ত্রুটি থাকলে আপাত পাঠ হয় বেশি আর ঋণাত্মক ত্রুটি থাকলে হয় কম। সুতরাং প্রকৃত পাঠ পেতে হলে, যান্ত্রিক ত্রুটি আপাত পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হয়।

যান্ত্রিক ত্রুটি $\pm e$ হলে, প্রকৃত পাঠ = আপাত পাঠ - ($\pm e$)

যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করতে হলে চোয়াল দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকা অবস্থায় মূল স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে ভার্নিয়ার স্কেলের যে দাগটি মিলে যায় তার পাঠ নিতে হয়। এ পাঠকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়।

যান্ত্রিক ত্রুটি, $\pm e =$ ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ \times ভার্নিয়ার ধ্রুবক

ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের দাগের ডান দিকে থাকলে যান্ত্রিক ত্রুটি ধনাত্মক এবং বাম দিকে থাকলে যান্ত্রিক ত্রুটি ঋণাত্মক ধরা হয়।

ব্যবহার ১ : কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, গোলকের ব্যাস, চোঙের বাইরের ব্যাস নির্ণয় : ভার্নিয়ার স্কেলের স্ক্রু টিলা করে কিছু দূর সরায়। বস্তুটিকে স্থির চোয়ালের সাথে স্পর্শ করে রাখ। ভার্নিয়ার স্কেল টেনে এমনভাবে রাখ যেন চোয়াল দুইটি বস্তুটির দুই প্রান্ত স্পর্শ করে থাকে। এ অবস্থায় স্ক্রু এঁটে দাও। এবার মূল স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ নাও।

বস্তুর দৈর্ঘ্য = মূল স্কেলের পাঠ + (ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ \times ভার্নিয়ার ধ্রুবক) - যান্ত্রিক ত্রুটি ($\pm e$)।

ব্যবহার ২ : ফাঁপা চোঙের ভেতরের ব্যাস নির্ণয় : এবার স্লাইড ক্যালিপার্সের উপরের দিকের চোয়াল দুইটি ফাঁপা চোঙের ভেতরে ঢোকাও। স্ক্রু টিলা করে ভার্নিয়ার স্কেল সরিয়ে এমনভাবে রাখ যেন চোয়াল দুইটি চোঙের ব্যাস বরাবর বিপরীত দেওয়ালের তল স্পর্শ করে থাকে। এখন স্ক্রু আটকিয়ে আগের মতই মূল স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ নাও।

ব্যাস = মূল স্কেলের পাঠ + (ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ \times ভার্নিয়ার ধ্রুবক) - যান্ত্রিক ত্রুটি ($\pm e$)

জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়

বিভিন্ন নিয়মিত জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। নিচে কয়েকটি সূত্র দেয়া হল :

১। বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$, [$\pi = ৩.১৪$, একটি ধ্রুবক]।

২। গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল = $৪\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$

৩। চোঙের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $২\pi \times \text{ব্যাসার্ধ} \times \text{দৈর্ঘ্য}$

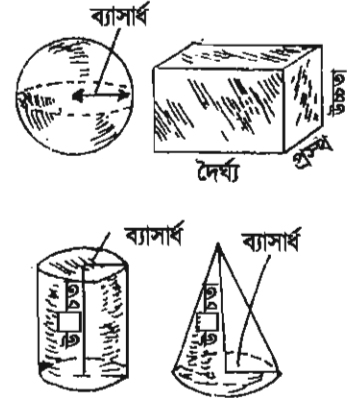
৪। গোলকের আয়তন = $\frac{৪}{৩} \times \pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^3$

৫। চোঙের আয়তন = $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2 \times \text{দৈর্ঘ্য}$

স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ব্যাস বা দৈর্ঘ্য মাপে প্রযোজ্য সূত্রের সাহায্যে বৃত্ত, গোলক, চোঙের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করা যায়।

সুতরাং বৃত্ত, গোলক ও চোঙের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করতে হলে স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে এক বা একাধিক দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। কারণ ব্যাস ও ব্যাসার্ধও একটি দৈর্ঘ্য।

ক্ষেত্রফলের এস. আই. একক বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক বর্গমিটার সংক্ষেপে মি^২ বা (m²) এবং আয়তনের একক ঘনমিটার সংক্ষেপে মি^৩ (m³)।



চিত্র ৭.৪ : জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট বস্তু

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ১ ভাগের দৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ১ ভাগের দৈর্ঘ্য ০.৯ মিলিমিটার হলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত?

ক. ১ মিলিমিটার

খ. ০.৯ মিলিমিটার

গ. ০.১ মিলিমিটার

ঘ. ৯ মিলিমিটার

২. $(2\pi \times \text{ব্যাসার্ধ} \times \text{দৈর্ঘ্য})$ কিসের সূত্র ?

ক. বৃত্তের ক্ষেত্রফলের

খ. গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের

গ. চোঙের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের

ঘ. গোলকের আয়তনের

৩. চোঙের আয়তনের সূত্র কোনটি?

ক. $2\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$

খ. $8\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$

গ. $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^3$

ঘ. $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2 \times \text{দৈর্ঘ্য}$

৪. আয়তনের এস. আই. একক কোনটি?

ক. বর্গমিটার

খ. ঘনমিটার

গ. মিটার

ঘ. নিউটন

৫. গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে কয়টি দৈর্ঘ্য মাপতে হবে?

ক. একটি

খ. দুইটি

গ. তিনটি

ঘ. চারটি

ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল ও মূল স্কেলের চোয়াল যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে তখন যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের সাথে না মেলে- সে ক্ষেত্রে ধনাত্মক ত্রুটির জন্য-

- ভার্নিয়ারস্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের ডান দিকে থাকবে
- ভার্নিয়ারস্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের বাম দিকে থাকবে
- যান্ত্রিক ত্রুটি আপাত পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হয়

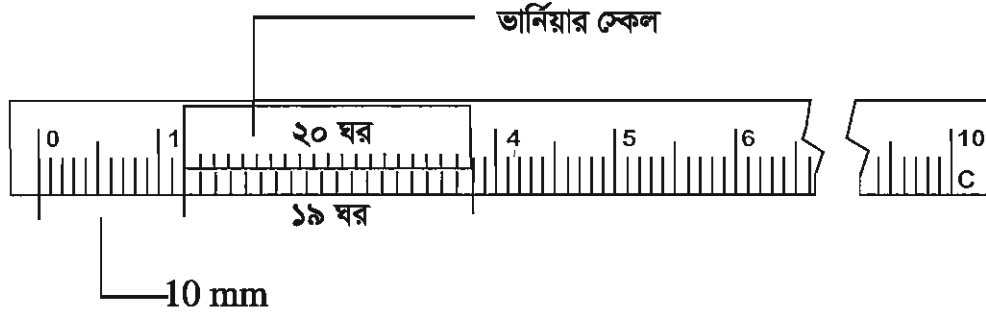
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও iii

খ. ii ও iii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্রের আলোকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

৭. চিত্রে মূল স্কেলের ১ ঘরের দৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার হলে ভার্নিয়ার প্রুবক কত?

ক. ০.১ মিলিমিটার

খ. ০.০১ মিলিমিটার

গ. ০.১ সেন্টিমিটার

ঘ. ০.০১ সেন্টিমিটার

৮. যদি চিত্রে যন্ত্রের ধনাত্মক ত্রুটি .১ মিলিমিটার এবং দড়ের আপাত পাঠ ৩.৪ সেন্টিমিটার হয় তবে প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৩.৩ সেন্টিমিটার

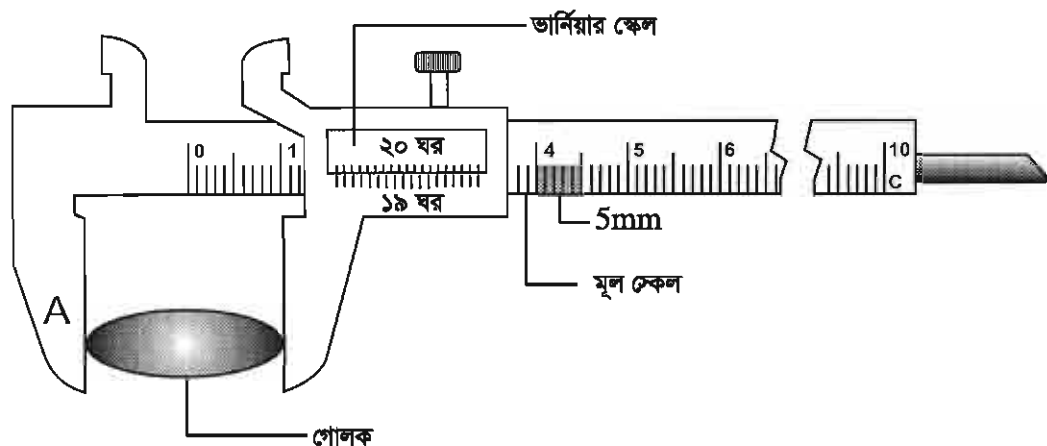
খ. ৩.৩৯ সেন্টিমিটার

গ. ৩.৪১ সেন্টিমিটার

ঘ. ৩.৫ সেন্টিমিটার

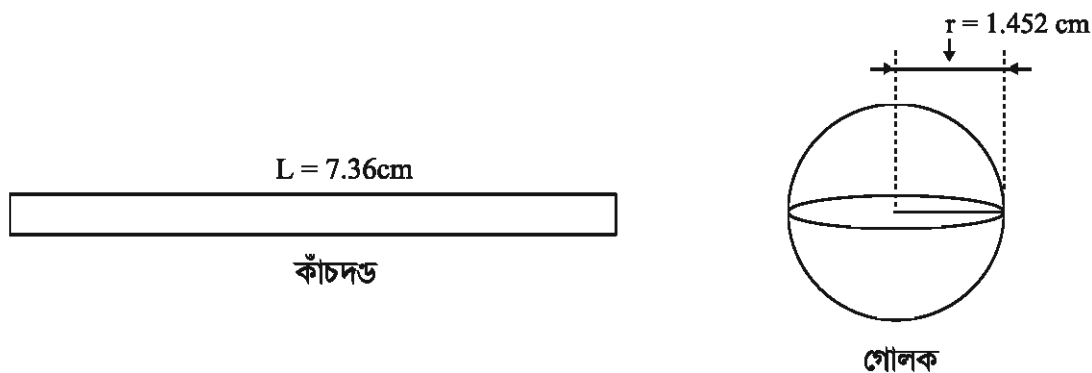
সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. 'A' চিহ্নিত অংশটি কী?
- খ. সূক্ষ্ম ও ঠিক পরিমাপের জন্য যন্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- গ. চিত্রের স্লাইড ক্যালিপার্সটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় কর।
- ঘ. চিত্রের যন্ত্রের সাহায্যে গোলকটির আয়তন কতটুকু পর্যন্ত নির্ভুল পরিমাপ করা যায় মতামত দাও।

২.



- ক. কাচ দণ্ডটি মাপার জন্য কী ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে?
- খ. সাধারণ স্কেলের সাহায্যে প্রদত্ত গোলকের ব্যাস মাপা যাবে না কেন?
- গ. গোলকটির আয়তন নির্ণয় কর?
- ঘ. ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে গোলকটির ব্যাসার্ধ মাপা কতটুকু নির্ভুল হবে- তোমার মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

সূচনা

গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে মানুষের কৌতুহল সেই আদিকাল থেকে। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) প্রায় বিশ বছর ধরে সৌরজগতের গ্রহসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি মারা যাবার সময় জার্মান জ্যোতির্বিদ জেহাননেস কেপলারের (Johannes Kepler) কাছে এ সব তথ্যের বিবরণ রেখে যান। এ তথ্য বিশ্লেষণ করে কেপলারই প্রথম (১৬০৬-১৬১৯ সালের মধ্যে) সূর্যের চারদিকে গ্রহের আবর্তন সম্পর্কে কতকগুলো সূত্র আবিষ্কার করেন কিন্তু তিনি জানতেন না সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর আবর্তনের কারণ কী। তাঁর সূত্র থেকে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলো ‘কীভাবে’ আবর্তিত হচ্ছে শুধু তাই জানা যায়, ‘কেন’ এভাবে আবর্তিত হয় সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এ ‘কেন’-এর উত্তর দেন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের মহাকর্ষ আবিষ্কার।

মহাকর্ষ

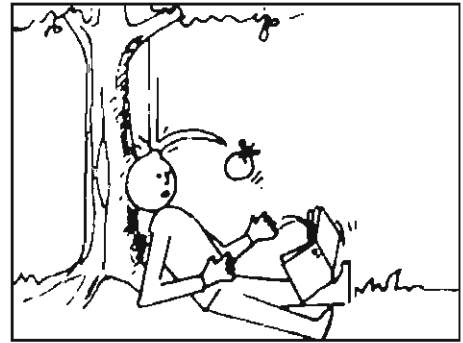
কথিত আছে, নিউটন একদিন আপেল বাগানে গাছের নিচে বসে চিন্তা করছিলেন। ভাবছিলেন; সূর্যের চারদিকে ঘুরছে পৃথিবী; পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ, এর কারণ কী? এমন সময় একটি পাকা আপেল গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ল। অমনি তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, আপেলটি নিচে পড়ল কেন? কেন উপরের দিকে গেল না? কেন স্থির হয়ে থাকল না? এর একটিই কারণ হতে পারে বলে তিনি ভেবে গেলেন, তা হল পৃথিবীর আকর্ষণ বল। পৃথিবী তার কাছাকাছি চারপাশের সব বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। তাই শুধু আপেলই নয় যে কোনো বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে নিচে মাটিতে পড়ে। কোনো বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে সেটি আবার ফিরে আসে মাটিতে পড়ে। নিউটন আরো চিন্তা করলেন, যে বল আপেলকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করতে পারে, সেই একই বল তো চাঁদকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করতে পারে। এটাই ছিল তার যুগান্তকারী ধারণা। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী শুধুমাত্র তার চারপাশের বস্তুকে আকর্ষণ করে তা নয়। পৃথিবীর আকর্ষণ বল মহাশূন্যে পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। এটি একটি বিশ্বজনীন বল।

মহাকর্ষের ধারণা থেকেই নিউটন ব্যাখ্যা দেন, কীভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে, চাঁদ কেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সূর্যের মত মহাকাশে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। মহাকর্ষীয় বলই এ অসংখ্য নক্ষত্রকে নিজ নিজ কক্ষপথে ধরে রাখে। তারা কক্ষপথ থেকে বের হতে পারে না, একটির সাথে আরেকটির ধাক্কা লাগে না। নক্ষত্রগুলো পরস্পরের সাথে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা হতে পারে না।

মহাকর্ষ বল সম্পর্কে নিউটন এর সূত্রের ধারণা

নিউটন আবিষ্কার করেন যে,

- ১। মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুকণা তাদের কেন্দ্র সংযোগকারী সরল রেখা বরাবর পরস্পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।
- ২। এ আকর্ষণ বল বস্তু দুইটির ভরের উপর নির্ভর করে, ভর বেশি হলে আকর্ষণ বলও বেশি হয় আর ভর কম হলে আকর্ষণ বলও কম হয় এবং



চিত্র ৮.১ : পৃথিবীর আকর্ষণে ফল মাটিতে পড়ে

৩। আকর্ষণ বল বস্তু দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর নির্ভর করে; দূরত্ব বাড়লে বল কমে। আর দূরত্ব কমলে বল বাড়ে। নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করেন ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে, যখন তার বয়স মাত্র ২৩ বছর।

মহাকর্ষ বল খুবই দুর্বল বল। সূর্য ও পৃথিবীর মত বিশাল ভরের বস্তুর ক্ষেত্রেই তাই এ বল অনুভব করা যায়। নিউটনের আবিষ্কার অনুযায়ী সূর্য, কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের পৃষ্ঠে মহাকর্ষ বল নির্ভর করবে এর ভর ও ব্যাসার্ধের (গোলাকার হিসেবে কল্পনা করে) উপর। পৃথিবীর ভরের চেয়ে সূর্যের ভর প্রায় ৩,৩০,০০০ গুণ এবং সূর্যের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ১১০ গুণ বড়। আর চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ৮১ ভাগের এক ভাগ ও চাঁদের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ৪ ভাগের এক ভাগ। এ হিসেবে দেখা যায় যে সূর্যের মহাকর্ষ বল পৃথিবীর আকর্ষণ বলের তুলনায় অনেক বেশি, প্রায় ২৮ গুণ। আর চাঁদের মহাকর্ষ বল পৃথিবীর আকর্ষণ বলের চেয়ে অনেক কম, প্রায় ৬ ভাগের এক ভাগ।

অভিকর্ষ

মহাবিশ্বে যে কোনো দুইটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করেছে। দুইটি বস্তুর একটি যদি হয় পৃথিবী এবং অপরটি পৃথিবীর উপর বা কাছাকাছি অবস্থিত অন্য কোনো বস্তু, তবে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে অর্থাৎ অভিকর্ষ মহাকর্ষের একটি বিশেষ রূপ।

পৃথিবী যেমন তার পৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেই বস্তুও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তোমাকে পৃথিবী তার দিকে আকর্ষণ করছে। তুমিও সমান বলে পৃথিবীকে তোমার দিকে আকর্ষণ করছ। তুমি যখন লাফ দিয়ে উপরে ওঠো, তখন তুমি এবং পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ কর। কিন্তু পৃথিবী তোমার দিকে এগিয়ে যায় না কেন? তুমিই আবার এসে পৃথিবীর উপর পড় কেন? এর কারণ, পৃথিবীর ভর তোমার ভরের তুলনায় বহুগুণ বেশি তাই পৃথিবী স্থির থাকে তুমিই পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর উপর অবস্থিত বা নিকটবর্তী সকল বস্তুর ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর বহুগুণ বেশি।

সুতরাং এ সব বস্তু অভিকর্ষের দরুন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়। অভিকর্ষ বলতে তাই সাধারণত পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে বোঝায়।

অভিকর্ষের জন্যই তুমি লাফ দিয়ে উপরে উঠলে আবার ফিরে এসে মাটিতে পড়। অভিকর্ষ বল না থাকলে একবার উপরের দিকে লাফিয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যেতে আর ফিরে আসতে না। অভিকর্ষ বলের জন্যই পাকা ফল মাটিতে পড়ে, আমরা চলাফেরা করতে পারি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আমাদের হাঁফ লাগে, কষ্ট হয়। সবচেয়ে বড় কথা, অভিকর্ষ বলই বায়ুমণ্ডলকে পৃথিবীর দিকে টেনে ধরে রেখেছে নইলে বায়ুমণ্ডল মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত। আর বায়ুমণ্ডল ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত না, অর্থাৎ আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকত না।

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের দরুন তা মাটির দিকে পড়তে থাকে। ছেড়ে দেয়ার আগে বস্তুটির বেগ ছিল শূন্য। বিনা বাধায় বস্তুটি নিচের দিকে পড়ার সময় প্রতি সেকেন্ডে তার বেগ বেড়ে যায়। প্রতি সেকেন্ডের বেগ পরিবর্তনকে বা বেগ পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। সুতরাং অভিকর্ষের প্রভাবে বস্তুটি যে ত্বরণ হয় তাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলে। অভিকর্ষজ ত্বরণকে সাধারণত 'g' অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান নির্দিষ্ট। কিন্তু মান সকল স্থানে এক নয়। ভূপৃষ্ঠে এর গড় মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২ সংক্ষেপে মি/সে^২। এর অর্থ বিনা বাধায় কোনো পড়ন্ত বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মিটার হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দেয়ার ১ সেকেন্ড পর বস্তুটির বেগ ৯.৮ মি/সে হয়, ২ সেকেন্ড পর হয় ২ × ৯.৮ মি/সে, ৩ সেকেন্ড পর ৩ × ৯.৮ মি/সে হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ অভিকর্ষের টানে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ = অভিকর্ষজ ত্বরণ × অতিবাহিত সময়।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় 'g' এর মান তত কমে। আবার ভূপৃষ্ঠের নিচে গেলেও 'g' এর মান কমে। পৃথিবীর কেন্দ্রে 'g' এর মান শূন্য।

বিশুবীয় অঞ্চলে 'g' এর মান সবচেয়ে কম, মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। এর কারণ পৃথিবী গোলাকার নয়, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিষুবরেখার দূরত্ব বেশি আর মেরুর দূরত্ব কম।

ভর ও ওজন

ভর : কোনো বস্তুতে মোট পদার্থের পরিমাণকে বস্তুটির ভর বলে। ভর বস্তুর মৌলিক ধর্ম। নিক্তির সাহায্যে ভর মাপা যায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে (এস. আই.) ভরের এককের নাম কিলোগ্রাম, সংক্ষেপে কিগ্রা বা কেজি। বস্তুর ভরের কখনো পরিবর্তন হয় না। ভূপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে উপরে বা নিচে ভর সমান থাকে। তোমার ভর যদি পৃথিবীতে ৪০ কিগ্রা হয় তবে তুমি চাঁদে গেলেও তোমার ভর ৪০ কিগ্রা হবে।

ওজন : পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে কোনো বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে বস্তুটির ওজন বলে অর্থাৎ ওজন হল কোনো বস্তুর উপর অভিকর্ষ বল।

বস্তুর ওজন = অভিকর্ষ বল = বস্তুর ভর \times অভিকর্ষজ ত্বরণ।

ওজন একটি বল, তাই ওজনের একক আর বলের একক এক। আমরা জানি বলের এস. আই. একক নিউটন সুতরাং ওজনের এককও নিউটন।

কোনো বস্তুর ভর ১ কিগ্রা হলে তার ওজন হবে $১ \text{ কিগ্রা} \times ৯.৮ \text{ মি/সে}^2 = ৯.৮ \text{ নিউটন}$ (যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ৯.৮ মি/সে^2) অর্থাৎ ১ কিগ্রা ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে ৯.৮ নিউটন বল দ্বারা আকর্ষণ করে। একটি মুড়ির টিন তুমি তোমার হাতের উপরে সহজেই ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু সমান আয়তনের একটি চালের টিন ধরে রাখতে যথেষ্ট কষ্ট হবে। এর কারণ মুড়ির টিনের ওজন কম, চালের টিনের ওজন বেশি। মুড়ির টিনের ভর যদি ১ কিগ্রা আর চালের টিনের ভর হয় ৫ কিগ্রা তবে,

মুড়ির টিনের ওজন = $১ \times ৯.৮ = ৯.৮ \text{ নিউটন}$

চালের টিনের ওজন = $৫ \times ৯.৮ = ৪৯.০ \text{ নিউটন}$ ।

সুতরাং মুড়ির টিন তোমার হাতের উপর ৯.৮ নিউটন বল প্রয়োগ করে আর চালের টিন প্রয়োগ করে ৪৯.০ নিউটন বল অর্থাৎ তার পাঁচগুণ বল।

বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সকল স্থানে সমান নয়। সুতরাং কোনো বস্তুর ওজনও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হবে। ভূপৃষ্ঠে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে বা নিচে নামলে 'g' এর মান কমে তাই ওজনও কমে। অর্থাৎ পর্বতের চূড়ায় অথবা খনিগর্ভে কোনো বস্তুর ওজন সেই বস্তুর ভূপৃষ্ঠে ওজনের তুলনায় কম হবে। পৃথিবীর কেন্দ্রে 'g' এর মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজনও শূন্য।

একই বস্তুর ওজন মেরু অঞ্চলে বেশি, বিষুবীয় অঞ্চলে কম। বস্তুর ভর কিন্তু একই থাকে।

আমরা সাধারণত নিক্তির সাহায্যে যা মাপি তা হচ্ছে বস্তুর ভর, ওজন নয়। ওজন মাপা হয় স্প্রিং নিক্তি দিয়ে।

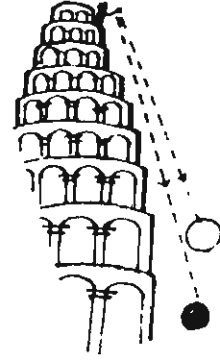
ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য

	ভর		ওজন
১	কোনো বস্তুতে মোট পদার্থের পরিমাণকে ভর বলে।	১	পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে কোনো বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে ওজন বলে।
২	স্থানভেদে বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।	২	বস্তুর ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়।
৩	ভর বস্তুর একটি নিজস্ব ধর্ম।	৩	ওজন বস্তুর কোনো নিজস্ব ধর্ম নয়।
৪	ভরের এস. আই. একক কিলোগ্রাম।	৪	ওজনের এস. আই. একক নিউটন।
৫	সাধারণ নিক্তি দিয়ে ভর মাপা হয়।	৫	স্প্রিং নিক্তি দিয়ে ওজন মাপা হয়।

পড়ন্ত বস্তুর গ্যালিলিও পরীক্ষা

উপর থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে বস্তুটি নিচের দিকে পড়তে থাকে। একই উচ্চতা থেকে একটি ভারী বস্তু ও একটি হালকা বস্তুকে এক সাথে ছেড়ে দিলে সাধারণত ভারী বস্তুটিকে আগে মাটিতে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও একটি পরীক্ষা করে দেখান যে একই উচ্চতা থেকে মুক্ত ভাবে পড়ন্ত সব বস্তু, ভারী অথবা হালকা – একই সময়ে মাটিতে এসে পড়ে।

ইটালীর পিসা শহরে ৫৪.৮৬ মিটার উঁচু একটি হেলানো মিনার ছিল। এ মিনারের ছাদ থেকে তিনি বিভিন্ন ওজনের বস্তুকে একই সময়ে মুক্তভাবে পড়তে দেন। দেখা যায় যে হালকা বস্তুগুলোর পড়তে একটু বেশি সময় লাগে কারণ বায়ুর উর্ধ্বচাপ এবং ঘর্ষণের বাধা। বায়ুর বাধা ঠেলে আসতে হালকা বস্তুর একটু সময় বেশি লাগে। কোনোরূপ বাধা না থাকলে ভারী বস্তু ও হালকা বস্তু একই সময়ে মাটিতে এসে পড়ত। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী নিউটন একটি লম্বা বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্যে ভারী বস্তু হিসেবে গিনি ও হালকা বস্তু হিসেবে পালক নিয়ে এ পরীক্ষা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেন। পরীক্ষাটি গিনি ও পালক পরীক্ষা নামে পরিচিত।



চিত্র ৮.২ : গ্যালিলিওর পরীক্ষা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে বস্তুর ওজনের কী পরিবর্তন ঘটে?
ক. বাড়ে
খ. কমে
গ. একই থাকে
ঘ. শূন্য হয়ে যায়
২. 'g' এর মান কোথায় সবচেয়ে বেশি?
ক. মেরু অঞ্চলে
খ. বিষুব অঞ্চলে
গ. ভূকেন্দ্রে
ঘ. পাহাড়ের চূড়ায়
৩. 'g' এর প্রভাব-
ক. ভারী বস্তুর ওপর কম
খ. হালকা বস্তুর ওপর বেশি
গ. উভয় বস্তুর ওপর সমান
ঘ. কোনো বস্তুর ওপরই নেই
৪. কোনো বস্তুর ভর ১০ কিলোগ্রাম। বস্তুটির ওজন কত ?
ক. ৯.৮ নিউটন
খ. ১০ নিউটন
গ. ৯৮ নিউটন
ঘ. ৯৮০ নিউটন
৫. পৃথিবীতে তোমার ভর ৪২ কিলোগ্রাম। চাঁদে তোমার ভর কত হবে?
ক. ৪২ কিলোগ্রাম
খ. ৪২ নিউটন
গ. ৭ কিলোগ্রাম
ঘ. ৭ নিউটন
৬. এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বল-
i. বস্তু দুইটি তাদের কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে
ii. বস্তু দুইটির ভরের ওপর নির্ভর করে না
iii. বস্তু দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর নির্ভর করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

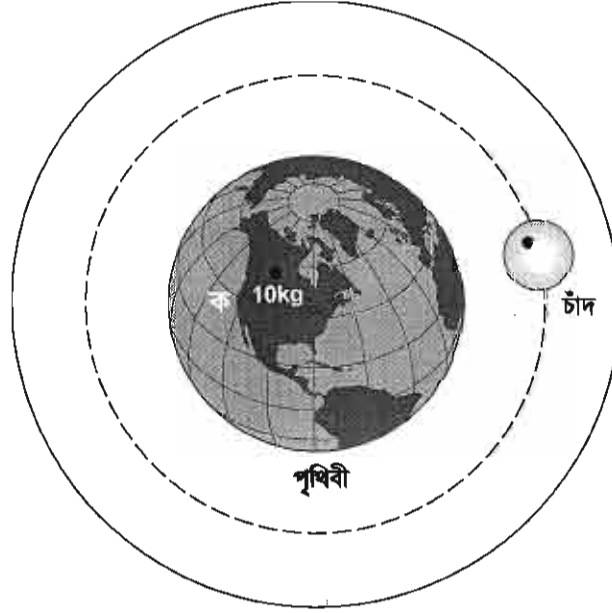
সাকিব অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সে বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে ছাঁদের উপর ওঠে একটি পাথর সাবধানে নিচে ফেলে দিল। পাথরটি অন্য কোনো দিকে না যেয়ে সোজাসুজি মাটিতে পড়ে গেল। পাথরটি ৫ সেকেন্ড পর মাটি স্পর্শ করল।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে ৭নং ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

৭. পাথরটি সোজাসুজি নিচে পড়ে গেল-
ক. মহাকর্ষ বলের প্রভাবে
খ. অভিকর্ষ বলের প্রভাবে
গ. বিভব শক্তির প্রভাবে
ঘ. গতি শক্তির প্রভাবে
৮. ৪ সেকেন্ড পর পাথরটির বেগ কত ছিল?
ক. ৩৯.২ মি/সে
খ. ৪৩.২ মি/সে
গ. ৪৫.২ মি/সে
ঘ. ৪৯.২ মি/সে

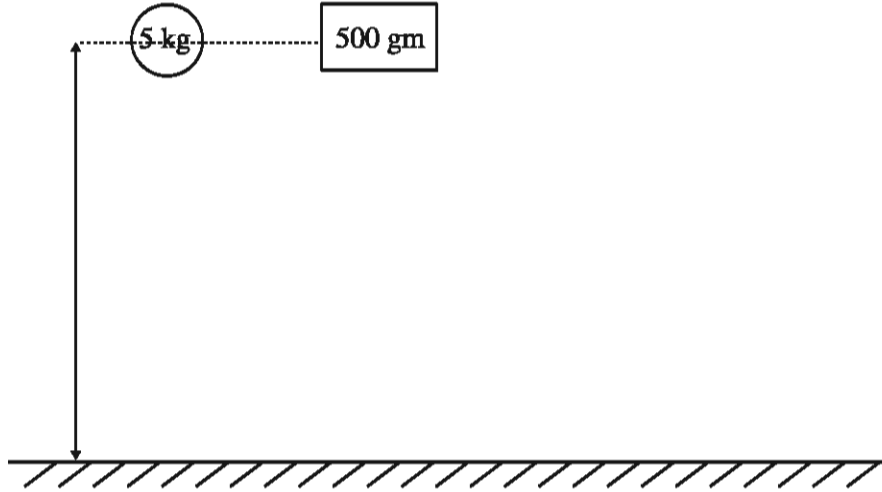
সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন ধরনের আকর্ষণ বল কাজ করছে।
- খ. 'ক' চিহ্নিত বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ এবং সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে পার্থক্য কী?
- গ. 'ক' চিহ্নিত বস্তুটির ওজন চাঁদে কত হবে?
- ঘ. 'ক' চিহ্নিত বস্তুটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নেওয়া হলে বস্তুটির ভর ও ওজনের কী পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা কর।

২.



একই উচ্চতা হতে দুইটি ভিন্ন ভরের বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া হল।

- ক. '5 kg' ভর বলতে কী বুঝায়?
- খ. বস্তুদ্বয়ের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. বস্তু দুইটির ওজন নির্ণয় কর।
- ঘ. বস্তু দুইটি কি একই সময়ে মাটিতে পতিত হবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

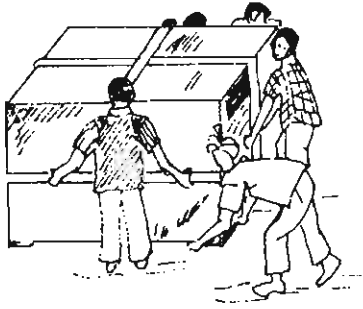
সরল যন্ত্র

সূচনা

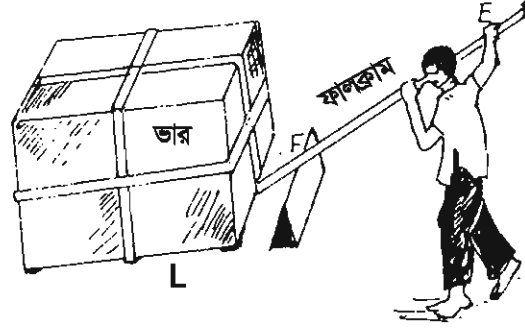
আমরা জানি কাজ করার জন্য প্রয়োগ করতে হয় বল। বল প্রয়োগের কিছু কৌশল আছে যা কাজ করাকে সহজ করে। কোনো কাজ করতে এমনিতেই যতটুকু বল প্রয়োগ করতে হয়, কৌশল অবলম্বনে তার চেয়ে কম বল প্রয়োগ করে কাজ করা যায়। মূলত কাজ করার এ কৌশলকে সরল যন্ত্র বলে। আমরা এ অধ্যায়ে সরল যন্ত্র সম্পর্কে জানবো।

সরল যন্ত্র কী?

একটি ভারী বাক্সকে তুমি যদি মাটি থেকে উপরে তুলতে চাও তবে কীভাবে তুলতে পার? কয়েকজন মিলে ধরে উপরে তুলতে পার (চিত্র ৯.১ ক)। আবার একটি লোহার দণ্ড বা শাবলের সাহায্যে তুমি একাই সেটি তুলতে পার (চিত্র ৯.১ খ)। কোনটি সহজ পদ্ধতি? নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টি। কারণ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লোহার দণ্ড ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করে অনেক কম বল প্রয়োগ করতে হয়েছে অর্থাৎ কাজ করা সহজ হয়েছে। লোহার দণ্ডটি একটি সরল যন্ত্র।



(ক)



(খ)

চিত্র ৯.১ : একটি ভারী বাক্স তোলার দুই পদ্ধতি

কাজ করাকে সহজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্র দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে ব্যবহার করে থাকি। যেমন— ছুরি, কাঁচি, সাঁড়াশি, শাবল, কপিকল, লিভার ইত্যাদি। সেলাই মেশিন, সাইকেল, ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রকে জটিল যন্ত্র বলে। তবে যন্ত্র যতই জটিল হোক না কেন তা অনেকগুলো সরল যন্ত্র দিয়ে তৈরি।

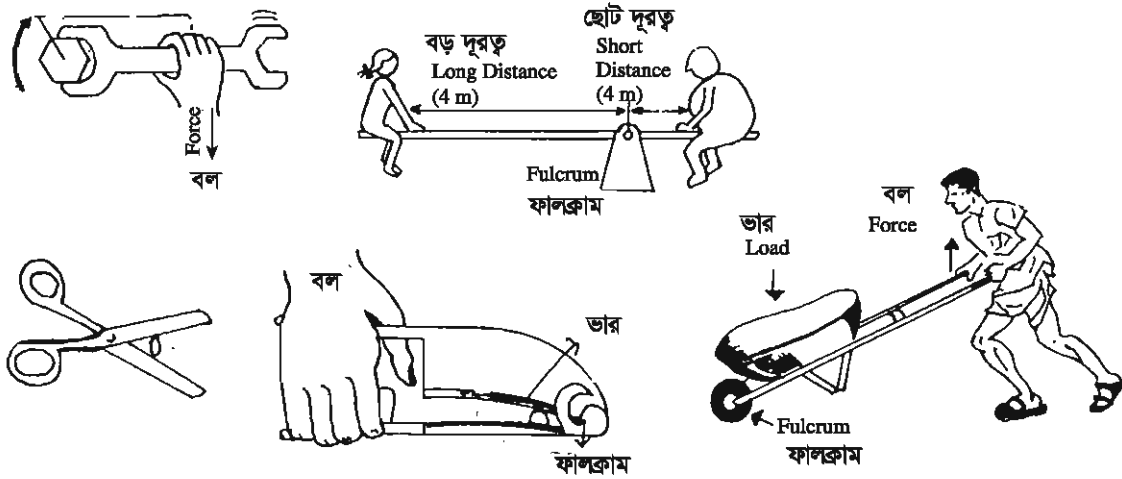
কিছু সরল যন্ত্র কাজ করা সহজ করে বল বৃদ্ধি করে। যেমন উপরের উদাহরণের দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লোহার দণ্ডের এক প্রান্তে যতটুকু বল প্রয়োগ করা হয়, অপর প্রান্তে পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি বল। বল বৃদ্ধি করে, এ রকম অন্যান্য সরল যন্ত্র হল কাঁচি, সাঁড়াশি, শাবল, রেনচ, জ্যাক স্কু ইত্যাদি। কিছু সরল যন্ত্র বলের দিক পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, সাইকেলের পেডালে পা দিয়ে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করা হয় কিন্তু সাইকেল চলে সামনের দিকে। কপিকলের সাহায্যে যখন তোমার স্কুলে জাতীয় পতাকা উপরে তোলা হয় তখন কপিকলের একদিকে দড়ি নিচের দিকে টানা হয়, আর অপর দিকে দড়িতে বাঁধা পতাকা উপরের দিকে ওঠে। আবার কিছু সরল যন্ত্র গতি এবং

দূরত্ব বৃদ্ধি করে কাজ করা সহজ করে। যেমন - তুমি যখন একটি লম্বা বাঁশের কোটা দিয়ে গাছের মাথা থেকে পাকা পেয়ারা পাড় তখন তোমার হাত যতটুকু এবং যত জোরে ঘোরাও, কোটার মাথা তার চেয়ে দ্রুত ও বেশি পর্যন্ত ঘোরে। একজন ঝাড়ুদার যখন একটি হাতল লাগান ঝাড়ু ব্যবহার করে তখন তার হাত যতটুকু সরে, ঝাড়ুর মাথা তার চেয়ে বেশি দূর এবং দ্রুত সরে।

অতএব আমরা জানলাম, সরল যন্ত্র হল কাজ সহজ করার একটি কৌশল। সরল যন্ত্র কাজ সহজ করে- বল বৃদ্ধি করে, বলের দিক পরিবর্তন করে এবং গতি ও দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

লিভার

ছুরি, কাঁচি, শাবল, সাঁড়াশি, ঝাটা ইত্যাদি সরল যন্ত্রকে লিভার বলে (চিত্র ৯.২)। এমনকি আমাদের আজুল, হাত, পা ও লিভার হিসেবে কাজ করে। এগুলো ব্যবহার করে আমরা চলাফেরা করতে পারি, জিনিসপত্র তুলতে পারি, নানাভাবে বল প্রয়োগ করতে পারি। কোনো ভারী বাক্স বা বস্তুকে তোলার জন্য যখন একটি শাবল ব্যবহার করা হয় তখন সেটি লিভার হিসেবে কাজ করে।



চিত্র ৯.২ : বিভিন্ন ধরনের লিভার

শাবলটিকে পাথর বা ইট জাতীয় শক্ত কোনো কিছুর সাথে ঠেকা দিয়ে রেখে এ লিভার তৈরি হয়েছে। শাবলটিকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করে, এক প্রান্তে কম বল প্রয়োগ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বেশি ওজনের বস্তুকে উপরে তোলা যায়। এভাবে লিভার ব্যবহার করে সামান্য বল প্রয়োগ করে, বেশি বল প্রয়োগ করে যে কাজ করতে হতো তা করা যায়। অর্থাৎ লিভার কাজ করা সহজ করে বল বৃদ্ধি করে। সব লিভারই কম বেশি বল বৃদ্ধি করে।

লিভারের ক্রিয়া নীতি বোঝা যাবে চিত্র ৯.৩ থেকে। লিভার ঠেকানোর জন্য কোনো বিন্দু বা রেখাকে স্পর্শ করে থাকে। এ বিন্দু বা রেখাকে কেন্দ্র করে লিভার ওঠানামা করে বা ঘোরে। এ বিন্দু বা রেখাকে ফালক্রাম বলে। অর্থাৎ যে বিন্দু বা রেখাকে কেন্দ্র করে লিভার ঘোরে তাকে ফালক্রাম বলে। লিভারের সাহায্যে যে ভারী বস্তুকে তোলা হয় তাকে বলে ভার। ভার রাখা হয় লিভারের এক প্রান্তে। এ ভারকে তোলার জন্য অপর প্রান্তে প্রয়োগ করা হয় বল। লিভারের ফালক্রাম থেকে ভার পর্যন্ত অংশকে ভারবাহু এবং ফালক্রাম থেকে বল প্রয়োগের স্থান অংশকে বলবাহু বলে।

লিভার যে মূলনীতি মেনে কাজ করে তা হল :

বল \times বল বাহুর দৈর্ঘ্য = ভার \times ভার বাহুর দৈর্ঘ্য

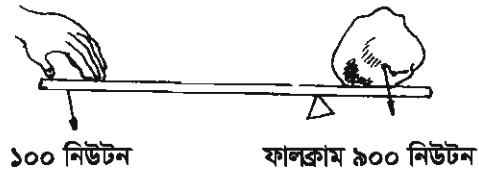
$$\text{বা, } \frac{\text{বল বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভার বাহুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}}$$

এর অর্থ হল, বল বাহু ভারবাহু থেকে যতগুণ বড়, প্রযুক্ত বলের ততগুণ বড় ভার লিভার দিয়ে তোলা যাবে, অর্থাৎ প্রযুক্ত বল ততগুণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন ধর, কোনো লিভারের বল বাহুর দৈর্ঘ্য ৯ মিটার এবং ভার বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার। অতএব,



$$\frac{\text{বল বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভার বাহুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{৯ \text{ মিটার}}{১ \text{ মিটার}} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}}$$

সুতরাং ভার যদি ৯০০ নিউটন হয় তবে মাত্র ১০০ নিউটন বল প্রয়োগ করেই সেই ভার তোলা যাবে। অর্থাৎ বল বৃদ্ধি পেয়ে ৯ গুণ হবে।



চিত্র ৯.৩ : লিভারের নীতি

যান্ত্রিক সুবিধা

কোনো যন্ত্র প্রযুক্ত বলকে যতগুণ পরিবর্তন করে তাকে ঐ যন্ত্রের সুবিধা বলে। অর্থাৎ

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বল বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভার বাহুর দৈর্ঘ্য}}$$

যে লিভার দিয়ে ৯০০ নিউটন ভার, ১০০ নিউটন বল প্রয়োগ করে তোলা যায়, তার যান্ত্রিক সুবিধা হল ৯।

যান্ত্রিক সুবিধার কোনো একক নেই, এটি একটি সংখ্যা। যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর থেকে বেশি, ১ এর সমান এবং ১ থেকে কম হতে পারে। আমরা অনেক সময় কাজের সুবিধার জন্য বেশি বল দিয়ে কম ভার তুলি। এখানে যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর চেয়ে কম। যে যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা যত বেশি সেই যন্ত্র দিয়ে কাজ করা তত সহজ।

লিভারের শ্রেণী বিভাগ : লিভারের ফালক্রাম যে সব সময়েই বল ও ভারের মাঝে থাকে তা নয়, এক প্রান্তেও থাকতে পারে। ফালক্রাম, বল ও ভারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী।

প্রথম শ্রেণীর লিভার : যে লিভারে ফালক্রাম, বল ও ভারের মাঝে থাকে তাকে প্রথম শ্রেণীর লিভার বলে। যেমন - কাঁচি, নিক্তি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার : দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে ফালক্রাম এবং বল থাকে দুই প্রান্তে, ভার থাকে মাঝে। যেমন- ঝাঁতি। ঝাঁতির দুইটি অংশ এক প্রান্তে যুক্ত থাকে সেটাই ফালক্রাম। অন্য প্রান্তে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বল প্রয়োগ করা হয় আর ভার পড়ে মাঝে রাখা সুপারির উপর।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভার : তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে বল থাকে ফালক্রাম এবং ভারের মাঝে। যেমন- চিমটা।

হেলানো তল

তোমরা হয়ত দেখে থাকবে, তেল বোঝাই ড্রাম ট্রাকে তোলার সময় একটি কাঠের তক্তা ট্রাকের পেছন থেকে মাটিতে রেখে সেই হেলানো তক্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে ড্রামগুলো ট্রাকে তোলা হচ্ছে (চিত্র ৯.৪)। এর কারণ কী? এর কারণ, খাড়াভাবে তোলার চেয়ে হেলানো তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে তোলা অনেক সহজ। হেলানো তল ব্যবহারের কাজ করা অনেক সহজ হয়। সুতরাং হেলানো তল একটি সরল যন্ত্র।



চিত্র ৯.৪ : হেলানো তলের সাহায্যে ট্রাকে তেলের ড্রাম তোলা

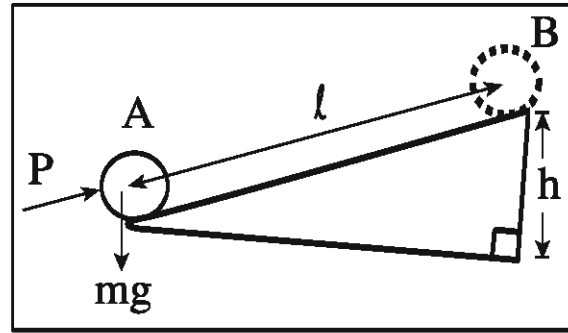
হেলানো তলের ক্রিয়া নীতি দেখানো হয়েছে ৯.৫ নম্বর চিত্রে।

আমরা জানি, কাজ = বল \times দূরত্ব

বস্তুতে p বল প্রয়োগ করে হেলানো তল দিয়ে A থেকে B তে নিতে কাজ, $w = p \times l$, l = তলের দৈর্ঘ্য। এ কাজ বস্তুটিকে খাড়াভাবে তুললে যে পরিমাণ কাজ করতে হত তার সমান। খাড়াভাবে তুলতে কাজ $W = mg \times h$, যেখানে mg হচ্ছে বস্তুটির ওজন বা ভার আর h হচ্ছে উচ্চতা। অতএব,

$$mgh = p \times l$$

$$\frac{mg}{p} = \frac{l}{h}$$



চিত্র ৯.৫ হেলানো তলের নীতি

$$\text{অর্থাৎ } \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{হেলানো তলের দৈর্ঘ্য}}{\text{হেলানো তলের উচ্চতা}} = \text{যান্ত্রিক সুবিধা}$$

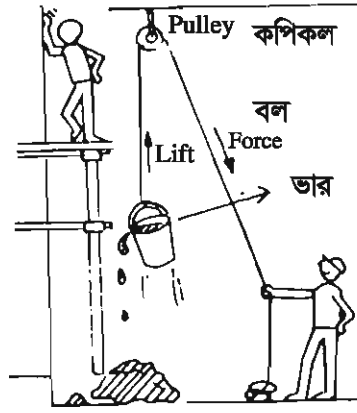
হেলানো তলের দৈর্ঘ্য তার উচ্চতা থেকে বেশি। তাই হেলানো তলের উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় বেশি, কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম। যেমন, হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যদি হয় ৩ মিটার আর উচ্চতা ১ মিটার, তবে উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যায়, হেলানো তল দিয়ে ৩০০ নিউটন ভার তুলতে বল প্রয়োগ করতে হবে মাত্র ১০০ নিউটন বল। ফলে কাজ করা অনেকটা সহজ হয়।

মানুষ সর্বপ্রথম যে সকল সরল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখে, হেলানো তল সেগুলোর একটি। এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্নভাবে হেলানো তল ব্যবহার করি। দালানে উপরে ওঠার সিঁড়ি, উঁচুতে ওঠার রাস্তা ইত্যাদি হেলানো তলের দৃষ্টান্ত। এগুলো খাড়াভাবে না করে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়, যাতে কম আয়াসেই ওঠা যায়।

কপিকল

তোমরা স্কুলে বা অন্য কোথাও লম্বা খুঁটির মাথায় পতাকা উত্তোলনের জন্য কপিকল ব্যবহার করতে হয়ত দেখেছ। কপিকল হল একটি খাঁজ কাটা চাকা যা একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে অবাধে ঘুরতে পারে। চাকার খাঁজে দড়ি রেখে দুই দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। দড়ির এক প্রান্তে কোনো ভারী বস্তু বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে টেনে বস্তুটিকে উপরে তোলা হয়

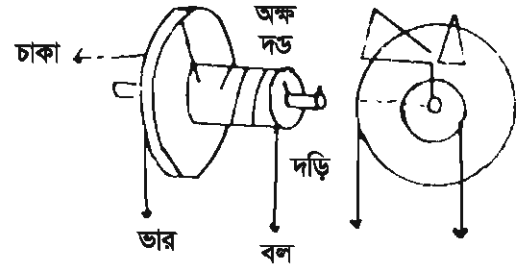
(চিত্র ৯.৬)। কপিকল বল বৃদ্ধি করে না, শুধু বলের দিক পরিবর্তন করে। দড়ির এক প্রান্তে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করে অপর প্রান্তের ভার উপরের দিকে তোলা হয়। বল প্রয়োগ করা হয়, প্রায় ভারের সমান পরিমাণ। ঘর্ষণের কারণে সামান্য বেশিও; কিন্তু নিচের দিকে দড়ি ধরে টেনে ভার তোলা, সরাসরি উপরে তোলার চেয়ে সহজ। এ সুবিধার জন্য কপিকল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৯.৬ : কপিকল

চাকা ও অক্ষদণ্ড

চাকা ও অক্ষদণ্ড যন্ত্রে একটি বড় ব্যাসের চাকার সাথে একটি ছোট ব্যাসের অক্ষদণ্ড লাগানো থাকে। একটি লম্বা দড়ির এক প্রান্তে কোনো ভার বাঁধা থাকে। দড়িটি অক্ষদণ্ড এবং চাকার উপরে পেঁচানো হয়, (৯.৭) চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে। দড়ির যে প্রান্ত চাকার উপরে পেঁচানো থাকে সে প্রান্তে বল প্রয়োগ করে তার চেয়ে অনেক বেশি ভার তোলা যায়। চাকা ও অক্ষদণ্ড শুধু বল বৃদ্ধি করে না, বলের দিকও পরিবর্তন করে। এটি লিভারেরই তিনরূপ। এখানে বল বাহুর দৈর্ঘ্য হল চাকার ব্যাসার্ধ আর ভার বাহুর দৈর্ঘ্য হল অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ। অতএব,



চিত্র ৯.৭ : চাকা ও অক্ষদণ্ড

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বল বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভার বাহুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{\text{চাকার ব্যাসার্ধ}}{\text{অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ}}$$

সুতরাং চাকার ব্যাসার্ধ যদি অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ থেকে ১০ গুণ বেশি হয়, তবে ১০ নিউটন বল প্রয়োগ করে ১০০ নিউটন ভার তোলা যাবে।

চাকা ও অক্ষদণ্ড ব্যবহার করে কুয়া থেকে পানি তোলা হয়। মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং হুইল এবং স্কু ড্রাইভার, চাকা ও অক্ষদণ্ডের তিন তিন রূপ।

স্কু ড্রাইভার

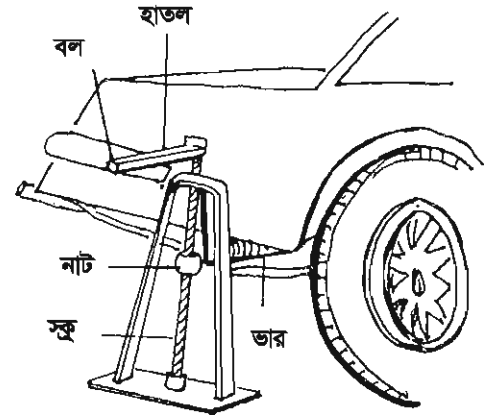
তোমরা সবাই স্কু ড্রাইভার দেখেছ, কেউ কেউ হয়ত ব্যবহারও করেছ। দুইটি ড্রাইভার জোড়া কর। একটি মোটা হাতলওয়ালা, আরেকটি সরু হাতলওয়ালা। কোনটি দিয়ে স্কু লাগান সহজ? দেখবে মোটা হাতলওয়ালাটি দিয়ে কাজ করা সহজ। কারণ স্কু ড্রাইভার চাকা ও অক্ষদণ্ডের একটি রূপ। এর হাতলটি চাকা হিসাবে এবং লোহার দণ্ডটি অক্ষদণ্ড হিসাবে কাজ করে। তাই হাতলের ব্যাস যত বেশি হবে স্কু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।

জ্যাক-স্কু

মোটরগাড়ির টায়ার ছিদ্র হয়ে গেলে, চাকা পান্টাতে হলে, গাড়িটি মাটি থেকে তোলার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় সেটি একটি জ্যাক-স্কু। ড্রাইভার যদি নিজে গাড়িটি তুলতে চায়, পারবে না। কিন্তু জ্যাক-স্কু ব্যবহার করে সহজেই গাড়ি তোলা যায়। জ্যাক-স্কু একটি মোটা ইস্পাতের তৈরি স্কু। এর সাথে একটি হাতল লাগান থাকে। (চিত্র ৯.৮) এ

যেমন দেখানো হয়েছে। হাতলটি ঘুরিয়ে উপরের অংশকে উপরে ওঠানো বা নিচে নামানো যায়।

জ্যাক-স্ক্রু একই সাথে লিভার এবং হেলান তলের নীতি মেনে কাজ করে। স্ক্রুর পৌঁচানো অংশ হেলানো তল হিসাবে কাজ করে। স্ক্রুকে এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত পৌঁচানো পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় তা হল হেলানো তলের দৈর্ঘ্য। আর পৌঁচানো অংশের উচ্চতা হল হেলানো তলের উচ্চতা। এভাবে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর ফলে কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা যায়। হাতলে যেকোনো বল প্রয়োগ করা হয় ভার থাকে তার লম্বভাবে। তাই জ্যাক-স্ক্রু একই সাথে বল বৃদ্ধি করে এবং বলের দিক পরিবর্তন করে কাজ করা সহজ করে।



চিত্র ৯.৮ স্ক্রু ও জ্যাক-স্ক্রু

পাম্প

দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে আমরা পাম্প ব্যবহার করি। পাম্পের সাহায্যে নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভ হতে পানি তুলে আমরা পানি করি। পাম্প ব্যবহার করে জমিতে পানি সরবরাহ করা হয়, বাড়ির নিচের চৌবাচ্চা থেকে ছাদের চৌবাচ্চায় পানি তোলা হয়। আবার সাইকেলের চাকায় বা ফুটবলের ব্লাডারে বায়ু ভর্তি করার জন্যও পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ সব পাম্প দিয়ে আসলে কী করা হচ্ছে? পানি বা কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

তরল বা বায়বীয় পদার্থ সাধারণত উচ্চচাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের স্থানে প্রবাহিত হয় পদার্থের এ ধর্মকে পাম্পের কাজে লাগানো হয়। আমরা বলতে পারি, যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু চাপকে কাজে লাগিয়ে তরল ও বায়বীয় পদার্থকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে পাম্প বলে।

পাম্পের কাজ করার মূলনীতি : কোনো আবদ্ধ স্থানে বায়ুর চাপ কমানো হলে বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপে কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থ ঐ স্থানে প্রবেশ করে।

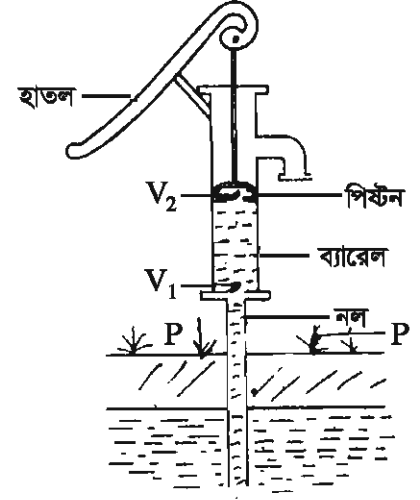
প্রায় সব পাম্পই একটি ধাতুর তৈরি চোঙ থাকে, যাকে ব্যারেল বলে। ব্যারেলের মধ্যে একটি বায়ুনিরুদ্ধ পিস্টন থাকে, যেটাকে ওঠানামা করিয়ে বায়ুচাপ কমানো হয়। তরল বা বায়ু যাতে শুধু মাত্র একদিকে প্রবাহিত হতে পারে সে জন্য একটি ব্যবস্থা থাকে, যাকে ভালভ বলে। ভালভ এক ধরনের একমুখী দরজা বিশেষ।

এটি শুধুমাত্র একদিকে খোলে। ফলে তরল বা বায়ু শুধু একদিকে যেতে পারে। অন্যদিকে যেতে চাইলে তরল বা বায়ুর চাপেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পাম্প নানা ধরনের হতে পারে। আমরা শুধু এক ধরনের পাম্প সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো।

লিফট পাম্প

এ পাম্প নিচ থেকে উপরে পানি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে একটি লোহার সরু লম্বা নল লাগানো থাকে (চিত্র ৯.৯)। নলটি যে পানি উপরে তুলতে হবে তার মধ্যে ডুবানো থাকে। নলের উপরে একটি মোটা লোহার ব্যারেল লাগানো থাকে। ব্যারেলের মধ্যে বায়ুনিরুদ্ধ একটি পিস্টন থাকে। পিস্টনটিকে একটি হাতলের সাহায্যে ওঠানামা করানো যায়। হাতলটি লিভারের নীতিতে কাজ করে। ব্যারেলের উপরের দিকে একটি নল লাগানো থাকে যার মধ্য দিয়ে পানি বেরিয়ে যেতে পারে। এতে দুইটি ভালভ আছে— ভালভ V_1 ব্যারেল এবং সরু নলের সংযোগ স্থানে, ভালভ V_2 পিস্টনের সাথে যুক্ত। উভয় ভালভই কেবলমাত্র উপরের দিকে খুলতে পারে।

কার্যপ্রণালী : পিস্টনটিকে প্রথমে নিচের দিকে নামানো হয়। তখন V_1 এবং V_2 এর মধ্যবর্তী স্থানের বায়ুর আয়তন কমে অর্থাৎ চাপ বাড়ে। ফলে V_2 খোলে এবং V_1 বন্ধ হয়। ভিতরের বায়ু V_2 দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর পিস্টনকে উপরের দিকে টানা হয়। তখন পিস্টনের নিচে, ব্যারেলের ভিতরের বায়ুর চাপ কমে। ফলে উপরের বায়ু চাপে V_2 বন্ধ হয়, আর নিচের বায়ুর চাপে V_1 খুলে যায়। V_1 দিয়ে সবু নল থেকে বায়ু ব্যারেলের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে নলের বায়ুচাপও কমে যায়। সুতরাং পানির তলের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপের ফলে কিছু পরিমাণ পানি নল থেকে V_1 দিয়ে ব্যারেলে প্রবেশ করে।



চিত্র ৯.৯ : লিফট পাম্প

আবার যখন পিস্টনটিকে নিচের দিকে নামানো হয়, তখন V_1 আবার বন্ধ হয় এবং V_2 খুলে যায়। V_2 দিয়ে পানি পিস্টনের উপরে যেয়ে জমা হয়। পিস্টনটিকে আবার উপরের দিকে টানা হয়। পিস্টনের উপরের পানি উপরের নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। V_1 আবার খুলে যায় এবং V_2 বন্ধ হয়। আগের মত বায়ুমণ্ডলের চাপে আরো কিছু পানি নল থেকে V_1 দিয়ে ব্যারেলে প্রবেশ করে। এভাবে হাতলের সাহায্যে পিস্টনটিকে বারবার ওঠানামা করলে নিচের পানি নল দিয়ে ব্যারেলে প্রবেশ করবে এবং উপরের নির্গমন নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। হাতল যখন নিচের দিকে নামান হয়, পিস্টন তখন উপরের দিকে ওঠে। তখনই কেবল পানি নির্গমন নল দিয়ে বেরিয়ে আসে।

লিফট পাম্প বায়ুমণ্ডলের চাপে পানি V_1 দিয়ে ব্যারেলে প্রবেশ করে। আমরা জানি, বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ ৭৬ সে. মি. পারদস্তম্ভ বা ১০.৩ মি. পানি স্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। সুতরাং এ পাম্প দিয়ে V_1 থেকে ১০.৩ মিটারের বেশি নিচ থেকে পানি তোলা সম্ভব নয়। বাস্তবে অবশ্য ৮ মিটারের বেশি উচ্চতায় পানি তোলা এ পাম্প সম্ভব হয় না। কারণ পিস্টন সম্পূর্ণ বায়ুনিরুদ্ধ হয় না এবং ভালভের কিছু ওজন আছে। লিফট পাম্প নলকূপে ব্যবহার করা হয়। নলকূপের পানি আমরা পান করি। আবার জমিতে পানি সেচের জন্যও নলকূপ ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- কাঁচি কী ধরনের সরল যন্ত্র?

ক. লিভার	খ. হেলান তল
গ. কপিকল	ঘ. পাম্প
- যাঁতি কোন শ্রেণীর লিভার?

ক. প্রথম শ্রেণী	খ. দ্বিতীয় শ্রেণী
গ. তৃতীয় শ্রেণী	ঘ. সব শ্রেণীই হতে পারে
- একটি স্থির কপিকল কাজ সহজ করে কীভাবে?

ক. বল বৃদ্ধি করে	খ. বলের দিক পরিবর্তন করে
গ. বলের গতি পরিবর্তন করে	ঘ. উপরিউক্ত তিন ভাবেই করে
- একটি লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা ১০। এটি দিয়ে ১০০ নিউটন বল প্রয়োগ করে কতটুকু ভার তোলা যায়?

ক. ১ নিউটন	খ. ১০ নিউটন
গ. ১০০ নিউটন	ঘ. ১০০০ নিউটন

৫. বায়ুমণ্ডলের চাপ কাজে লাগিয়ে পানি সবচেয়ে বেশি কত উচ্চতায় তোলা যায়?

ক. ১ মিটার

খ. ১০ মিটার

গ. ৭৬ মিটার

ঘ. ১০০০ মিটার

৬. ভালভ কী?

ক. এক ধরনের একমুখী দরজা

খ. এক ধরনের দ্বি-মুখী দরজা

গ. বৈদ্যুতিক বাতি

ঘ. এক প্রকার যন্ত্র

নিচের তথ্যের সাহায্যে ৭, ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রহিমা বেগম বাড়ির ছাদের বাগানে মাটি ও সার উত্তোলনের জন্য একটি যন্ত্র স্থাপন করেন। যন্ত্রটির চাকার ব্যাসার্ধ ১০০ সেন্টিমিটার এবং অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ ১০ সেন্টিমিটার।

৭. রহিমা বেগম যে যন্ত্রটি স্থাপন করেন তার নাম-

ক. লিফট-পাম্প

খ. পাম্প

গ. হেলানোতল

ঘ. কপিকল

৮. যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা-

ক. ০.১

খ. ১০

গ. ১০০

ঘ. ১০০০

৯. নিচের বিবৃতিগুলো লক্ষ কর-

i. হাতলের ব্যাস যত কম হবে স্ক্রুডাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা তত বেশি হবে

ii. কপিকল বলের দিক পরিবর্তন করে এবং গতি ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে

iii. যান্ত্রিক সুবিধা এর অর্থ হল বল বৃদ্ধি পেয়ে ১০ গুণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

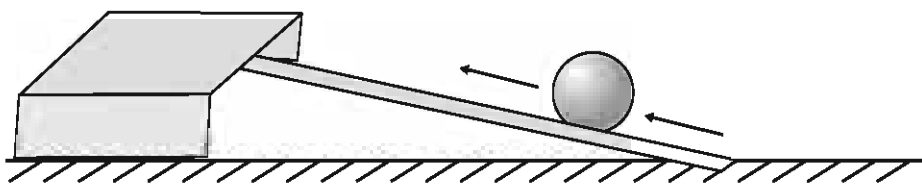
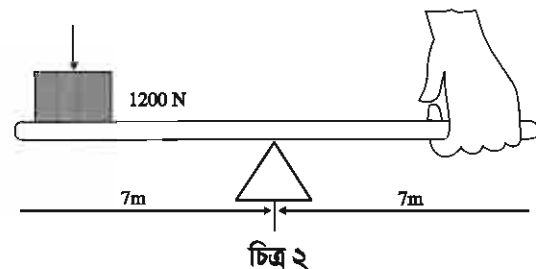
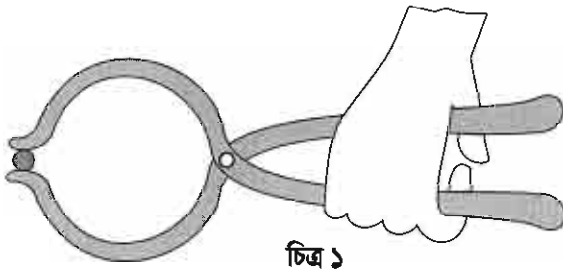
ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

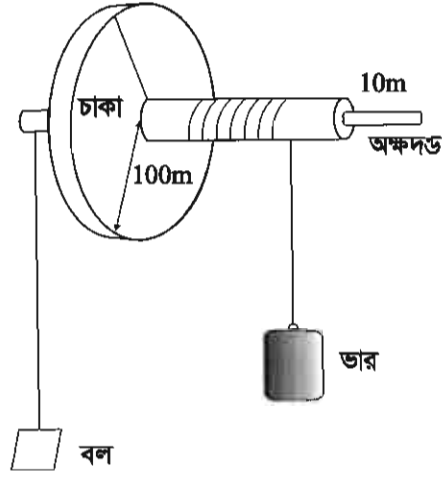
সৃজনশীল প্রশ্ন :



উপরের চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ কর এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও-

- ক. উপরের চিত্রগুলো কী ধরনের যন্ত্র ?
- খ. ১নং যন্ত্রটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর?
- গ. ২নং যন্ত্রের বলের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ঘ. ৩নং যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধার গাণিতিক রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

২.



- ক. যন্ত্রটির নাম কী?
- খ. বলের দিক নির্দেশ করে যন্ত্রটির কাজ ব্যাখ্যা কর?
- গ. যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা হিসাব কর।
- ঘ. যন্ত্রটি হতে অধিক যান্ত্রিক সুবিধা পাবার জন্য চাকা এবং অক্ষদণ্ডের ব্যাস কেমন হওয়া উচিত গাণিতিক যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

তাপ

তাপ এক প্রকার শক্তি

আমরা জানি, কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তির অনেক রূপ। শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। তাপ দিয়ে পানি ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করা হয়। বাষ্প দিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলে। রেলগাড়ির ইঞ্জিন মানুষ ও মালামাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। এভাবে অনেক কাজ হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপ থেকে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। আবার তোমার দুই হাতের তালু একত্র করে জোরে জোরে কয়েকবার ঘষ। দেখবে হাত গরম হয়ে উঠছে। এখানে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ উৎপন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক বালব যখন জ্বলে তখন বৈদ্যুতিক শক্তি তাপে এবং তাপ আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং তাপের কাজ করার সামর্থ্য আছে। অন্য শক্তিকে তাপে এবং তাপকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। অতএব তাপ এক প্রকার শক্তি। যে শক্তি আমাদের গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি জাগায়, তাকে তাপ বলে।

উষ্ণতা : আমরা জানি উষ্ণতা কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থা নির্দেশ করে এবং উষ্ণতা দ্বারা বুঝা যাবে বস্তুটি অন্য বস্তুর সাথে তাপীয় সংযোগে আসলে তাপ দিবে না নিবে।

উষ্ণতা পরিমাপে বিভিন্ন স্কেল ব্যবহৃত হয়। কেলভিন স্কেল এর একটি। লর্ড কেলভিন এর প্রবর্তক। এ স্কেলের পাঠকে ডিগ্রি কেলভিন বা সংক্ষেপে কেলভিন বলে। একে আরও সংক্ষেপে কে. দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ স্কেল অনুযায়ী গলন্ত বরফের উষ্ণতা ২৭৩ কে. ও ফুটন্ত পানির উষ্ণতা ৩৭৩ কে.।

উষ্ণতার পার্থক্য : ১ ডিগ্রি কেলভিন = ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপের পরিমাপ : তাপের একক

কোনো কিছু পরিমাপের জন্য উপযুক্ত এককের প্রয়োজন হয়। যা পরিমাপ করতে হবে তার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অংশকে একক হিসাবে ধরা হয়। যেমন, দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হল মিটার, যা দৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ। তাপের পরিমাণ পরিমাপের জন্যও সেরূপ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপকে একক হিসাবে ধরা হয়। এ নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপ। তাপের এ এককের নাম ক্যালরি। অর্থাৎ এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানি এক ক্যালরি তাপ গ্রহণ করলে তার উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ক্যালরি খুব ছোট একক। তাই অনেক সময় একক হিসেবে কিলোক্যালরি ব্যবহৃত হয়। এক কিলোক্যালরি ১০০০ ক্যালরির সমান। অর্থাৎ ১ কিলোক্যালরি ১ কিলোগ্রাম পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করে।

তাপের আধুনিক একক এখন আর ক্যালরি নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার শক্তির বিভিন্ন একক না রেখে সব ধরনের শক্তির একই একক থাকা কাম্য। সেই অনুযায়ী তাপের এস. আই. একক হল জুল। এক ক্যালরি ৪.২ জুলের সমান। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এখনো ক্যালরি বা কিলোক্যালরি ব্যবহৃত হয়। যেমন, খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা এখনো খাদ্য শক্তির পরিমাণ কিলোক্যালরিতে পরিমাপ করেন। একজন স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ২২০০ কিলোক্যালরি শক্তির খাদ্য প্রয়োজন। এক কাপ দুধে রয়েছে ১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি এবং ১ টি ডিমে ১০০ কিলোক্যালরি।

সুতরাং আমরা জানলাম তাপ পরিমাপের বিভিন্ন একক হল :

ক্যালরি : সাধারণত এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ১ ক্যালরি বলে।

কিলোক্যালরি : সাধারণত এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ১ কিলোক্যালরি বলে।

১ কিলোক্যালরি = ১০০০ ক্যালরি।

জুল : আন্তর্জাতিক (এস. আই.) পদ্ধতিতে তাপের একক হল জুল।

এক ক্যালরি = ৪.২ জুল। ১ জুল = ০.২৪ ক্যালরি।

তাপ পরিমাপ করা হয় ক্যালরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে। ক্যালরিমিটার একটি তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। এ পাত্রে বাইরের কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট ছাড়া গরম ও ঠান্ডা বস্তু (যেমন, পানি ও গরম লোহা) তাপের আদান-প্রদান ঘটানো হয়। একটি গরম বস্তু যে পরিমাণ তাপ ছেড়ে দেয়, ঠান্ডা বস্তু তা গ্রহণ করে। সুতরাং বাইরের কোনো কিছুই সাথে তাপের বিনিময় না হলে,

গরম বস্তুর ছেড়ে দেয়া তাপ = ঠান্ডা বস্তুর গ্রহণ করা তাপ, এটাই তাপ পরিমাপের মূলনীতি।

আপেক্ষিক তাপ

কোনো বস্তুতে তাপ দিলে তার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, ১ গ্রাম পানিতে ১ ক্যালরি পরিমাণ তাপ দিলে পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়। একই পরিমাণ তাপ যদি ১ গ্রাম দুধ, ১ গ্রাম তেল বা ১ গ্রাম অন্য কোনো বস্তুতে দেয়া যায়, তাদের উষ্ণতাও কি ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে? তুমি একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

পরীক্ষা : একটি বিকারে ৫০০ গ্রাম পানি এবং আরেকটি বিকারে ৫০০ গ্রাম খাবার তেল নাও। পানি এবং তেলের প্রাথমিক উষ্ণতা এক এবং তা ঘরের উষ্ণতার সমান। পানির বিকার একটি স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রেখে পাঁচ মিনিট তাপ দাও। একটি থার্মোমিটার দিয়ে পানির উষ্ণতা নাও। এবার পানির বিকার সরিয়ে তেলের বিকার একই স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রেখে পাঁচ মিনিট তাপ দাও। তেলের উষ্ণতা নাও। দেখবে, একই পরিমাণ তাপ গ্রহণ সত্ত্বেও তেলের উষ্ণতা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে দেখা যায় যে, সমপরিমাণ তাপ গ্রহণ করলেও সমভরের বিভিন্ন পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধি বস্তুর উপাদানের ওপর নির্ভর করে। সমান তাপে, সমভরের বিভিন্ন বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি যে ধর্মের কারণে বিভিন্ন হয়, সেই ধর্মকে আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা বা সংক্ষেপে আপেক্ষিক তাপ বলে।

কোনো বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বলতে, ঐ বস্তুর একক ভরের উষ্ণতা এক ডিগ্রি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এক কিলোগ্রাম বস্তুর উষ্ণতা ১ ডিগ্রি কেলভিন বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বলে। আপেক্ষিক তাপের একক হল, জুল প্রতি কিলোগ্রাম-ডিগ্রি কেলভিন সংক্ষেপে জুল/কিগ্রা-কে.।

কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ (জুল / কি গ্রা- কে.)

পানি	৪২০০	পারদ	১৪০
অ্যালুমিনিয়াম	৯০০	উদ্ভিজ্জ তেল	১৯৬৪
তামা	৪০০	কেরোসিন	২১১১
লোহা	৪৫০	বরফ	২১০০

পানির আপেক্ষিক তাপ ৪২০০ জুল/কিগ্রা-কে. এ কথার অর্থ হল ১ কিলোগ্রাম পানির উষ্ণতা ১° কে. বৃদ্ধি করতে

৪২০০ জুল তাপ প্রয়োজন। দেখা যায় যে, পানির আপেক্ষিক তাপ অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিক তাপের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। আবার সাধারণত তরলের আপেক্ষিক তাপ কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের তুলনায় অনেক বেশি। পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপ আমাদের অনেক কাজে লাগে। আপেক্ষিক তাপ বেশি হওয়ার অর্থ হল সামান্য উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যও অনেক বেশি পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আগুন নিভানোর জন্য পানি ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া আমাদের শরীরের প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশই পানি। সুতরাং দেহের তাপ ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। দেহের উষ্ণতা পরিবর্তনের জন্য তাই দেহে তাপ গ্রহণ বা দেহ থেকে তাপ বর্জনের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন। দেহের উষ্ণতা একটা স্থির মানে রাখার জন্য এটা সাহায্য করে।

তাপ সঞ্চালন

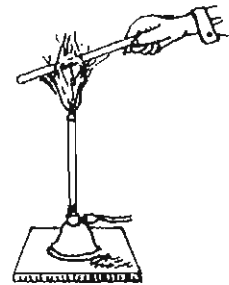
আমরা সপ্তম শ্রেণীতে জেনেছি যে তাপ বেশি উষ্ণতার স্থান থেকে কম উষ্ণতার স্থানে প্রবাহিত হয়। তাপের এ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে তাপ সঞ্চালন বলে।

একটি লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত আগুনে ধরলে অন্য প্রান্তও গরম হয়। পানি ভর্তি কেটলির নিচে তাপ দিলে কেটলির সমস্ত পানিই গরম হয়। আগুনের সামনে দাঁড়ালে গরম লাগে। তিনটি ক্ষেত্রেই কি তাপ একই প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়?

ধর তুমি ক্লাসে প্রথম সারিতে বসে আছ। শেষ সারিতে বসেছে তোমার বন্ধু। সে তোমার বিজ্ঞান বইটি চাইলো। তুমি কীভাবে বইটি তার কাছে পৌছাতে পার? (১) তুমি বইটি তোমার ঠিক পিছনের সারিতে বসা বন্ধুকে দিতে পার, সে আবার দিবে ঠিক তার পিছনের জনকে। এভাবে শেষে বইটি পৌছে যাবে তোমার বন্ধুর কাছে। আবার (২) তুমি নিজেই বইটি নিয়ে সরাসরি তোমার বন্ধুর কাছে গিয়ে তাকে বইটি দিয়ে আসতে পার। অথবা (৩) তোমার জায়গায় থেকেই তার কাছে বইটি ছুড়ে দিতে পার। তাপও এ রকম তিনটি উপায়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। প্রক্রিয়া তিনটি যথাক্রমে (১) পরিবহণ (২) পরিচলন ও (৩) বিকিরণ।

(১) পরিবহণ : একটি লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত আগুনের শিখায় ধরে অন্য প্রান্ত হাত দিয়ে ধর। দেখবে হাতে ধরা প্রান্ত ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পর এত গরম হবে যে আর ধরে রাখা যাবে না। সুতরাং দেখা গেল তাপ লোহার মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছেছে। লোহার কিন্তু কোনো স্থান পরিবর্তন হয় নাই। তাপ সঞ্চালনের এ পদ্ধতিকে পরিবহণ বলে।

আমরা জানি লোহার দণ্ড অসংখ্য অণু দিয়ে গঠিত। দণ্ডের আগুনে ধরা প্রান্তের অণুগুলো আগুন থেকে তাপ শক্তি গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। ফলে অণুগুলোর কম্পন অত্যন্ত বেড়ে যায়। তারা মোটামুটি একই অবস্থানে থেকে কাঁপতে থাকে। এ কম্পমান অণুগুলো পাশের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা অণুগুলোকে ধাক্কা দেয়। ফলে তাদেরও কম্পন বেড়ে যায় এবং তারা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ওদের বর্ধিত কম্পন একইভাবে পাশের অণুগুলোতে সঞ্চালিত হয়। এভাবে অণুতে কম্পন বৃদ্ধি করে তাপ লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছায়। কোনো অণু কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে সরে না, একই স্থানে থেকে কাঁপতে থাকে। তাপ শক্তি এ কম্পনের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছায়। তাপ সঞ্চালনের এ ধরনের প্রক্রিয়াকে পরিবহণ প্রক্রিয়া বলে।

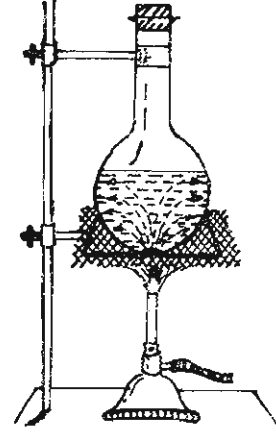


চিত্র ১০.১ : পরিবহণ

এ প্রক্রিয়ার সাথে প্রথম পদ্ধতিতে তোমার বন্ধুর কাছে বই পৌছানোর মিল রয়েছে। বন্ধুদের মাধ্যমে বইটি তোমার কাছ থেকে অন্য প্রান্তে তোমার বন্ধুর কাছে পৌছেছে কিন্তু কেউই তার স্থান পরিবর্তন করে নাই। তবে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বইটি নিয়ে পিছনের দিকে একজনকে দিতে গিয়ে তোমাকে সামনে পিছনে হাত নাড়তে হয়েছে। পরিবহণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালনের জন্য একটি জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। অতএব, যে পদ্ধতিতে কোনো বস্তুর উষ্ণতার অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ সঞ্চালিত হয় অথচ পদার্থের অণুগুলোর কোনো স্থান পরিবর্তন হয় না তাকে

পরিবহণ বলে। তাপ পরিবহণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। সাধারণত কঠিন পদার্থের পরিবহণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। কোনো উষ্ণ বস্তুর সাথে লেগে থাকা শীতল বস্তুতেও এ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়।

২। পরিচলন : একটি কাচের ফ্লাস্কে কিছু পানি দিয়ে তাতে কয়েকটি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা ফেলা হল। দানাগুলো ফ্লাস্কের তলায় গিয়ে জমা হয়। এরা পানিকে রঙিন করে। এখন একটি বার্নারের সাহায্যে ফ্লাস্কের তলায় তাপ দেয়া হল (চিত্র ১০.২)। দেখা যাবে যে, ফ্লাস্কের তলা থেকে মাঝখান দিয়ে রঙিন পানির রেখা উপরে উঠছে এবং উপর থেকে পানির স্রোত ফ্লাস্কের দেওয়াল ঘেঁষে নিচে নেমে আসছে। এর কারণ হল, তাপ পেয়ে প্রথমে ফ্লাস্কের তলার পানি উত্তপ্ত হয় ফলে নিচের গরম পানির ঘনত্ব কমে যায় এবং তা হালকা হয়ে নিচ থেকে উপরে উঠে যায় এবং উপরের শীতল ভারী পানি উপর থেকে নিচে নেমে এসে ঐ স্থান দখল করে। এভাবে দুইটি বিপরীতমুখী পানির স্রোতের সৃষ্টি হয়, একটি উর্ধ্বমুখী গরম পানির স্রোত, অপরটি নিম্নমুখী শীতল পানির স্রোত। এ স্রোতকে পরিচলন স্রোত বলে। এভাবে পানির উত্তপ্ত কণা নিজেই তাপ বহন করে উপরে উঠে আসে। উপরের শীতল পানির কণা নিচে নেমে এসে উত্তপ্ত হয়ে আবার উপরে উঠে আসে। ফ্লাস্কের সমস্ত পানি একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত এ রকম পানির কণাগুলোর ওঠানামা চলতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পানি উত্তপ্ত হয়ে একই উষ্ণতায় আসে। তাপ সঞ্চালনের এ প্রক্রিয়াকে পরিচলন বলে।



চিত্র ১০.২ : পরিচলন

এ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন শুধুমাত্র তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। তুমি বইটি নিজেই যেমন তোমার বস্তুর কাছে বয়ে নিয়ে যেতে পার, তেমনি এ পদ্ধতিতে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো নিজেরাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাপ বয়ে নিয়ে যায়। অতএব,

যে পদ্ধতিতে কোনো পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলো নিজেরাই স্থান পরিবর্তন করে উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ বয়ে নিয়ে যায় সেই পদ্ধতিকে পরিচলন পদ্ধতি বলে।

(৩) বিকিরণ : আমরা জানি তাপের প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে কীভাবে আসে? পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাত্র ৭০০-৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উপরে মহাশূন্য। সুতরাং সূর্য থেকে তাপ এ মহাশূন্যের মধ্যে দিয়েই আসে। শেষের দিকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসলেও কিছু বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে না, কারণ দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের ভূপৃষ্ঠের কাছের অংশ থেকে দূরের অংশের উষ্ণতা কম। কোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই তাপ সঞ্চালনের এ প্রক্রিয়াকে বিকিরণ বলে। তুমি বইটি ছুড়ে তোমার বস্তুর কাছে পৌঁছে দিতে যেমন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আগুনের পাশে দাঁড়ালে তুমি গরম অনুভব কর। এর কারণ আগুন থেকে তাপ এসে তোমার গায়ে লাগে। এখানে তাপ পরিবহণ পদ্ধতিতে আসে না। কারণ বায়ু তাপ পরিবহণ করতে পারে না। পরিচলন পদ্ধতিতে আসে না। কারণ পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, পাশের দিকে আসে না। সুতরাং তাপ এখানে বিকিরণ পদ্ধতি এসেছে। অতএব,

যে পদ্ধতিতে তাপ কোনো জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই অথবা মাধ্যম থাকলে তাকে উত্তপ্ত না করে উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে সঞ্চালিত হয় তাকে বিকিরণ বলে।

বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ আলোর মত সবদিকে সরল রেখায় আলোর গতিতে সঞ্চালিত হয়। আলোর বেগ 3×10^8 মিটার/সেকেন্ড। প্রকৃতপক্ষে সূর্য থেকে আলো ও তাপ একই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে আসে। সূর্যের তাপ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত

করে। কারণ ভূপৃষ্ঠে তাপ বাধা পায়। ভূপৃষ্ঠে তখন কিছুটা তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যে কোনো বস্তুতে তাপ বাধা পেলে সেই বস্তুটি তাপের কিছুটা শোষণ করে নেয়। বিভিন্ন বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা বিভিন্ন। সাদা রঙের বস্তুর চেয়ে কালো রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি।

সব তাপমাত্রায় বস্তু তাপ বিকিরণ করে। শক্তির বিকিরণ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গাকারে মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই সঞ্চালিত হয়ে থাকে। আলোক, বিকীর্ণ তাপ, এক্স রশ্মি, সবই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। শূন্য মাধ্যমে এ তরঙ্গ আলোকের বেগে চলে এবং এ সব তরঙ্গো বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

তাপ পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ : আমরা একটু আগেই দেখেছি যে একটি লোহার দড়ের এক প্রান্ত আগুনের শিখায় ধরলে তাপ পরিবহণ প্রক্রিয়া অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। ফলে সেই প্রান্ত গরম হয়ে ওঠে। একটু পরেই অপর প্রান্ত এত গরম হয়ে ওঠে যে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। একটি কাচ দড়ের এক প্রান্ত আগুনে ধরলে কিছু দেখা যায় অপর প্রান্ত অত তাড়াতাড়ি গরম হয় না। গরম হতে সময় লাগে। এর থেকে বোঝা যায় যে তাপ পরিবহণ ক্ষমতা সব পদার্থের সমান নয়। কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়। এদের তাপ সুপরিবাহী পদার্থ বলে। লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি প্রায় সব ধাতুই তাপ সুপরিবাহী। আবার কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হতে পারে না, ধীরে ধীরে পরিবাহিত হয়। এদের তাপ কুপরিবাহী পদার্থ বলে। কাচ, রবার, কাঁচ, কাগজ, তুলা পশম, কর্ক ইত্যাদি এবং প্রায় সব রকম তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ তাপ কুপরিবাহী।

যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই পরিবাহিত হতে পারে না তাদের তাপ অপরিবাহী পদার্থ বলে। প্রকৃতপক্ষে তাপ অপরিবাহী পদার্থ বলে কোনো পদার্থ নেই। খুব কম হলেও সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ কিছু না কিছু পরিবাহিত হয়। সাধারণত যে সব পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুবই কম, তাদের অপরিবাহী বলা হয়। যেমন- কাঁচ, এবোনাইট, পলিস্টিরিন ইত্যাদি। তবে শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই পরিবাহিত হয় না। তাই শূন্য মাধ্যম তাপ অপরিবাহী।

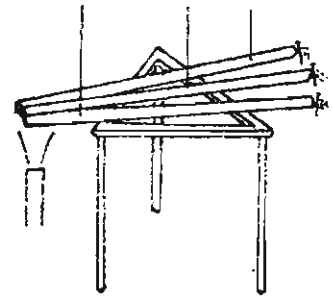
তাপ পরিবাহিতা

আমরা দেখলাম, বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণের ক্ষমতা বিভিন্ন। কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ দ্রুত পরিবাহিত হয়, আবার কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পরিবাহিত হয়। পদার্থের বিশেষ কোনো ধর্মের উপর এ তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে। পদার্থের এ ধর্মকে তাপ পরিবাহিতা বলে। অন্য কথায় কোনো পদার্থের যে ধর্মের ওপর তাপ পরিবহণের হার নির্ভর করে তাকে তাপ পরিবাহিতা বলে। আবার পদার্থের তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতাকেও তার তাপ পরিবাহিতা বলে।

বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা যে বিভিন্ন তা দুই একটি পরীক্ষা করে দেখা যায়।

পরীক্ষা ১: একই ব্যাস এবং একই দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন পদার্থের (তামা, লোহা, কাঁচ) কয়েকটি দণ্ড নাও। দণ্ডগুলো এক প্রান্ত একত্র করে এবং অপর প্রান্ত ছড়িয়ে একটি ত্রিপদ স্ট্যান্ডের উপর রাখ (চিত্র ১০.৩)। ছড়ান প্রান্তগুলোর মাথায় মোম দিয়ে একটি করে ছোট পিন আটকাও। এবার একত্রে রাখা প্রান্তে একটি বার্নার দিয়ে তাপ দাও। কিছুক্ষণ পর দেখবে যে অপর প্রান্তের মোম গলে পিনগুলো একটি একটি করে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু একই সাথে নয়।

এর কারণ কী? এর কারন, বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা বিভিন্ন। যে দড়ের তাপ পরিবাহিতা যত বেশি সেই দড়ের উত্তপ্ত প্রান্ত থেকে তাপ তত তাড়াতাড়ি অন্য প্রান্তে পৌঁছাবে এবং মোম গলিয়ে ফেলবে। ফলে পিন পড়ে যাবে। আমার দড়ের পিন সবচেয়ে আগে পড়বে



চিত্র ১০.৩ : তাপের পরিবাহিতা পরীক্ষা

এবং কাচ দড়ের সবচেয়ে পরে। কারণ তামার তাপ পরিবাহিতা বেশি, কাচের তাপ পরিবাহিতা কম।

পরীক্ষা ২: পানি তাপের কুপরিবাহী। একটি টেস্ট টিউব ঠান্ডা পানি দিয়ে পূর্ণ কর (চিত্র ১০.৪)। এক টুকরা বরফ তার দিয়ে জড়িয়ে ওর মধ্যে ডুবিয়ে দাও। টেস্ট টিউবের নিচের দিকে ধরে একটু কাত করে উপরের অংশে বার্নার দিয়ে তাপ দাও। একটু পরে দেখবে যে উপরের পানি ফুটতে শুরু করেছে কিন্তু নিচের বরফ গেলনি। এর কারণ নিচের অংশ গরম হয়নি, অর্থাৎ পানির মধ্য দিয়ে নিচে তাপ পরিবাহিত হয়নি। উপরের অংশ পরিচলন প্রক্রিয়ায় গরম হয়। এর থেকে দেখা গেল যে, পানি তাপ কুপরিবাহী।



চিত্র ১০.৪: পানি তাপের কুপরিবাহী

তাপ পরিবহনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(১) রান্নার জন্য আমরা যে পাত্র ব্যবহার করি তা সাধারণ তামা, পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হয়। এর কারণ এ সকল ধাতু তাপ সুপরিবাহী। তাই পাত্রে তাপ দিলে তা দ্রুত পাত্রের ভিতরের খাদ্য দ্রব্যে সঞ্চারিত হয়, ফলে তাড়াতাড়ি রান্না হয়। তাপ শক্তির অপচয় হয় কম।

(২) সসপ্যান, প্রেসার কুকার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ইলেকট্রিক কেটলির হাতল এবোনাইট দিয়ে তৈরি হয়। কারণ এবোনাইট তাপ কুপরিবাহী। তাই পাত্র গরম হলেও হাতলে তা পরিবাহিত হতে পারে না। ফলে হাতল ঠান্ডা থাকে। হাতল ধরে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। একই কারণে চায়ের কেটলির হাতলে বেত জড়ানো থাকে। বেতও তাপ কুপরিবাহী।

(৩) খড় দিয়ে অনেক সময় ঘরের চাল তৈরি করা হয়। এ চালে খড়ের সাথে অনেক বায়ুও আটকে থাকে। খড় ও বায়ু তাপ কুপরিবাহী। তাই গরমের দিনে বাইরে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ঘরের ভেতরে পরিবাহিত হয়ে আসতে পারে না। ফলে ঘর ঠান্ডা থাকে। আবার শীতকালে ঘরের ভিতরের তুলনায় বাইরে উষ্ণতা কম থাকে। ঘরের ভিতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না বলে ঘর গরম থাকে।

(৪) বরফ যাতে গলে না যেতে পারে সে জন্য বরফকে কাঠের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কাঠের গুঁড়া তাপ কুপরিবাহী।

(৫) শীতকালে আমরা পশমের পোশাক পরি। পশমের আঁশগুলো আলগাভাবে থাকে, সুতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস আটকে থাকে। পশম এবং বাতাস তাপ কুপরিবাহী। তাই পশমের কাপড় পরলে দেহের তাপ বাইরে যেতে পারে না। তাই শরীর নিজের গরমেই গরম থাকে। পশমের পোশাককে আমরা গরম পোশাক বলি। আসলে কিছু পোশাক গরম নয়। এ পোশাক পরলে গরম বোধ হয়।

গরম কালে আবার আমরা সুতি কাপড় পরি। সুতার আঁশগুলো আলগাভাবে থাকে না বলে এর মধ্যে কম বাতাস আটকে থাকে। তাই সুতি কাপড়, পশমী কাপড়ের চেয়ে কম তাপ কুপরিবাহী। ফলে শরীর থেকে সহজেই তাপ বেরিয়ে যেতে পারে। এ জন্য সুতি কাপড় পরলে শরীর ঠান্ডা থাকে।

তাপ পরিচলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(১) আমাদের নিঃশ্বাসের ফলে ঘরের বাতাস গরম হয়। এ বাতাস বের করে বাইরে থেকে বিশুদ্ধ শীতল বাতাস ঘরে ঢোকাবার ব্যবস্থাকে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা বলে। এর জন্য ঘরের দেওয়ালে ছাদের নিচে কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এ ফাঁকা জায়গাকে ঘুলঘুলি বা ভেন্টিলেটর বলে। ঘরের গরম বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরের বাতাস দরজা জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে। এভাবে পরিচলন পদ্ধতিতে ঘরে বায়ু চলাচল করে।

(২) তোমরা যারা হারিকেন বাতিতে লেখাপড়া কর, তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছে যে কাচের চিমনির নিচের দিকে এবং বাতির উপরের দিকের ঢাকনায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে। যখন বাতি জ্বলে তখন শিখার চারপাশের বাতাস গরম হয়ে হালকা হয় এবং উপরের দিকে ওঠে। উপরের ছিদ্রগুলো দিয়ে সেই গরম বাতাস বেরিয়ে যায়। নিচের ছিদ্রগুলো দিয়ে তখন বাইরের ঠান্ডা বাতাস চিমনির ভেতরে ঢুকে শিখাকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। এভাবে পরিচলন পদ্ধতির সাহায্যে বাতি জ্বলতে থাকে।

কলকারখানায়, ঘরের ভেতরের বাতাস দূষিত ও গরম হয়। এ বাতাসও একইভাবে পরিচলন পদ্ধতিতে চিমনি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।

তাপ বিকিরণের ব্যবহারিক প্রয়োগ

কোনো বস্তুর উপর বিকীর্ণ তাপ পড়লে সেই তাপের এক অংশ প্রতিফলিত হয়, এক অংশ শোষিত হয়, বাকি অংশ বস্তুর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। তাপের কতটা প্রতিফলিত হবে, কতটা শোষিত হবে, আর কতটা সঞ্চালিত হবে তা নির্ভর করে বস্তুর প্রকৃতির উপর। সাদা রঙের বা চকচকে বস্তু তাপ প্রতিফলন করে বেশি, শোষণ করে কম। অমসৃণ কালো বস্তু শোষণ করে বেশি, প্রতিফলন করে কম। আবার যে বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি, তার তাপ বিকিরণ ক্ষমতাও বেশি।

(১) আমরা সাধারণত গরমকালে সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরি আর শীতকালে কালো বা গাঢ় রঙের পোশাক পরি। এর কারণ সূর্যের তাপ সাদা কাপড়ে পড়লে তার বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়, খুব কম অংশই শোষিত হয়। তাই সাদা পোশাক সহজে গরম হয় না। অপরদিকে কালো বা রঙিন পোশাক অধিকাংশ তাপই শোষণ করে, ফলে গরম হয়।

(২) চায়ের কাপের ভিতরটা সাধারণত সাদা ও চকচকে হয়। ফলে চায়ের কাপ তাপ শোষণ করে কম, বিকিরণও করে কম। আবার কাপের দেওয়াল থেকে তাপ প্রতিফলিত হয়ে আবার চায়েই ফিরে আসে। তাই চা অনেকক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকে।

(৩) তোমরা দেখেছ অনেক সময় রান্না করার পাত্রের তলায় মাটি লেপে ও পুড়িয়ে কালো করা হয়। এর কারণ অমসৃণ ও কালো তলদেশ তাপ শোষণ করে বেশি। ফলে রান্না হয় তাড়াতাড়ি। তলা চকচকে সাদা হলে অধিকাংশ তাপই প্রতিফলিত হত, ফলে রান্না হতে দেরি হত।

থার্মোফ্লাক্স

তোমরা অনেকেই হয়তো থার্মোফ্লাক্স দেখেছ এবং ব্যবহার করেছে। থার্মোফ্লাক্সে তুমি গরম চা দুধ বা সুপ অনেকক্ষণ গরম রাখতে পার। আবার ঠান্ডা পানি বা আইসক্রীম অনেকক্ষণ ঠান্ডা রাখতে পার। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জেমস ডিওয়ার থার্মোফ্লাক্স আবিষ্কার করেন। এর গঠন ও কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ:

এটি একটি দুই দেওয়াল বিশিষ্ট কাচের পাত্র (চিত্র ১০.৫)। দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান বায়ুশূন্য করা হয়। ভেতরের দেওয়ালের বাইরের দিক এবং বাহিরের দেওয়ালের ভেতরের দিক বুপার প্রলেপ দিয়ে চকচকে করা থাকে। পাত্রের মুখটি একটি কুপরিবাহী পদার্থের কর্ক বা রাবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। সমস্ত পাত্রটি একটি ধাতুর তৈরি পাত্রের মধ্যে একটি স্প্রিং এর উপর বসানো থাকে। ধাতব পাত্র এবং কাচ পাত্রের মধ্যবর্তী স্থান কুপরিবাহী ফেন্স্ট বা তুলা দিয়ে ভর্তি করা থাকে।

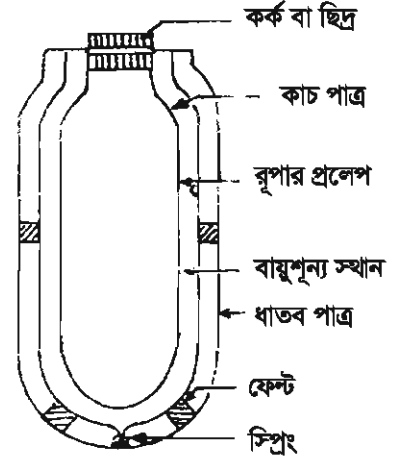
(১) থার্মোফ্লাক্সের দেওয়াল কাচের তৈরি এবং মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ থাকে। তাই তাপ পরিবহন খুব কম হয়। কারণ কাচ ও কর্ক তাপের কুপরিবাহী।

(২) দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান বায়ুশূন্য বলে পরিবহন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ ভেতর থেকে বাইরে বা বাইরে

থেকে ভেতরে যেতে পারে না।

(৩) দুইটি দেওয়ালই রূপার প্রলেপ দিয়ে চকচকে করা থাকে বলে বিকিরণ পদ্ধতিতেও ভেতরের তাপ বাইরে বা বাইরের তাপ ভেতরে যেতে পারে না।

সুতরাং তাপ সঞ্চালনের তিনটি প্রক্রিয়া পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণ কমানোর ব্যবস্থা থার্মোফ্লাস্কে আছে। ফলে ফ্লাস্কে রাখা পানীয় থেকে তাপ বাইরে যেতে পারে না, আবার বাইরে থেকেও তাপ ভেতরে ঢুকে ফ্লাস্কে রাখা ঠান্ডা পানীয়কে গরম করতে পারে না। তাই এতে গরম জিনিস অনেকক্ষণ গরম এবং ঠান্ডা জিনিস অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে।



চিত্র ১০.৫ : থার্মোফ্লাস্ক

দৈনন্দিন জীবনে তাপ শক্তির ব্যবহার

এ পৃথিবীতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন তাপ শক্তির। দৈনন্দিন জীবনে তাপ ব্যবহার করেই আমরা বেঁচে আছি। এ তাপ আমরা পাই সূর্য থেকে এবং খাদ্য থেকে। খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের শরীর গরম রাখে, কাজ করার শক্তি যোগায়। আবার কাঠ কয়লা গ্যাস কেরোসিন ইত্যাদি পুড়িয়ে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে, প্রতিদিন ব্যবহৃত হচ্ছে রান্নার কাজে।

মোটর গাড়ি, রেলগাড়ি, লঞ্চ, জাহাজ, উড়োজাহাজ চলে যে ইঞ্জিনের সাহায্যে সেই ইঞ্জিনও চলে তাপ শক্তি ব্যবহার করে। এদের ইঞ্জিনকে তাই তাপীয় ইঞ্জিন বলে। তাপীয় ইঞ্জিনে ও জ্বালানির রাসায়নিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে তা থেকে যান্ত্রিক শক্তি বা গতিশক্তি পাওয়া যায়।

তাপ দিয়ে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, কাচ, চিনামাটি ইত্যাদি গলিয়ে বাসন কোসন থেকে শুরু করে সুই পর্যন্ত অসংখ্য জিনিস তৈরি করা হচ্ছে, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে লাগে। তুমি যে কাগজ কলম ব্যবহার কর, তা তৈরি করতে ব্যবহৃত হচ্ছে তাপ শক্তি। ভেজা কাপড়, ধান, পাট শুকাতে, কাপড় ইস্ত্রি করতে তাপ ব্যবহার করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে তাপশক্তি ব্যবহারের এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। তুমি নিজে কিছু ভাবতে পার?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- তাপের এস. আই. একক কী?

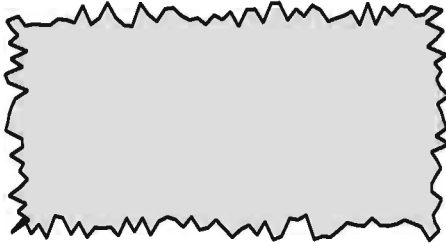
ক. ক্যালরি	খ. কিলোক্যালরি
গ. জুল	ঘ. ওয়াট
- পানির আপেক্ষিক তাপ প্রতি কিলোগ্রামে কত?

ক. ১ ক্যালরি	খ. ১ জুল
গ. ৪.২ জুল	ঘ. ৪২০০ জুল
- আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে কার বেশি?

ক. চক	খ. পানি
গ. তামা	ঘ. বরফ

৪. সূর্য থেকে পৃথিবীতে কোন প্রক্রিয়ায় তাপ আসে?
 ক. পরিবহন
 গ. বিকিরণ
 খ. পরিচলন
 ঘ. তিন প্রক্রিয়াতেই আসে
৫. কোনটি তাপের সুপরিবাহী পদার্থ?
 ক. বায়ু
 গ. সোনা
 খ. বেত
 ঘ. পশমের পোশাক
৬. কোন বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি?
 ক. চক
 গ. লাল রঙের বস্তু
 খ. কয়লা
 ঘ. বেগুনি রঙের বস্তু
- ৭.

কালো খসখসে বস্তু



১

চকচকে বস্তু



২

চিত্র অনুযায়ী-

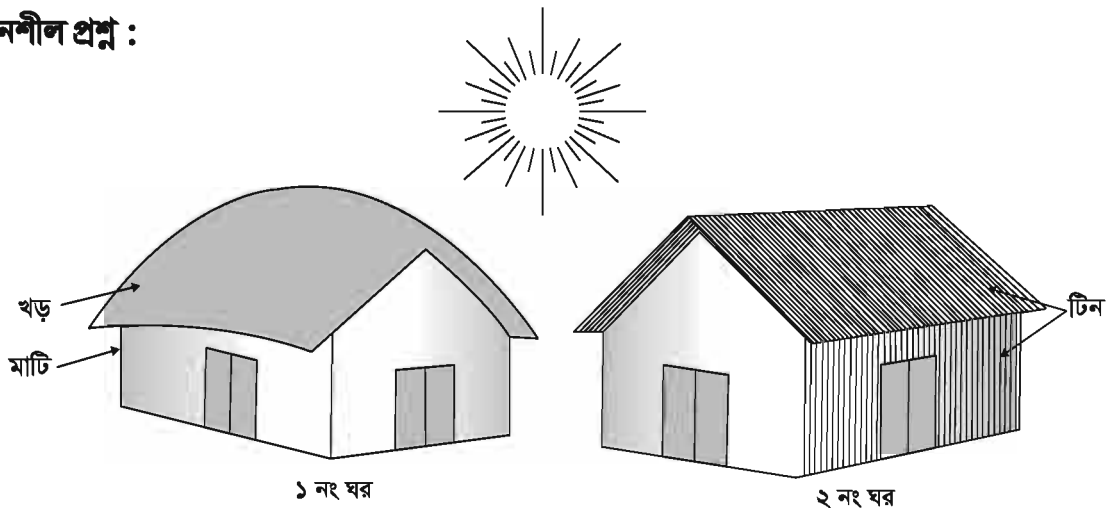
- প্রথম বস্তুটি বেশি আলো শোষণ করবে এবং দ্বিতীয় বস্তুটি বেশি আলো প্রতিফলন করবে
- প্রথম বস্তুটির তাপ বিকিরণ ক্ষমতা দ্বিতীয় বস্তু অপেক্ষা বেশি
- প্রথম বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা দ্বিতীয় বস্তু অপেক্ষা কম

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. iii
 গ. ii ও iii
 খ. i ও ii
 ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

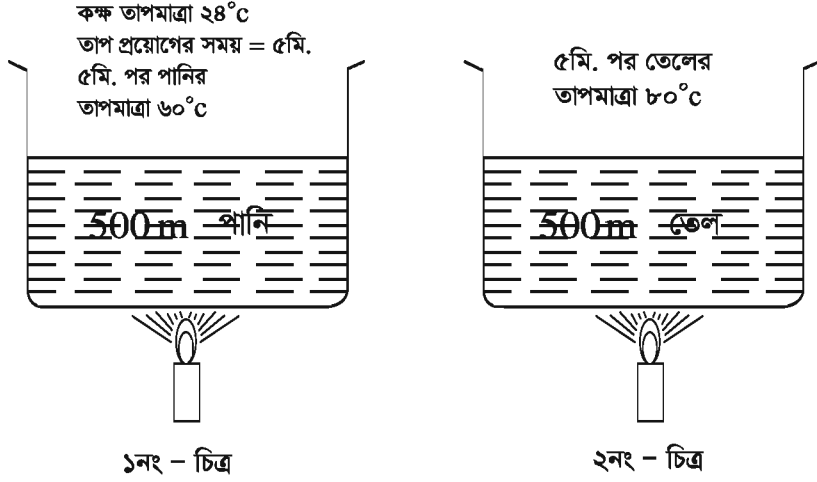
১.



চিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও-

- ক. চিত্রে সূর্য হতে কোন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে।
- খ. ২নং ঘরের চালে তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- গ. ১নং ঘরে (খড় ও মাটি) তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. গ্রীষ্মকালে কোন ঘরে বসবাস করা আরামদায়ক বলে তুমি মনে কর, যুক্তিসহকারে মতামত দাও।

২.



এ ক্ষেত্রে একই ক্ষমতা সম্পন্ন স্পিরিট ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে। উপরের তথ্য ও চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও-

- ক. চিত্রে $^{\circ}\text{C}$ এর অর্থ লিখ।
- খ. এ ক্ষেত্রে তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- গ. পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ঘ. সমান সময় ব্যাপি তাপ প্রয়োগের পরও কেন তেলের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রা হতে বেশি হলো তোমার যুক্তি দাও।

একাদশ অধ্যায়

শব্দ

শব্দ কী?

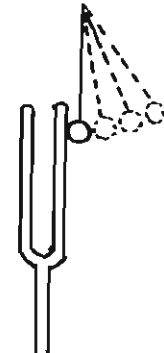
আমরা জানি শক্তির অনেক রূপ। শক্তির কোনো কোনো রূপ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি। যেমন, তাপশক্তি আমাদের গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি জাগায়, আলোকশক্তি দর্শনের অনুভূতি জাগায়। একই রকমে শক্তির যে রূপ আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তাকে শব্দ বলে।

শব্দের উৎপত্তি হয় কম্পনের ফলে। আমরা নানা রকম শব্দ শুনি। যেমন, কথার শব্দ, গানের শব্দ, গাড়ি-ঘোড়া চলার শব্দ, মেঘের গর্জনের শব্দ, বৃষ্টি পড়ার শব্দ, পাখির ডাকের শব্দ, ছুটির ঘণ্টার শব্দ ইত্যাদি। কোনো শব্দ মৃদু, কোনো শব্দ প্রচণ্ড, কোনো শব্দ মধুর, কোনো শব্দ কর্কশ। কোনো শব্দ শুনতে ভাল লাগে, কোনো শব্দ শুনতে বিরক্ত লাগে। এ শব্দ উৎপন্ন হয় কীভাবে?

একটি কাঁসা বা পিতলের বাটি নিয়ে একটি লোহার চামচ দিয়ে আঘাত কর। টুং করে শব্দ হবে। শব্দটি সজো সজোই থেমে যাবে না; কিছুক্ষণ পর্যন্ত শোনা যাবে, তবে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসবে। এবার চামচ দিয়ে বাটিতে আঘাত করার পরপরই তোমার আঙ্গুল দিয়ে বাটিটি স্পর্শ কর। কী অনুভব করবে? অনুভব করবে যে বাটিটি কাঁপছে। স্পর্শ করার সাথে সাথেই এ কম্পন থেমে যাবে এবং শব্দও আর শোনা যাবে না। তাহলে কি বাটিটির কম্পনের সাথে শব্দের কোনো সম্পর্ক আছে? ঠিক তাই।

শব্দ উৎপন্ন হয় কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে। এ কম্পন খুব দ্রুত হয় বলে সাধারণত তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। তবে স্পর্শ করলে অনুভব করা যায়। ঢাকঢোলে কাঠি দিয়ে বাড়ি দিলে তার চামড়ার পর্দায় কম্পন সৃষ্টি হয়ে শব্দ হয়। গীটারের শব্দ সৃষ্টি হয় তারের কম্পনের ফলে। বাঁশিতে ফুঁ দিলে বায়ুই কাঁপতে থাকে এবং শব্দ উৎপন্ন হয়। তোমার গলার উপর আলতোভাবে আঙ্গুল রেখে কথা বল, তুমি কম্পন অনুভব করবে। চুপ করার সাথে সাথে এ কম্পন থেমে যাবে। কম্পন হয় কোথায়? আমাদের গলার মধ্যে স্বরযন্ত্র আছে। স্বরযন্ত্রে দুইটি পাতলা পর্দা আছে যাকে স্বরভদ্রী বলে। আমরা যখন কথা বলি তখন এ স্বরভদ্রীতে কম্পন সৃষ্টি হয়ে শব্দ উৎপন্ন হয়। বস্তুর কম্পন যে শব্দ উৎপত্তির কারণ, তার যদি তুমি আরো কোনো প্রমাণ চাও, তবে নিচের পরীক্ষাটি কর।

পরীক্ষা : এর জন্য তোমার দরকার হবে একটি সুর শলাকা বা টিউনিং ফর্ক (চিত্র ১১.১) এবং সুতা দিয়ে বাঁধা একটি পিথ বল বা শোলার বল যা খুবই হালকা। টিউনিং ফর্ক হল একটি হাতল লাগান U আকৃতির হাতল যুক্ত ইস্পাতের দণ্ড। এর বাহুতে একটি রবারে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর, সজো সজো শব্দ শুনতে পাবে। এবার সুতায় বোলান পিথ বলটি টিউনিং ফর্কের বাহুর সাথে স্পর্শ করাও। দেখবে ধাক্কা খেয়ে সেটি বারবার সরে যাচ্ছে। এ অবস্থায় টিউনিং ফর্কটি স্পর্শ করলে এর কম্পন তুমি অনুভব করবে। স্পর্শ করার সজো সজো কম্পন থেমে যাবে, শব্দও আর শোনা যাবে না। টিউনিং ফর্কের কম্পনই যে শব্দ সৃষ্টির কারণ এ থেকে তা প্রমাণিত হয়।



চিত্র ১১.১ : কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্নের পরীক্ষা

শব্দ চলাচলের জন্য প্রয়োজন কোনো একটি মাধ্যম

আমরা জানলাম, শব্দের উৎপত্তি হয় বস্তুর কম্পনের ফলে। এ শব্দ আমরা দূর থেকে শুনতে পাই কীভাবে? আমরা শব্দ শুনতে পাই কারণ তা বায়ুর মধ্যে দিয়ে এসে আমাদের কানে পৌঁছায়। শব্দের কম্পন বায়ু বয়ে নিয়ে যায় চারিদিকে। আমাদের কানের ভেতরে আছে একটি পাতলা পর্দা। শব্দের কম্পন বায়ুর মধ্য দিয়ে আসে। বায়ু আমাদের কানে প্রবেশ করে এ পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। তখন সেই খবরটি পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে এবং আমরা শব্দটি শুনতে পাই।

শব্দ কি শুধু বায়ু মাধ্যম দিয়েই চলতে পারে? না, শব্দ অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়েও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। যে কোনো তরল বা কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়েও শব্দ চলাচল করতে পারে। কাঠের বা লোহার বেঞ্চের এক প্রান্তে তোমরা কান লগিয়ে অন্য প্রান্তে তোমার এক বন্ধুকে টোকা দিতে বল। টোকা দেওয়ার শব্দ তুমি স্পষ্ট শুনতে পাবে। রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে অনেক দূর থেকে একটি ট্রেন আসতে হয়তো তুমি দেখছ কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছ না। রেল লাইনের উপর কান রাখ, গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পাবে। পুকুরে গোসল করতে গেলে দুজনে কিছু দূরে থেকে ডুব দিয়ে কথা বল, কথা শোনা যাবে। একটি বেলুনের মধ্যে পানি ভর্তি করে একদিকে কান লাগিয়ে অন্যদিকে আঙুল দিয়ে ঘষা দাও। ঘষার শব্দ শুনতে পাবে।

শব্দ কি শূন্য মাধ্যম দিয়ে চলাচল করতে পারে? না, পারে না। কারণ কোনো জড় মাধ্যম না থাকলে শব্দের কম্পন বয়ে নিয়ে যাবে কে? যে বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুর সংলগ্ন মাধ্যমেও তা কম্পন সৃষ্টি করে। মাধ্যমের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে এ কম্পন সঞ্চালিত হয়। মাধ্যমই যদি না থাকে তবে এভাবে কী করে শব্দ সঞ্চালিত হবে? তাই শব্দ চলাচল অর্থাৎ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন হয় কোনো জড় মাধ্যমের যা বায়বীয়, তরল বা কঠিন যে কোনো দশায় বা অবস্থায় হতে পারে। চাঁদে কোনো বায়ু নেই। তাই দুই জন নভোচারী যদি চাঁদে যেয়ে কথা বলে তবে শুধু ঠোঁটের নড়াচড়াই দেখতে পাবে, কথা শুনতে পাবে না।

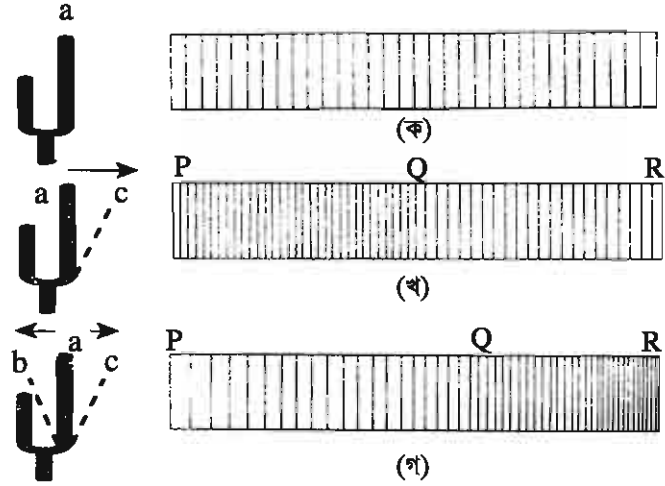
শব্দ সঞ্চালন কৌশল

যে বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে শব্দের উৎস বলে। কোনো উৎস হতে উৎপন্ন শব্দ কীভাবে বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়?

কোনো বস্তুর কম্পন বলতে আমরা বুঝি বস্তুটি একবার এক দিকে যায়, ক্ষণিকের জন্য থেমে দিক পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে যায়, আবার ক্ষণিকের জন্য থেমে দিক পরিবর্তন করে প্রথম দিকে যায় এবং এভাবে বারবার এদিক ওদিক যাতায়াত করতে থাকে। বস্তুটি যখন একদিকে যায় তখন সংলগ্ন বায়ু স্তরকে সংকুচিত করে। আবার যখন অপরদিকে যায় তখন সংলগ্ন বায়ু স্তরকে প্রসারিত করে। এভাবে কম্পনশীল শব্দ উৎস সংলগ্ন বায়ুস্তরকে একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত করতে থাকে। এ বায়ুস্তর আবার পরবর্তী বায়ুস্তরকে একইভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত করে, সেই স্তর আবার তার পরবর্তী স্তরকে করে। এভাবে বায়ুস্তরের সংকোচন ও প্রসারণ শব্দের উৎস থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ শব্দ সঞ্চালিত হয়।

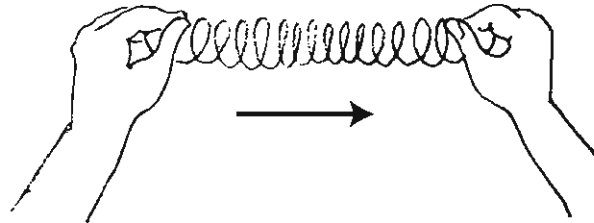
ধরা যাক, একটি টিউনিং ফর্ক এর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (চিত্র ১১.২ ক)। বোঝার সুবিধার জন্য টিউনিং ফর্কের সামনের বাতাসকে অনেকগুলো পাতলা বায়ুস্তরে বিভক্ত হিসেবে কল্পনা করা হয়। কম্পমান টিউনিং ফর্কের বাহু যখন ডানদিকে অর্থাৎ c- এর দিকে অগ্রসর হয় তখন এর সংলগ্ন বায়ুস্তরকে চাপ প্রয়োগ করে, ফলে বায়ুস্তর সংকুচিত হয় (চিত্র ১২.২ খ)। এ সংকুচিত স্তরটি আবার পরবর্তী বায়ুস্তরকে সংকুচিত করে। এভাবে একটির পর একটি বায়ুস্তর সংকুচিত হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত টিউনিং ফর্কের বাহু স্থির অবস্থার ডান দিকে যেতে থাকে। যখন বাহু বাম দিকে অর্থাৎ b- এর দিকে অগ্রসর হয় তখন সংলগ্ন বায়ুস্তরের উপর চাপ কমে, ফলে বায়ুস্তর এবার প্রসারিত হয় (চিত্র ১১.২ গ)। সংকুচিত অংশ সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তার পেছনে প্রসারিত অংশ অগ্রসর হয়। ফর্কের বাহু আবার যখন ডানদিকে অগ্রসর হয় তখন আবার সংকোচন প্রবাহ শুরু হয়। এভাবে ফর্কের বাহুর কম্পনের ফলে বায়ুস্তরের সংকোচন ও প্রসারণ পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে। কোনো উৎসের কম্পনের ফলে বায়ু মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সৃষ্ট এ

সংকোচন ও প্রসারণকে শব্দ তরঙ্গ বলে। শব্দ তরঙ্গ আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, উৎস সংলগ্ন বায়ুকণাগুলোর কিছু কোনো স্থানান্তর হয় না। অর্থাৎ বায়ুকণাগুলো নিজেরাই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শব্দকে বহন করে নিয়ে যায় না। তারা শুধু তাদের স্থির অবস্থানের সামনে পেছনে দুলতে থাকে। ফলে বায়ুতে পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ শব্দ তরঙ্গই শব্দকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। এখানে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে শব্দ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি। শব্দ শক্তির



চিত্র ১১.২ : শব্দ সংবলণ প্রক্রিয়া

বাহন হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ। বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তরঙ্গ বলতে কী বোঝায়। একটি বড় গামলায় পানি নিয়ে তার মাঝখানে একটি টিল ফেল। দেখবে পানিতে উঁচু নিচু ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে কিনারা দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি ছোট কাগজের নৌকা ঢেউ এর উপর রাখলে সেটি একই স্থানে উপরে নিচে দুলতে থাকবে। নৌকাটির এ উপরে নিচে দোলার জন্য কিছু শক্তি ব্যয়ের নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছে। এ শক্তি সে কোথা থেকে পেয়েছে? পেয়েছে টিলটির কাছ থেকে। টিলটি পানিতে যেখানে পড়ে সেখানকার পানি কণাগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে। সেই কম্পনই পর্যায়ক্রমে পার্শ্ববর্তী পানির স্থির কণাগুলোতে বিস্তারিত হয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এভাবে এক স্থানের কম্পন সৃষ্টির শক্তি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। তরঙ্গ হল শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার একটি পদ্ধতি। আলোক শক্তি এবং তাপ শক্তিও তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। তুমি একটি লম্বা দড়ির একপ্রান্ত একটি খুঁটির সাথে বেঁধে আরেক প্রান্ত ধরে ওপরে নিচে একটি বাঁকুনি দাও। দড়ির প্রতিটি অংশই উপরে নিচে ওঠানামা করে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তোমার হাতে ধরা দড়িতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে তা চলে যাচ্ছে দড়ির অন্য প্রান্তে, দড়ির কোনো অংশ কিছু যাচ্ছে না। এভাবে তরঙ্গ শক্তিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য স্থানে। একটি শব্দ তরঙ্গ কীভাবে চলে সে সম্পর্কে তুমি ধারণা পেতে পার। একটি স্প্রিংকে প্রথমে সংকুচিত এবং পরে প্রসারিত করে ১১.৩ চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে। বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গ এভাবেই সংবলিত হয়।



চিত্র ১১.৩ : তরঙ্গ

সব শব্দই শোনা যায় না

তোমার দুই হাত প্রসারিত করে উপরে নিচে দোলাও। হাতের এ কম্পনের ফলে কি শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে, কারণ সব কম্পনই শব্দ সৃষ্টি করে। এ শব্দ কিন্তু তুমি শুনতে পাবে না। সব শব্দই শোনা যায় না।

শব্দের উৎসের কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। কম্পন হল বস্তুটির বারবার সামনে পেছনে দোলা। দোলায়মান বস্তুটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেয়ে আবার প্রথম প্রান্তে ফিরে আসা হল একটি পূর্ণ কম্পন।

বস্তুটি প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে।

সব কম্পনই আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগাতে পারে না। দেখা গেছে উৎসের কম্পাঙ্ক যদি ২০ এর কম হয় এবং ২০,০০০ এর বেশি হয় তবে সে কম্পন আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে সে শব্দ আমরা শুনতে পাই না। উৎসের কম্পাঙ্ক ২০ থেকে ২০,০০০ এর মধ্যে থাকলেই শুধু আমরা সে শব্দ শুনতে পাই। তাই এ সীমাকে শ্রাব্যতার সীমা বলা হয়। উৎসের কম্পাঙ্ক ২০ এর কম থাকলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে শব্দের (infrasonic) শব্দ বলে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সব মানুষই কিন্তু ২০ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায় না। অধিকাংশ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ২৫ থেকে ১৮,০০০ পর্যন্ত কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায়। শিশুরা আরো কম থেকে আরো বেশি পর্যন্ত কম্পাঙ্ক শুনতে পায়। তোমরা নিজেরাও নিশ্চয় খেয়াল করেছ যে, সকলেই একরকম শুনতে পারে না।

শ্রাব্যতার সীমা আবার সকল প্রাণীর জন্য একরকম নয়। কুকুর, বিড়াল চামচিকা ২০,০০০ এর বেশি কম্পাঙ্কের শব্দও শুনতে পারে। এক ধরনের বিশেষ বাঁশি আছে, যা ২০,০০০ এর বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। এ বাঁশির শব্দ মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু কুকুর শুনতে পেয়ে মালিকের কাছে ছুটে আসে। বাদুড় শ্রবণোত্তর শব্দ উৎপন্ন করতে পারে এবং চোখে দেখতে না পেলেও এ শব্দের সাহায্যে অন্ধকারে চলাফেরা করতে পারে।

শব্দের বেগ : বজ্রপাতের সময় আকাশে আলোর বলক প্রথমে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর শব্দ শোনা যায়। এর কারণ কী? এর কারণ বজ্রপাতের স্থান থেকে আমাদের কানে শব্দ এসে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগে। আলোও আসতে সময় লাগে। কিন্তু আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে অনেক বেশি। তাই আলো আগে দেখা যায়, শব্দ শোনা যায় পরে। একই কারণে তুমি যদি দূর থেকে ক্রিকেট খেলা দেখ, তবে ব্যাট দিয়ে বল মারা দেখবে আগে, শব্দ শুনবে পরে। দূর থেকে বন্দুকের গুলি ছোড়া দেখলে ধোঁয়া দেখার পরে বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। এ সব থেকে বোঝা যায় যে, দূরত্ব অতিক্রম করতে শব্দের কিছু সময় লাগে। অর্থাৎ শব্দের বেগ আছে। প্রতি সেকেন্ডে নির্দিষ্ট দিকে শব্দ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে।

$$\therefore \text{শব্দের বেগ} = \frac{\text{শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

শব্দের বেগ মাধ্যমের উপর নির্ভর করে। মাধ্যমের উষ্ণতা এবং ঘনত্বের উপর শব্দের বেগ নির্ভর করে। যেমন, ০° সে. উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুতে শব্দের বেগ প্রায় ৩৩২ মিটার/ সেকেন্ড, ৩০ সে. উষ্ণতায় প্রায় ৩৫০ মিটার/সেকেন্ড। পানিতে শব্দের বেগ এর প্রায় সাড়ে চারগুণ বেশি, প্রায় ১৫০০ মিটার/সেকেন্ড। ইস্পাতের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ প্রায় ৫০০০ মিটার /সেকেন্ড অর্থাৎ বায়ুতে শব্দের বেগের প্রায় ১৫ গুণ বেশি। সাধারণভাবে শব্দের বেগ বায়বীয় মাধ্যমে সবচেয়ে কম, তরল মাধ্যমে তার চেয়ে বেশি এবং কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি।

শব্দের প্রতিফলন : প্রতিধ্বনি

কোনো নিরিবিলি জায়গায় কোনো দালান থেকে প্রায় ২০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে একবার জোরে হাততালি দাও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপরদিক থেকে কে যেন তার জবাবে হাততালি দিচ্ছে তুমি শুনতে পাবে। একটি গভীর কুয়ার নিচের দিকে মুখ করে জোরে চিৎকার দাও। পরপরই একই রকম চিৎকার নিচ থেকে শুনতে পাবে। শব্দের এ পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। প্রতিধ্বনি হয় শব্দের প্রতিফলনের কারণে।

আয়নায় আলোক রশ্মির প্রতিফলনের মত শব্দ তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়। শব্দ তরঙ্গ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের উপর আপতিত হলে এর একাংশ মাধ্যম দুইটির বিভেদ তল থেকে দিক পরিবর্তন করে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাকে শব্দের প্রতিফলন বলে। প্রতিফলনের ফলে শব্দের যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে প্রতিধ্বনি বলে। শব্দের

প্রতিফলন আলোর প্রতিফলনের সূত্রই মেনে চলে। তবে মসৃণ এবং চকচকে তল আলোর সবচেয়ে ভাল প্রতিফলক কিন্তু শব্দের সবচেয়ে ভাল প্রতিফলক হল বিস্তৃত শক্ত, কঠিন তল। তাই পাহাড়, পর্বত, দালানে শব্দ প্রতিফলনের কারণে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে শব্দের কিছু সময় লাগে বলে প্রতিধ্বনি একটু পরে শোনা যায়।

আমরা যখন ঘরের মধ্য কথাবার্তা বলি তখন সেই কথার শব্দ কি ঘরের দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়? হ্যাঁ হয়। তবে প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না কেন? কারণ কোনো শব্দ কানে পৌঁছালে তার অনুভূতি বা রেশ আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড পর্যন্ত থেকে যায়। তাই মূল শব্দের $\frac{1}{10}$ সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিধ্বনি কানে পৌঁছালে মূল শব্দ থেকে প্রতিধ্বনিকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূল শব্দ ও এর প্রতিধ্বনির মধ্যে ন্যূনতম সময়ের ব্যবধানে $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন এবং এ সময়ের মধ্যে শব্দকে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার নিকট ফেরত আসতে হবে। অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে শব্দ শ্রোতা এবং প্রতিফলকের দূরত্ব দুইবার অতিক্রম করে। কক্ষ উচ্চতা 30° সে হলে বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 340 মিটার। $\frac{1}{10}$ সেকেন্ডে শব্দ প্রায় 34 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং শ্রোতা থেকে প্রতিফলক অর্থাৎ দেয়ালের দূরত্ব যদি ন্যূনতম 34 মিটারের অর্ধেক 17 মিটার হয় তবেই প্রতিধ্বনি মূল শব্দ থেকে আলাদা ভাবে শোনা যাবে। সাধারণ ঘরের আকার এর চেয়ে ছোট বলে ঘরের মধ্যে কথাবার্তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। কিন্তু বড় হল ঘরে বক্তৃতা, গানবাজনা হলে অনেক সময় প্রতিধ্বনির জন্য তা স্পষ্ট শোনা যায় না। সে জন্য সিনেমা হল বা মিলনায়তনের দেয়ালে ফোম জাতীয় নরম বস্তুর প্যাড লাগানো থাকে এবং মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো থাকে। নরম বস্তুতে শব্দ শোষিত হয় বেশি। সামান্যই প্রতিফলিত হয়। ফলে প্রতিধ্বনি হয় না।

বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরে ও বিভিন্ন স্তরের মেঝে শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি হতেই মেঘের গুড় গুড় ধ্বনি শোনা যায়। বাদুড় চলার সময় বিভিন্ন উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টি করে। এ শব্দ প্রতিফলকে বাধা পেয়ে তার কানে ফিরে আসলে প্রতিধ্বনি হিসেবে তা শুনতে পায় এবং সামনে প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে ঐ পথ পরিহার করে। এভাবে রাতের অন্ধকারে বাদুড় চলাচল করে থাকে।

শব্দ দূষণ

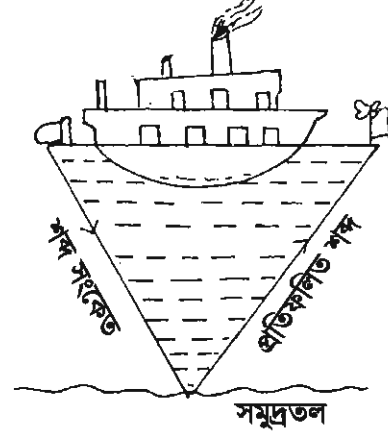
সঙ্গীতের মধুর আওয়াজ আমাদের মন জুড়িয়ে দেয়। মনের ক্লান্তি দূর করে। কিন্তু সর্বক্ষণই যদি কানের কাছে লাউডস্পীকারে গান বাজতে থাকে তখন কি ভাল লাগে? তখন ভাল লাগে না বরং বিরক্ত লাগে। তীব্র শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। পড়াশুনায় বা কাজে মন বসে না। অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে যে ব্যক্তি লাউডস্পীকারে গান বাজায় তার সাথে কেউ কেউ ঝগড়া করে বসেন। কানের কাছে হঠাৎ তীব্র শব্দ হলে আমরা চমকে উঠি, বুক ধড়ফড় করে। যাদের হৃৎপিণ্ড দুর্বল তারা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারাও যেতে পারেন। উচ্চ এবং সার্বক্ষণিক শব্দ আমাদের কানেরও ক্ষতিসাধন করে। তীব্র শব্দে অনেক সময় কানের পর্দা ফেটে যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যেসব শিল্প কারখানায় বেশি শব্দ হয় সেখানে যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়। দশ বছর কাজ করলে শ্রবণশক্তি প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। আরো দেখা গেছে যে অতিরিক্ত এবং উচ্চ শব্দের পরিবেশ মানুষের স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে; মানসিক উত্তেজনা, উৎকর্ষা, অশান্তি বৃদ্ধি করে। এমনকি ক্ষুধা নষ্ট করে, হজমের গোলমাল সৃষ্টি করে। আলসার বা অন্যান্য অন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। মোট কথা অতিরিক্ত এবং উচ্চ শব্দ আমাদের দেহ ও মনের ক্ষতি সাধন করে থাকে। একেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলে। গাড়ির হাইড্রোলিক হর্ণ এর শব্দও অত্যধিক ক্ষতিকর।

অপ্রয়োজনীয় শব্দ যেন আমাদের পরিবেশ দূষিত করতে না পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোনো কোনো দোকানদার দেখা যায়, সারাদিন লাউডস্পীকারে গান বাজাচ্ছে। কেউ কেউ আবার মাইক লাগিয়ে ঔষধ বা লটারির টিকিট বিক্রি করছে। এ সব যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তা তুমিও তাদেরকে বোঝাতে পার। এভাবে শব্দ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি না করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। তুমি নিজেও কখনো তোমার রেডিও, টু-ইন ওয়ান উচ্চস্বরে বাজাবে না এবং ওয়াকম্যানের ইয়ারফোন সারাদিন কানে লাগিয়ে ঘুরবে না।

দৈনন্দিন জীবনে শব্দের ব্যবহার

কথাবার্তা, গান বাজনা, রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ইত্যাদি শোনার কাজে আমরা সবসময়ই শব্দ ব্যবহার করছি। এ ছাড়া বিশেষ কিছু কাজে ও আমরা শব্দ ব্যবহার করে থাকি। নিচে শব্দের তিনটি ব্যবহার বর্ণনা করা হল:

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় : শব্দের প্রতিফলনের কারণে যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের জাহাজ থেকে একটি ক্ষণস্থায়ী শব্দ তরঙ্গ সমুদ্র তলদেশ বরাবরে প্রেরণ করা হয়। সমুদ্র তলদেশে প্রতিফলিত হয়ে এ শব্দ আবার জাহাজে ফিরে আসে। সমুদ্রের পানিতে শব্দের বেগ এবং শব্দ তরঙ্গের সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত যেতে এবং ফিরে আসতে কত সময় লাগে তা জানা থাকলে তার থেকে সহজেই সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। একটি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিফলিত শব্দও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হয়। শব্দ প্রেরণ ও ধারণের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়। এভাবে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য শ্রবণোত্তর শব্দ ব্যবহার করা হয় কারণ শ্রবণোত্তর শব্দ বিক্ষিপ্ত এবং শোষিত না হয়ে সরল পথে চলে।



চিত্র ১১.৪ : প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়

স্টেথোস্কোপ : তোমার জ্বর হলে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি যে

যন্ত্রটির সাহায্যে তোমার বুকে পরীক্ষা করেন তার নাম স্টেথোস্কোপ। যে গোলাকার চ্যাপটা জিনিসটি তিনি তোমার বুকের উপর চেপে ধরেন তার মধ্যে রয়েছে একটি পাতলা পর্দা। তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ এ পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। কম্পনের শব্দ দুইটি রবারের নলের মধ্য দিয়ে যেয়ে ডাক্তার সাহেবের কানে পৌঁছায়। নলের মধ্যের শব্দ নলের বাইরে ছড়িয়ে যেতে পারে না বলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের গতি ও প্রকৃতির শব্দ ডাক্তার সাহেব স্পষ্ট শুনতে পান।

বাদ্যযন্ত্র : হারমোনিয়াম, পিয়ানো, সেতার, বেহালা, একতারা, ঢোল, তবলা ইত্যাদি সকল বাদ্যযন্ত্রই বিভিন্ন সুর সৃষ্টি করে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে। পিয়ানোতে সুর সৃষ্টি হয় বাতাসের কম্পনে। ঢোল বা তবলায় আঘাত করলে চামড়ার পর্দায় স্পন্দন থেকে শব্দ সৃষ্টি হয়। সেতার বা বেহালাতে শব্দ সৃষ্টি হয় তারের কম্পনে, বাঁশিতে সৃষ্ট সুর তৈরি হয় বাতাসের কম্পনে। শব্দের প্রকৃতি কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। কম কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে মোটা, গম্ভীর এবং কর্কশ লাগে। বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ মিহি এবং সরু শোনায়। ছেলেদের গলার আওয়াজ মোটা শোনায়, কারণ কম্পাঙ্ক কম। মেয়েদের গলার আওয়াজ চিকন শোনার কারণ তাদের কণ্ঠস্বরের শব্দের কম্পাঙ্ক বেশি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- শব্দের বেগ কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি?

ক. বায়বীয়	খ. তরল
গ. কঠিন	ঘ. শূন্য
- কোন বস্তুটি প্রতিধ্বনি সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে উপযোগী?

ক. তুলার কাপড়	খ. রবারের ফোম
গ. কাগজ	ঘ. ইস্পাত
- শব্দের বেগ প্রতিসেকেন্ডে ৩৫০ মিটার। প্রতিফলকের কোন দূরত্বে প্রতিধ্বনি শূন্য যাবে-

ক. ১৮ মিটার	খ. ১৭ মিটার
গ. ১৬ মিটার	ঘ. ১৫ মিটার

নিচের তথ্যের সাহায্যে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

মহাখালি বাস স্ট্যান্ডের পাশে রহিম মিঞার চায়ের দোকান। প্রায় দশ বছর যাবত সে দোকান চালাচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি উচ্চ হর্ন বাজিয়ে স্টেশনে আসে ও যায়। রহিম মিঞা খাওয়া দাওয়া সবকিছুই ঠিকমত করে। এতদিন সে সবার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করত। ইদানিং তার মেজাজ খুব খিটমিটে হয়ে গেছে। অল্প কথাই রেগে যায়। সে পেটের পিড়ায়ও ভুগছে।

- রহিম মিঞার শরীর খারাপ হওয়ার জন্য সবচেয়ে দায়ী-

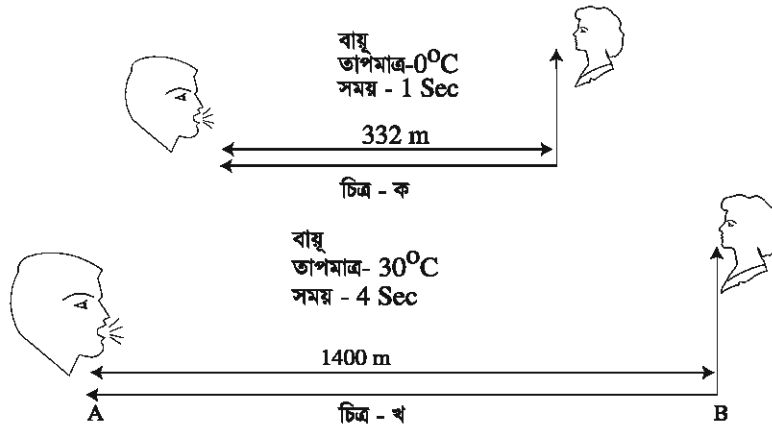
ক. ফ্যাণ্ডের অসামঞ্জস্যকর পরিবেশ	খ. অতিরিক্ত কথা বলা
গ. বয়স হয়ে যাওয়া	ঘ. পরিবেশের শব্দ দূষণ
- এ অবস্থায় রহিম মিঞার আর যা হতে পারে-
 - শ্রবণ শক্তি কমে যেতে পারে
 - ঘুম কমে যেতে পারে
 - রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

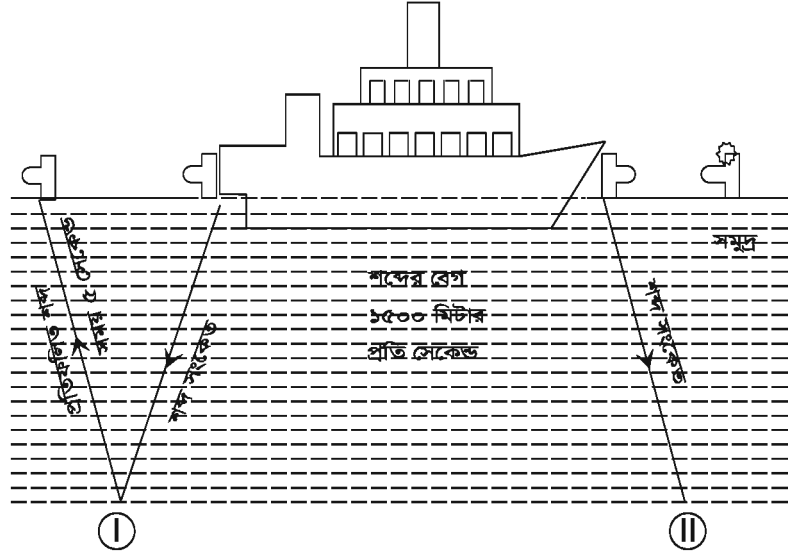
সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. 332m দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে। খ. 'খ' চিত্রে শব্দের বেগ ব্যাখ্যা কর।
 গ. 'খ' চিত্রে অনুযায়ী শব্দের বেগ নির্ণয় কর। ঘ. দুইটি চিত্রের আলোকে শব্দের তীব্রতা ব্যাখ্যা কর।

২.



উপরে চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

- ক. চিত্রে (I) অংশকে কী বলে।
 খ. সাধারণ পানি ও এ ক্ষেত্রে শব্দের বেগের তুলনা কর?
 গ. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় কর।
 ঘ. (I) অংশে পুনরায় শব্দ শূন্য গেলেও (II) অংশে শব্দ পুনরায় শূন্য যাচ্ছে না কেন- ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

স্বচ্ছ মাধ্যমে আলোক একটি নির্দিষ্ট গতিতে সরল রেখায় চলে। আলোক স্বচ্ছ মাধ্যমে থেকে কোনো অস্বচ্ছ মাধ্যমের উপর আপতিত হলে তার কিছু অংশ শোষিত হয়, অবশিষ্ট অংশ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আলোক এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে যদি অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন কী হয়? তখনো কি আলোক একই সরল রেখায় যায়? আলোর গতি কি একই থাকে? এ অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে জানব।

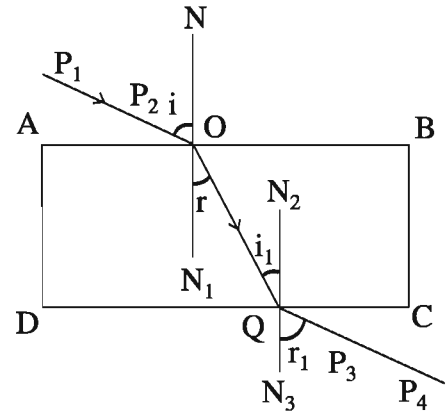
আলোর প্রতিসরণ

একটি কাচের গ্লাসে আধা গ্লাস পানি নাও। তোমার পেনসিলটি গ্লাসের পানিতে আংশিক ডুবিয়ে কাত করে ধর। পেনসিলটিকে কেমন দেখাচ্ছে? দেখবে বাঁকা দেখাচ্ছে। এর কারণ কী? আমরা জানি কোনো বস্তু থেকে আলোক রশ্মি এসে আমাদের চোখে পড়লে বস্তুটি দেখা যায়। এখানে পানিতে নিমজ্জিত পেনসিল থেকে আলোক রশ্মি স্বচ্ছ মাধ্যম পানির মধ্য দিয়ে এসে, স্বচ্ছ মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করে চোখের উপর পড়ছে। সোজা পেনসিলটি বাঁকা দেখাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে পানি থেকে আলোকরশ্মি বাতাসে প্রবেশ করার সময় তার গতিপথও বেঁকে গেছে। দুই মাধ্যমে আলোকরশ্মি একই সরল রেখায় চললে পেনসিলটি সোজাই দেখাত, বাঁকা দেখাত না। সুতরাং আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশকালে আলোকরশ্মির গতিপথের দিক পরিবর্তন হয়। আলোকরশ্মির এ দিক পরিবর্তনকে আলোর প্রতিসরণ বলে। স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতরে আলোক সরল রেখায় চলে। সুতরাং আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন হয় মাধ্যম দুইটির বিভেদ তল থেকে। আবার লম্বভাবে আপতিত হলে আলোকরশ্মির কোনোরূপ দিক পরিবর্তন হয় না, আলোকরশ্মি একই সরল রেখায় দ্বিতীয় মাধ্যমে চলতে থাকে।

প্রতিসরণের নিয়ম

আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশকালে তার গতিপথের দিক পরিবর্তন কোনদিকে হয় তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা করা যায়।

পরীক্ষা : টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজের উপর একটি আয়তাকার কাচের ফলক রাখ। একটি পেনসিল দিয়ে এর সীমারেখা ABCD আঁক (চিত্র ১২.১)। কাচ ফলকের একদিকে দুইটি পিন P_1 ও P_2 কাচ ফলকের সাথে কোণ করে খাড়াভাবে বসাও। এবার অন্যদিকে থেকে কাচের মধ্য দিয়ে পিন দুইটি দেখ এবং সেদিকে আরো দুইটি পিন P_3 ও P_4 খাড়া করে এমনভাবে বসাও যেন চারটি পিনই একই সরল রেখায় দেখায় অর্থাৎ চারটি পিনকে একটি পিন বলে মনে হয়। এবার পিনগুলো উঠিয়ে এদের অবস্থান পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত কর। কাচ ফলকটি সরেও। P_1P_2 দিয়ে একটি সরল রেখা টান। এ সরল রেখা AB রেখাকে O বিন্দুতে স্পর্শ করে। P_3P_4 দিয়ে আরেকটি সরল রেখা টান। এ রেখাটি DC রেখাকে Q বিন্দুতে স্পর্শ করে। OQ যোগ কর। O বিন্দুতে NON_1 লম্ব আঁক।



চিত্র ১২.১ : আলোর প্রতিসরণের পরীক্ষা

প্রথম মাধ্যম থেকে যে আলোকরশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে পতিত হয় তাকে আপতিত রশ্মি বলে। P_1O আপতিত রশ্মি। আপতিত রশ্মি বিভেদ তলে যে বিন্দুতে পতিত হয় তাকে আপতন বিন্দু বলে। O আপতন বিন্দু। প্রতিসরণের

ফলে যে আলোক রশ্মি দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে তাকে প্রতিসরিত রশ্মি বলে। OQ প্রতিসরিত রশ্মি। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোণ বলে। কোণ P_1ON বা i আপতন কোণ। প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিসরণ কোণ r বলে। কোণ QON_1 বা r প্রতিসরণ কোণ।

এখানে স্বচ্ছ মাধ্যম দুইটি হচ্ছে বায়ু এবং কাচ। আলোকরশ্মি P_1P_2 সরল রেখা বরাবর এসে মাধ্যম দুইটির বিভেদতলে O বিন্দুতে আপতিত হয়। তারপর প্রতিসরিত হয়ে অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করে কাচ মাধ্যমে রশ্মিটি OQ পথে যায়। কাচ ফলকের বিপরীত দিকের বিভেদ তলে Q বিন্দু দিয়ে রশ্মিটি বেরিয়ে আবার দিক পরিবর্তন করে বায়ু মাধ্যমে P_3P_4 পথে যায়। অর্থাৎ আলোকরশ্মিটির পথ হল $P_1P_2 OQ P_3P_4$ বরাবর।

পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, কোনো আলোকরশ্মি যখন বায়ু মাধ্যম অর্থাৎ হালকা মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যম অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন রশ্মিটি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়। অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ r আপতন কোণ i এর চেয়ে ছোট হয়। আবার, আলোক রশ্মিটি যখন কাচ মাধ্যম থেকে বায়ু মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সেটি বেঁকে অভিলম্ব হতে দূরে সরে যায়। প্রতিসরণ কোণ r_1 আপতন কোণ i_1 এর চেয়ে বড় হয়। এটা প্রতিসরণের নিয়ম।

আলোকরশ্মি যদি লম্বভাবে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন কী হয়? তখন আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণ উভয়ই শূন্য হয়। অর্থাৎ আলোকরশ্মির প্রতিসরণের জন্য কোনোরূপ দিক পরিবর্তন হয় না, একই সরল রেখায় দ্বিতীয় মাধ্যমে চলতে থাকে।

পরীক্ষার সময় আপতিত রশ্মি P_1O , প্রতিসরিত রশ্মি OQ এবং অভিলম্ব NON_1 কাগজের সমতলে অর্থাৎ একই সমতলে অবস্থিত থাকে। এটাও প্রতিসরণের একটি নিয়ম। সুতরাং আমরা দেখলাম প্রতিসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হয়। নিয়মগুলো হল :

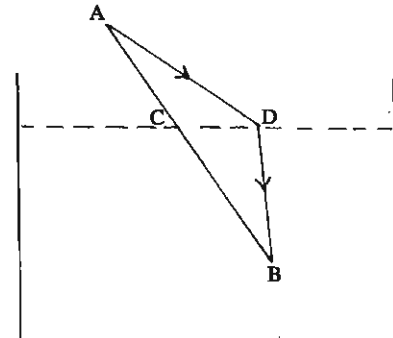
(১) আলোকরশ্মি তির্যকভাবে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়। আর ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে বেঁকে যায়।

(২) আলোকরশ্মি মাধ্যম দুইটির বিভেদতলে লম্বভাবে পতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মির কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

(৩) আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি দিক পরিবর্তন করে কেন?

কারণ আলোর বেগ সব মাধ্যমে সমান নয়। আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি, প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিমি, বায়ুতে আলোর বেগের প্রায় সমান। কাচ মাধ্যমে আলোর বেগ প্রায় সেকেন্ডে ১,৮০,০০০ কিমি। আলোর একটি অশূন্য চরিত্র আছে। আলো সবসময়ই সেই পথে চলে যে পথে যেতে সবচেয়ে কম সময় লাগে। বায়ু মাধ্যমের A বিন্দু থেকে (চিত্র ১২.২) পানি মাধ্যমের B বিন্দুতে আলোকরশ্মি যদি সরল রেখায় ACB পথে যায়, তবে পানি মাধ্যমে CB দূরত্ব যেতে হয়। আর যদি ADB পথে যায় তবে পানি মাধ্যমে DB দূরত্ব যেতে হয়। CB এর দৈর্ঘ্য DB এর দৈর্ঘ্য থেকে বেশি। পানি মাধ্যমে আলোর বেগ কম বলে এতে সময় লাগবে বেশি। তাই আলোকরশ্মি বিশেষ একটি পথ ADB বেছে নেয় যে পথে যেতে সবচেয়ে কম সময় লাগে।

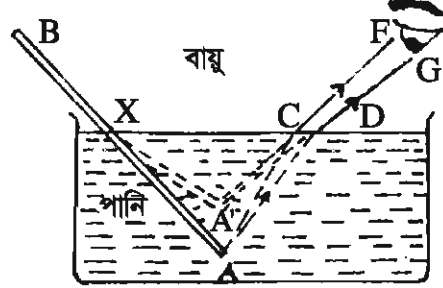


চিত্র : ১২.২

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি কতটুকু বেঁকে যাবে তা নির্ভর করে মাধ্যম দুইটিতে আলোর বেগের উপর; কারণ আলোর বেগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন। দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর বেগ যত কম হবে আলোকরশ্মি অভিলম্বের দিকে তত বেশি বেঁকে যাবে। বায়ু থেকে পানি মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি যত বাঁকবে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করলে তার চেয়ে বেশি বাঁকবে।

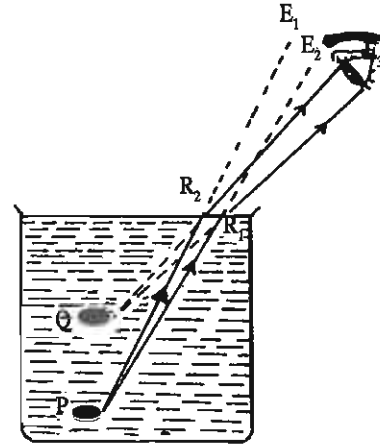
প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত

(১) একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে একটি সোজা লাঠি কাত করে পানিতে ডোবাও। এখন উপর থেকে তাকালে লাঠিটি বাঁকা দেখাবে। এর কারণ লাঠির পানিতে নিমজ্জিত অংশের কোনো বিন্দু থেকে আলোকরশ্মি পানি থেকে বায়ু অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। সুতরাং প্রতিসরণের নিয়ম অনুযায়ী মাধ্যম দুটির বিভেদতলে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়ে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে (চিত্র ১২.৩) যেমন, A বিন্দু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি AC AD প্রতিসরণের পর যথাক্রমে CF এবং DG পথে যাবে। এ রশ্মি দুইটিকে পেছনের দিকে বাড়ালে A' বিন্দুতে মিলিত হবে। ফলে A বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব হল A' অর্থাৎ A বিন্দু A' বিন্দুতে উঠে আছে বলে মনে হবে। এরূপ পানিতে নিমজ্জিত অংশের যে কোনো অংশই খানিকটা উপরে উঠে আছে বলে মনে হবে। ফলে লাঠিটি বায়ু ও পানির বিভেদতলে বাঁকা এবং কিছুটা ছোটও দেখাবে।



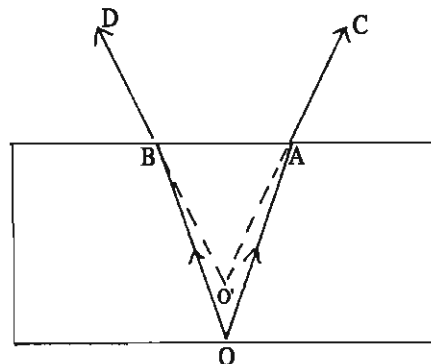
চিত্র ১২.৩ : প্রতিসরণের ফলে সোজা লাঠি বাঁকা দেখায়

(২) একটি খালি পাত্রে একটি ছোট মুদ্রা যেমন পঁচিশ পয়সার মুদ্রা রাখ। পাত্রের কিনারা বরাবর চোখ এমনভাবে রাখ যেন মুদ্রাটি একটুর জন্য দেখা না যায়। এ অবস্থায় চোখ স্থির রেখে পাত্রে পানি ঢালতে থাক নিজেকে না পারলে অন্য কারো সাহায্য নাও। এখন পয়সাটি দেখা যাবে।



চিত্র ১২.৪ : প্রতিসরণের ফলে অদৃশ্য মুদ্রা দেখা

(৩) একটি সাদা কাগজের উপর একটি কালো চিহ্ন O দাও (চিত্র ১২.৫)। তার উপর একটি কাচের ফলক রাখ। উপর থেকে দেখলে দেখবে চিহ্নটি অনেকটা উপরে উঠে এসেছে বলে মনে হবে। ধরা যাক, O বিন্দু থেকে নির্গত দুইটি আলোকরশ্মি কাচ মাধ্যমে OA এবং OB পথে চলে। বায়ু মাধ্যমে প্রবেশ করার পরে দিক পরিবর্তন করে রশ্মি দুইটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে AC এবং BD পথে যাবে। AC ও BD রশ্মি দুইটি পেছনের দিকে বাড়ালে O' বিন্দুতে মিলিত হবে।



চিত্র ১২.৫ : কাচের নিচের বস্তু ওপরে মনে হয়

অর্থাৎ উপর থেকে দেখলে O বিন্দু O' বিন্দুতে উঠে এসেছে বলে মনে হবে।

একটি পানি ভর্তি চৌবাচ্চা সোজা উপর থেকে দেখলে একই কারণে এর প্রকৃত গভীরতা থেকে কম গভীর বলে মনে হয়। চৌবাচ্চার তলদেশ প্রতিসরণের ফলে উপরে উঠে এসেছে বলে মনে হওয়াতেই এমন হয়। আবার পানির নিচে কোনো বস্তু কোথায় আছে তা ঠিক বোঝা যায় না। এ কারণে তুমি যদি পানির নিচের মাছ সড়কি দিয়ে মারতে চাও, তবে মাছ যেখানে আছে বলে মনে হয়, সেই বরাবর সড়কি ছুড়লে মাছ মারতে পারবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে মাছ থাকবে তার নিচে।

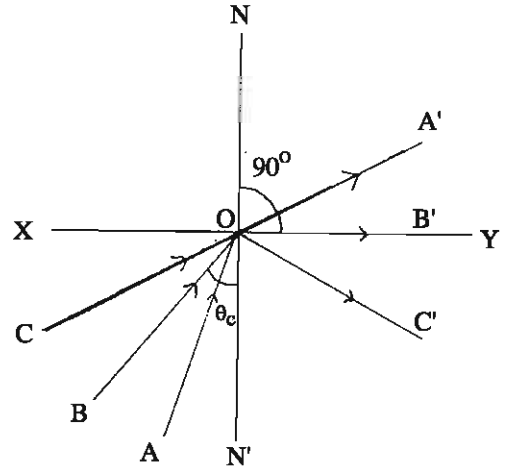
আলোর প্রতিসরণের ব্যবহার

ক্যামেরা, প্রজেক্টর, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্রে আলোর প্রতিসরণের নীতি কাজে লাগানো হয়। চোখ খারাপ হলে আমরা যে চশমা ব্যবহার করি, আলোর প্রতিসরণের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হতো না।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ

আমরা জানি, আলোক রশ্মি ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করলে, প্রতিসরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ বড় হয়। আপাতন কোণ বাড়ালে প্রতিসরণ কোণও বাড়ে। এখন আপতন কোণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ঘন মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট আপতন কোণের জন্য হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ 90° হবে। অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদতল ঘেঁষে যাবে। এ নির্দিষ্ট আপতন কোণকে সংকট কোণ বলে। আপতন কোণ সংকট কোণ থেকে আরও বাড়ালে কী হবে? প্রতিসরণ কোণ 90° থেকে বেশি হতে হবে। কিন্তু প্রতিসরণ কোণ 90° এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। সুতরাং রশ্মি আর হালকা মাধ্যমে যাবে না। আপতিত রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসবে। এ ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

(১২.৬) নং চিত্রে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যম বায়ুতে যাওয়ার পথে কতগুলো আলোকরশ্মি বিভেদ তলে আপতিত হয়েছে। XY মাধ্যম দুইটির বিভেদতল। NON', O বিন্দুতে XY এর উপর লম্ব। AO আপতিত রশ্মি বিভেদতলে আপতিত হয়ে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে OA' পথে প্রতিসৃত হয়। একই রকম BO রশ্মি প্রতিসৃত হয়ে OB' পথে যায়। BO রশ্মির জন্য আপতন $\angle BON'$ সুতরাং আপতন $\angle BON'$ হলে প্রতিসরণ $\angle NOY = 90^\circ$ হয়। অতএব $\angle BON' = \theta_c$ হচ্ছে সংকট কোণ। CO রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণ থেকে বড়। সুতরাং এ রশ্মি প্রতিসরিত হবে না। O বিন্দুতে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে OC' বরাবর আবার পানি মাধ্যমে ফিরে আসবে। একেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।



চিত্র ১২.৬ : আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

সংকট কোণ : কোনো আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, ঘন মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট আপতন কোণকে ঐ দুই মাধ্যমের সংকট কোণ বলে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : কোনো আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতলে ঐ দুই মাধ্যমের জন্য সংকট কোণ থেকে বড় কোণে আপতিত হয়, তবে রশ্মিটি প্রতিসরিত না হয়ে প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়ে ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

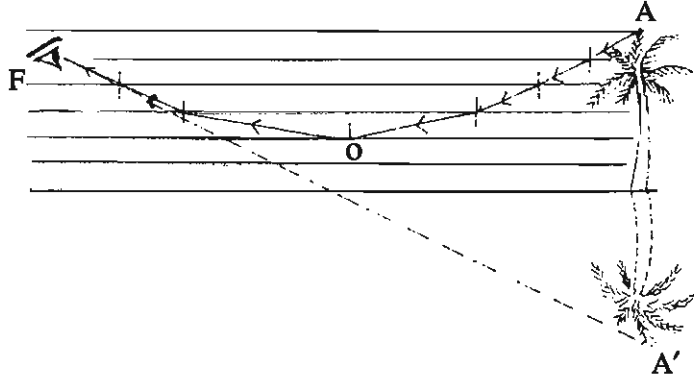
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

- (১) আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে।
- (২) ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ মাধ্যমদ্বয়ের সংকট কোণ থেকে বড় হতে হবে।

অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে পূর্ণ প্রতিফলন বলা হয় কেন? এর কারণ সাধারণ নিয়মিত প্রতিফলনে সবসময়ই আলোর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়, কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়। কিন্তু পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে আলোর সম্পূর্ণ অংশই প্রতিফলিত হয়, কোনো আংশিক প্রতিসরণ হয় না। সাধারণ প্রতিফলন এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মধ্যে আর কী কী পার্থক্য তুমি চিন্তা করতে পার?

মরীচিকা

মরীচিকা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। মরুভূমিতে দিনের বেলায় প্রচণ্ড রোদে বালু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বালু সংলগ্ন বায়ুস্তরও তাই উত্তপ্ত হয়। ফলে বায়ুস্তরও হালকা হয়। অর্থাৎ মাটি সংলগ্ন বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। মাটি থেকে যত উপরে ওঠা যায়, উষ্ণতা তত কমে। ফলে ক্রমাগত উপরের বায়ুস্তর ঘনতর হয়। এতে অনেক দূরের কোনো গাছের মাথা (চিত্র ১২.৭) থেকে আলোকরশ্মি নিচের দিকে যাওয়ার সময় ঘন মাধ্যম থেকে ক্রমাগত হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে। তাই প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে যেতে আলোকরশ্মি এমন এক স্তরে পৌঁছাবে যেখানে আপতন কোণ নিচের বায়ুস্তর সাপেক্ষে ঐ স্তরের সংকট কোণ থেকে বড় হবে। তখন (চিত্রে O বিন্দু হতে) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং প্রতিফলিত রশ্মি ক্রমাগত উপরের দিকে হালকা থেকে ঘন বায়ু স্তরে যাবে। ফলে এবার প্রতিসরিত রশ্মি



চিত্র ১২.৭ : মরীচিকা

ক্রমাগত অভিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে। এভাবে অবশেষে আলোক রশ্মি যখন কোনো মরুযাত্রীর চোখে এসে পড়ে তখন সে গাছের উল্টা প্রতিবিম্ব A' দেখতে পায়। মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ এবং উষ্ণতা পরিবর্তনের জন্য বায়ু স্তরের ঘনত্ব অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকে, ফলে এ বায়ু স্তরের ভেতর দিয়ে আসা আলোক রশ্মির দিক তথা A এর অবস্থান অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং প্রতিবিম্বটি কাঁপছে বলে মনে হয়। তাই তার কাছে প্রতিবিম্বকে কোনো জলাশয়ে প্রতিফলিত গাছের প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। মরুভূমিতে পানির অভাব। তাই মরুযাত্রী পানির আশায় সেদিকে ছুটে যায় কিন্তু পানি পায় না। এ দৃষ্টান্তকে মরীচিকা বলে।

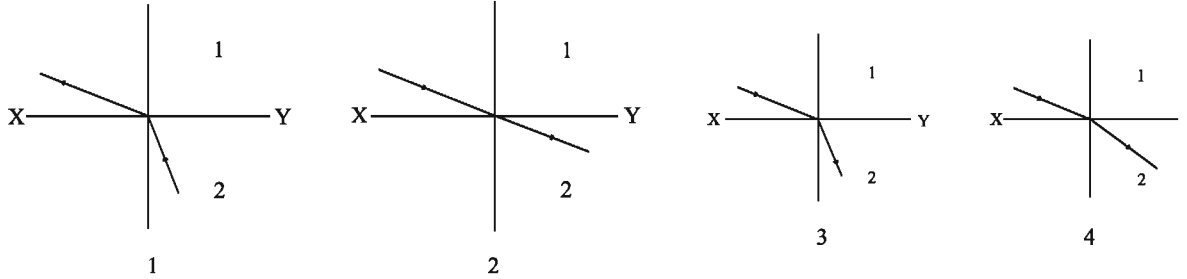
প্রচণ্ড রোদে পিচের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ, রাস্তা চকচকে এবং পানিতে ভেজা বলে মনে হয়। একই কারণে এরকম দেখায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. আলোকরশ্মি দুইটি স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদতলে লম্বভাবে পতিত হলে-
 - ক. আপতন কোণ 0° এবং প্রতিসরণ কোণ 90° হয়।
 - খ. আপতন কোণ 90° এবং প্রতিসরণ কোণ 0° হয়।
 - গ. আপতন কোণ 0° এবং প্রতিসরণ কোণ 0° হয়।
 - ঘ. আপতন কোণ 90° এবং প্রতিসরণ কোণ 90° হয়।
২. পানি থেকে বায়ুতে আলোকরশ্মি 89° কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ 90° হয়। এই দুই মাধ্যমের জন্য সংকট কোণ কত?
 - ক. 0°
 - খ. 85°
 - গ. 89°
 - ঘ. 90°
৩. শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত?
 - ক. ৩,০০,০০০ কিমি/সে.
 - খ. ২,২৫,০০০ কিমি/সে.
 - গ. ১,৮০,০০০ কিমি/সে.
 - ঘ. 'শূন্য'
৪. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে-
 - ক. আপতন কোণ = সংকট কোণ
 - খ. আপতন কোণ < সংকট কোণ
 - গ. আপতন কোণ > সংকট কোণ
 - ঘ. আপতন কোণ > প্রতিফলন কোণ

নিচের চিত্র থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



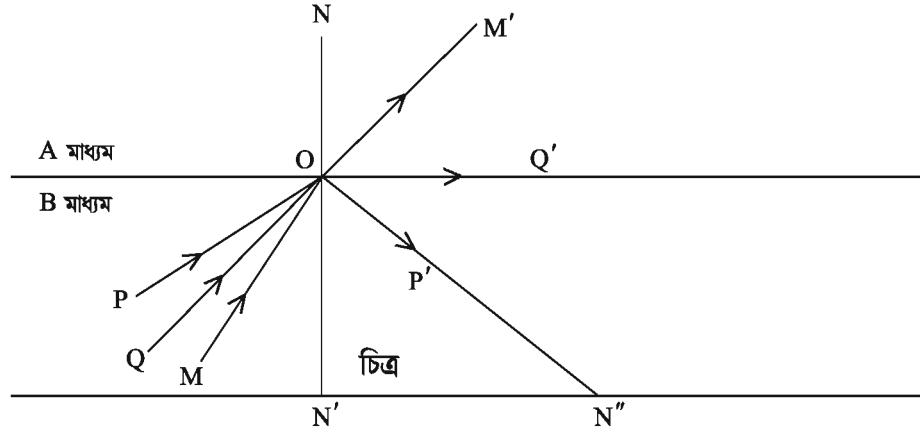
৫. কোন চিত্রের দুইটি মাধ্যম একই-
 - ক. I
 - খ. II
 - গ. III
 - ঘ. IV
৬. চিত্রে আলোর গতি পথ ভিন্ন হওয়ার কারণ-
 - i. মাধ্যম দুইটি ঘনত্বের ভিন্নতা
 - ii. আলোর গতিবেগের ভিন্নতা
 - iii. আলোর তীব্রতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

- ক. MO আলোক রশ্মি কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমে যাচ্ছে ?
- খ. কোনটি ঘন মাধ্যম যুক্তিসহ লিখ ।
- গ. যুক্তিসহ সংকট কোণের মান প্রকাশ কর ?
- ঘ. N'' বিন্দুতে OP' রশ্মির প্রতিফলন ঐকে এর গতিপথ ব্যাখ্যা কর ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

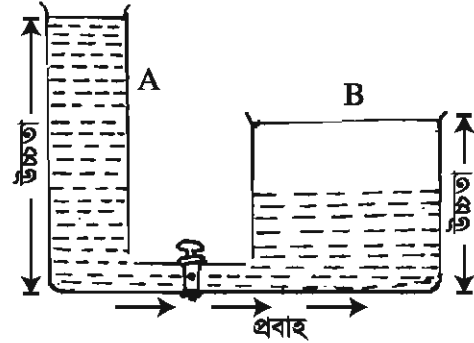
বিদ্যুৎ

বৈদ্যুতিক বিভব

দুইটি চার্জযুক্ত পরিবাহীকে একটি ধাতব তার দিয়ে যুক্ত করলে, চার্জ কোন পরিবাহী থেকে কোন পরিবাহীতে প্রবাহিত হবে অথবা আদৌ প্রবাহিত হবে কিনা তা পরিবাহী দুইটিতে চার্জের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। যার ওপর নির্ভর করে তাকে বৈদ্যুতিক বিভব বা বৈদ্যুতিক চাপ বলে। বৈদ্যুতিক চাপকে উচ্চতা বা পানির চাপের সাথে তুলনা করা যায়।

আমরা জানি দুইটি বস্তুর মধ্যে তাপীয় সংযোগ স্থাপন করলে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের প্রবাহ ওদের উচ্চতার উপর নির্ভর করে, তাপের পরিমাণের উপর নয়। যে বস্তুর উচ্চতা বেশি সেই বস্তু থেকে কম উচ্চ বস্তুতে তাপ যাবে। দুইটি বস্তুর উচ্চতা সমান না হওয়া পর্যন্ত তাপ প্রবাহ চলতে থাকবে।

আবার ধর, A ও B দুইটি পানিপূর্ণ পাত্র একটি নল দিয়ে যুক্ত আছে। নলে একটি স্টপকর্ক লাগান আছে (চিত্র ১৩.১)। A পাত্রটি সরু B পাত্রটি মোটা। A পাত্রের পানির উচ্চতা বেশি, B পাত্রের পানির উচ্চতা কম। এখন স্টপকর্কটি খুলে দিলে দেখা যাবে A পাত্র থেকে পানি B পাত্রের দিকে যাচ্ছে, যদিও A পাত্রে পানির পরিমাণ B পাত্রের পানির পরিমাণের চেয়ে কম। পানির প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত A পাত্রের পানির উচ্চতা B পাত্রের পানির উচ্চতা থেকে বেশি থাকে। দুইটি পাত্রের পানির উচ্চতা সমান হওয়া মাত্র পানির প্রবাহ থেমে যাবে। পানির চাপ পানির উচ্চতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং পানির প্রবাহ পাত্র দুইটিতে পানির উচ্চতা বা চাপের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, পানির পরিমাণের উপর নয়। একই রকম দুইটি চার্জযুক্ত পরিবাহীর মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করলে চার্জের প্রবাহ বস্তু দুইটিতে চার্জের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিভব পার্থক্যের উপর। উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, তাপ প্রবাহ উচ্চতার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, পানি প্রবাহ পানির উচ্চতা বা চাপের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে; আর বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহ বৈদ্যুতিক বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। উচ্চতা যেমন কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা বুঝায়, বৈদ্যুতিক বিভব বলতেও তেমন কোনো পরিবাহীর বৈদ্যুতিক অবস্থা বুঝায়। দুইটি পরিবাহীর মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে চার্জগুলোর পারস্পরিক বিকর্ষণ হতে একটি চাপ সৃষ্টি হয়। এ চাপকে বৈদ্যুতিক চাপ বলে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অবশ্য চাপ কথাটি প্রচলিত নয় বিভব কথাটিই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দুইটি চার্জযুক্ত পরিবাহীকে সংযুক্ত করলে ওদের যে বৈদ্যুতাবস্থা ওদের মধ্যে চার্জ আদান প্রদানের দিক নির্ণয় করে তাকে ওদের বৈদ্যুতিক বিভব বা বৈদ্যুতিক চাপ বলে।

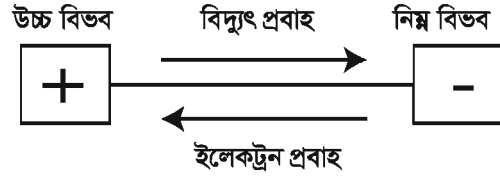


চিত্র ১৩.১ : পানির প্রবাহ পানির চাপের উপর নির্ভর করে

বিদ্যুৎ প্রবাহ

ভিন্ন বিভবযুক্ত দুইটি বস্তুকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহ হয়। বস্তু দুইটির মধ্যে বিভব পার্থক্য যত বেশি হবে বিদ্যুৎ প্রবাহ তত বেশি হবে।

বিভব পার্থক্য কম হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ কম হয়। বিভব পার্থক্য না থাকলে প্রবাহ হয় না। সুতরাং বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু রাখতে হলে, কোনো প্রক্রিয়ায় বস্তু দুইটির মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখতে হয়। বিদ্যুৎ কোষে রাসায়নিক শক্তি এবং ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে বিভব পার্থক্য বজায় রাখা হয়।



অতএব কোনো উপায়ে যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায়, তাহলে নিম্ন বিভবের বস্তু থেকে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন উচ্চ বিভবের বস্তুতে অনবরত প্রবাহিত হতে থাকে।

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট দিকে এ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকেই বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে।

পরিমাণগতভাবে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে। যদি কোনো পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে t সেকেন্ডে q পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তবে বিদ্যুৎ প্রবাহ i এর পরিমাণ হবে,

$$i = \frac{q}{t} \text{ বা, } q = it$$

চার্জের একক

আমরা জানি দুইটি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর দুইটি বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী সি.এ. কুলম্ব আবিষ্কার করেন যে দুইটি চার্জের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল নির্ভর করে-

১। চার্জ দুইটির পরিমাণের উপর

২। চার্জ দুইটির মধ্যকার দূরত্বের উপর এবং

৩। চার্জ দুইটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির উপর।

তঁার এ আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে চার্জের একক নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে চার্জের এককের নামও তঁার নামানুসারে রাখা হয়েছে কুলম্ব। কুলম্ব হচ্ছে সেই পরিমাণ চার্জ যা সমপরিমাণ ও সমধর্মী চার্জ থেকে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে এক মিটার দূরে স্থাপন করলে পরস্পরকে ৯×১০^৯ নিউটন বল দিয়ে বিকর্ষণ করে। অন্য কথায়, দুইটি সমপরিমাণ, সমধর্মী চার্জকে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে রাখলে যদি ওদের মধ্যকার পারস্পরিক বিকর্ষণ বলের পরিমাণ ৯×১০^৯ নিউটন হয়, তবে ওদের প্রত্যেকটির চার্জের পরিমাণকে এক কুলম্ব বলে। কুলম্ব চার্জের এস. আই. একক।

কুলম্বকে অতি সহজে এভাবেও প্রকাশ করা যায় : কোনো পরিবাহীর মধ্যদিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ঐ পরিবাহীর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ চার্জকে এক কুলম্ব বলে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের একক

বিদ্যুৎ প্রবাহের এস. আই. এককের নাম অ্যাম্পিয়ার। কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে এক কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হলে সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণকে এক অ্যাম্পিয়ার বলে।

কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার অর্থ হল, ঐ পরিবাহীর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১ কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হওয়া, প্রতি সেকেন্ডে ১০ কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হলে ১০ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

অল্পমাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য দুইটি ছোট একক ব্যবহার করা হয়- মিলি অ্যাম্পিয়ার ও মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার।

১ মিলি অ্যাম্পিয়ার = 10^{-3} অ্যাম্পিয়ার

১ মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার = 10^{-6} অ্যাম্পিয়ার

অর্থাৎ ১ অ্যাম্পিয়ার = 10^3 মিলি অ্যাম্পিয়ার = 10^6 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার

বৈদ্যুতিক চাপ বা বিভব পার্থক্যের একক

বিভব পার্থক্যের আন্তর্জাতিক এবং ব্যবহারিক একক ভোল্ট।

কোনো পরিবাহীর দুই বিন্দুর মধ্যে যে বিভব পার্থক্যের জন্য এক কুলম্ব চার্জ চালিত করতে এক জুল কাজ করতে হয়, তাকে এক ভোল্ট বলে।

বৈদ্যুতিক রোধ

একটি মোটা নলের মধ্য দিয়ে পানি যত সহজে প্রবাহিত হয়, একটি সরু নলের মধ্য দিয়ে তত সহজে হয় না। মোটা নল দিয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয় কারণ বাধা কম পায়। নলটি সরু হলে কম পানি প্রবাহিত হয়, কারণ বাধা বেশি। একই রকম একটি মোটা এবং একটি সরু তারের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য যদি একই রাখা হয়, তবে মোটা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি হয় এবং সরু তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ কম হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মোটা তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ কম বাধা পায়, আর সরু তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি বাধা পায়। কোনো পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয় তাকে ঐ পরিবাহীর রোধ বলে।

আমরা জানি চার্জের প্রবাহের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। পরিবাহীর মধ্যে অণু পরমাণু আছে। এদের সাথে গতিশীল ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ইলেকট্রনগুলোর গতি বাধা পায়। এ বাধার কারণে বিদ্যুত প্রবাহের মাত্রা কমে। এ বাধাই পরিবাহীর রোধ।

সকল পদার্থের রোধ সমান নয়। যে পদার্থের রোধ কম সেই পদার্থের মধ্যে দিয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আবার যে পদার্থের রোধ বেশি তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ কম হয়। সুপরিবাহী পদার্থের রোধ কম। কুপরিবাহী পদার্থের রোধ বেশি। কাঠ, রবার, কাগজ ইত্যাদি পদার্থের রোধ এত বেশি যে এদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহই হতে পারে না। এ সকল পদার্থকেই অপরিবাহী বা অন্তরক বলে।

রোধের একক : রোধের এস. আই. একক ও'ম। যে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে তার মধ্যদিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেই পরিবাহীর রোধকে এক ও'ম বলে। কোনো পরিবাহীর রোধ ১০ ও'ম বলতে পরিবাহীটির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ১০ ভোল্ট হলে এর মধ্য দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে বুঝায়।

কোনো পরিবাহীর রোধ তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, উপাদান, উষ্ণতা এবং পরিবাহীর অন্যান্য ভৌত অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

ও'ম রোধের একক হিসাবে ছোট। বড় মানের রোধ পরিমাপের জন্য তাই ও'মের গুণিতক কিলোও'ম এবং মেগাও'ম ব্যবহার করা হয়।

১ কিলোও'ম = ১০০০ ও'ম

= 10^3 ও'ম

১ মেগাও'ম = ১০০০০০০ ও'ম

= 10^6 ও'ম

বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক

কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা উৎস একক সময়ে যে কাজ করে তাকে তার ক্ষমতা বলে। অথবা কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড বিদ্যুৎ চালনা করলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হয়, অর্থাৎ অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেমন তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদিকে যন্ত্রটির বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে।

বৈদ্যুতিক ক্ষমতার ব্যবহারিক একক ওয়াট। প্রতি সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে। যদি কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হয় এবং এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তবে ঐ যন্ত্রটির বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এক ওয়াট।

$$\text{ওয়াট} = \text{ভোল্ট} \times \text{অ্যাম্পিয়ার}$$

বৈদ্যুতিক ক্ষমতার বড় একক হল কিলোওয়াট

$$১ \text{ কিলোওয়াট} = ১০০০ \text{ ওয়াট}$$

বৈদ্যুতিক শক্তির একক

কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। কাজ দিয়ে শক্তি পরিমাপ করা হয়। কাজ বা শক্তির ব্যবহারিক একক হল জুল। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে, পরিবাহীর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ এক সেকেন্ড ধরে প্রবাহিত হতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হয় অর্থাৎ অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে এক জুল বলে।

$$\begin{aligned} ১ \text{ জুল} &= ১ \text{ ভোল্ট} \times ১ \text{ অ্যাম্পিয়ার} \times ১ \text{ সেকেন্ড} \\ &= ১ \text{ ওয়াট} \times ১ \text{ সেকেন্ড} \end{aligned}$$

বিদ্যুৎ শক্তির এস. আই. একক হল ওয়াট ঘণ্টা। এক ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো যন্ত্রের মধ্যদিয়ে এক ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে এক ওয়াট-ঘণ্টা বলে।

$$\begin{aligned} ১ \text{ ওয়াট-ঘণ্টা} &= ১ \text{ ওয়াট} \times ১ \text{ ঘণ্টা} \\ &= ১ \text{ ওয়াট} \times (৬০ \times ৬০) \text{ সেকেন্ড} \\ &= ৩৬০০ \times ১ \text{ ওয়াট} \times ১ \text{ সেকেন্ড} \\ &= ৩৬০০ \text{ জুল} \end{aligned}$$

বিদ্যুৎ শক্তির বাণিজ্যিক একক হল কিলোওয়াট-ঘণ্টা। এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র এক ঘণ্টা কাজ করলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বলে। সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলো এই একক ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন করে। এ একককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট বা সংক্ষেপে শুধু ইউনিটও বলে। অর্থাৎ এক কিলোওয়াট ঘণ্টাকে এক ইউনিট হিসেবে ধরা হয়। আমাদের বাড়িতে, স্কুলে, দোকানপাটে, কলকারখানায় যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় তা পরিমাপের জন্য মিটার বসানো থাকে। এ মিটারের পাঠ থেকে কত ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয়েছে তা সরাসরি জানা যায়।

একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব এর ক্ষমতা ১০০ ওয়াট। এর অর্থ বাল্বটি জ্বালালে সেটি প্রতি সেকেন্ডে ১০০ জুল বৈদ্যুতিক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অতএব, এ বাল্বটি যদি ১০ ঘণ্টা জ্বলে তবে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে, $১০০ \times ৬০ \times ৬০ \times ১০ = ৩৬০০০০০ \text{ জুল} = ১০০০ \text{ ওয়াট-ঘণ্টা} = ১ \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা} = ১ \text{ ইউনিট}$ । অর্থাৎ, ১০০ ওয়াটের একটি বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বালালে ১ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে।

অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ ও পর্যাবৃত্ত প্রবাহ

বিদ্যুৎ প্রবাহ দুই প্রকার (১) অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা সমপ্রবাহ (Direct Current বা D.C)

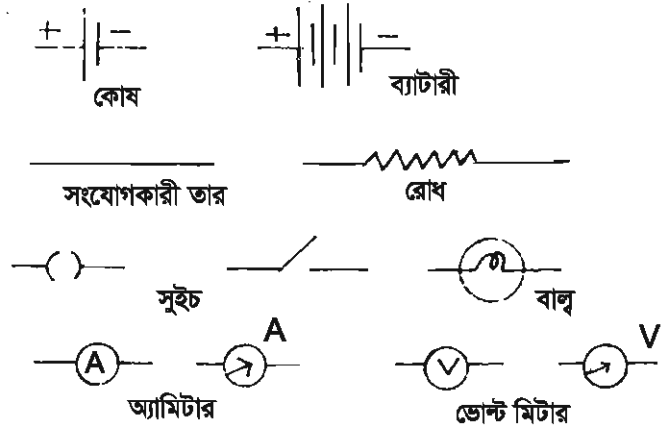
(২) পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating Current বা A.C)

(১) **অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ** : যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ সময়ের সাথে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন হয় না, সেই প্রবাহকে অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। বিদ্যুৎ কোষ বা ব্যাটারী থেকে যে প্রবাহ আমরা পাই তা অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ। ব্যাটারী ব্যবহৃত হয় টর্চলাইট, ট্রানজিস্টার রেডিও, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি ইত্যাদিতে। ডিসি জেনারেটরের সাহায্যেও অপর্যাবৃত্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। আগের দিনে এভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বাড়িঘর, কলকারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। কিন্তু বর্তমানে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

(২) **পর্যাবৃত্ত প্রবাহ** : যে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তিত হয় তাকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাবৃত্ত প্রবাহ। এর কারণ অপর্যাবৃত্ত প্রবাহের চেয়ে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন ও সরবরাহ করা সহজ এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। পর্যাবৃত্ত প্রবাহের উৎস হচ্ছে ডায়নামো বা জেনারেটর। দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র জেনারেটরের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। বাতি জ্বালানো, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি যাবতীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালাতে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। কলকারখানায় যন্ত্রপাতিও এ বিদ্যুতে চলে। আমাদের বাড়িতে, দোকানপাটে, অফিস আদালতে, কলকারখানায় পর্যাবৃত্ত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার দিক পরিবর্তন করে।

বিদ্যুৎ বর্তনী : সিরিজ বর্তনী ও সমান্তরাল বর্তনী

বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য সম্পূর্ণ পথকে বিদ্যুৎ বর্তনী বলে। বিদ্যুৎ বর্তনীতে বৈদ্যুতিক বাল্ব পাখা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যুক্ত থাকে। একটি চাবি বা সুইচের সাহায্যে বর্তনী বন্ধ করা বা খোলা যায়। বর্তনী বন্ধ থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে, খোলা থাকলে প্রবাহিত হবে না। বৈদ্যুতিক বর্তনীর চিত্র আকার সুবিধার্থে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ১৩.৩ চিত্রে কয়েকটি প্রতীক দেখানো হল।

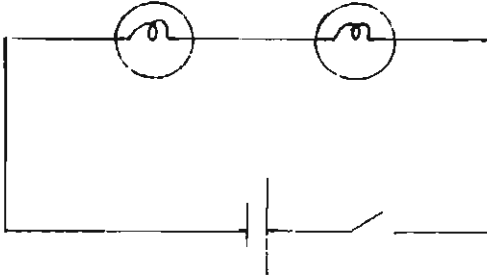


চিত্র ১৩.৩ : বিদ্যুৎ বর্তনী

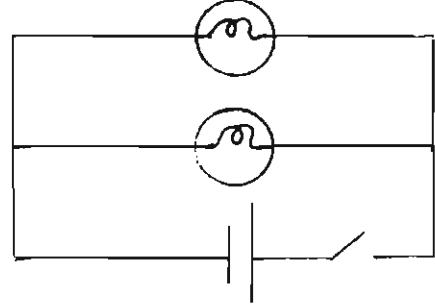
বিদ্যুৎ বর্তনীতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ সাধারণত দুইভাবে সংযুক্ত করা হয়। দুইটি বাল্বকে চিত্র ১৩.৪(ক) তে একভাবে আর চিত্র ১৩.৪(খ) তে আরেকভাবে সংযুক্ত করা দেখানো হয়েছে। প্রথমটিতে বাল্ব দুইটিকে একটির পর একটি সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ কোষের মধ্য দিয়ে বর্তনী পূর্ণ করা হয়েছে। এ বর্তনীকে সিরিজ বর্তনী বলে। দ্বিতীয়টিতে বাল্ব দুইটির এক প্রান্ত এক সাথে এবং অপর প্রান্ত আরেক সাথে যুক্ত করে বর্তনী সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এ বর্তনীকে সমান্তরাল বর্তনী বলে।

সিরিজ সংযোগে একই বিদ্যুৎ প্রবাহ দুইটি বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বাল্ব বিদ্যুৎ প্রবাহে যতটুকু বাধা দেয়, দুইটি বাল্ব তার চেয়ে বেশি বাধা দেয়। তাই একটি বাল্ব যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো, দুইটি বাল্ব সিরিজ সংযোজনের ফলে তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। আবার কোনো একটি বাল্ব যদি ফিউজ হয়ে যায় তবে সমস্ত বর্তনীর মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অপর বাল্বটি জ্বলবে না। সুইচ অন করলে একই সাথে দুইটি বাল্ব জ্বলে ওঠে, সুইচ

অফ করলে একই সাথে দুইটি বাল্ব নিভে যায়। বাল্ব দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে জ্বালানো বা নেভানো যায় না। তাই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সিরিজ বর্তনী উপযোগী নয় এবং তা ব্যবহার করা হয় না।



(ক) সিরিজ বর্তনী



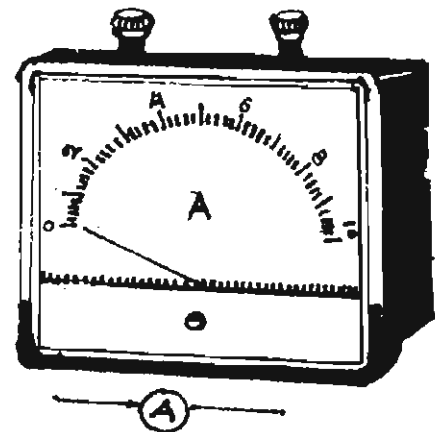
(খ) সমান্তরাল বর্তনী

চিত্র ১৩.৪ : বিদ্যুৎ বর্তনী

সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটি বাল্বের মধ্যে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। তাই একটি বাল্ব ফিউজ হলেও অন্যটি জ্বলবে। প্রতিটি বাল্বই পৃথক পৃথকভাবে জ্বালানো বা নেভানো যাবে। প্রতিটি বাল্ব এর প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য একই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাল্বই বিদ্যুৎ কোষের পূর্ণ বিদ্যুৎ চালক শক্তি পাবে। ফলে দুইটি বাল্বই উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। বাল্ব দুইটি যদি এক এক করে বিদ্যুৎ কোষের সাথে সংযুক্ত করা হত তখন যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো, বাল্ব দুইটি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করলেও একই উজ্জ্বলতা থাকবে। তবে একটির মধ্যে দিয়ে যতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে, দুইটির মধ্য দিয়ে তার দ্বিগুণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। একই বিদ্যুৎ কোষ এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বলে বিদ্যুৎ কোষের আয়ু হয়ে যাবে অর্ধেক। আর জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকলে একটি বাল্ব- এর জন্য যতটুকু বিদ্যুৎ খরচ হবে, দুইটি বাল্ব এর জন্য খরচ হবে তার দ্বিগুণ। গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য সমান্তরাল বর্তনীই সুবিধাজনক।

অ্যামিটার

বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যামিটার বলে (চিত্র ১৩.৫)। এর পুরো নাম অ্যাম্পিয়ার মিটার। এ যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পাওয়া যায়। অ্যামিটার বিদ্যুৎ বর্তনীতে সিরিজ সংযোগে সংযুক্ত করতে হয়। বিদ্যুৎ কোষের মত অ্যামিটারেও দুইটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। ধনাত্মক সংযোগ প্রান্ত লাল রঙের, ঋণাত্মক সংযোগ প্রান্ত কালো রঙের। কোষের ধনাত্মক প্রান্ত অ্যামিটারের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তা না হলে অ্যামিটারের কাটা সামনের দিকে না যেয়ে বিপরীত দিকে যাবে। বর্তনীতে সিরিজে সংযুক্ত অ্যামিটারের রোধ বর্তনীর প্রবাহ যেন পরিবর্তন না করতে পারে এ জন্য এর ভেতরে যে তার কুড়লী থাকে তার রোধের মান কমিয়ে দেয়ার জন্য একটি স্বল্প মানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত করা হয়। এতে অ্যামিটার রোধ বেশ কমে যায় এবং বর্তনীর প্রবাহের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

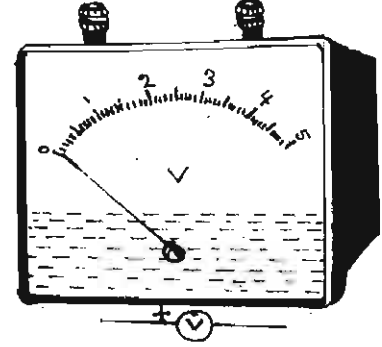


চিত্র ১৩.৫ : অ্যামিটার

ভোল্টমিটার

বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য পরিমাপ করার জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহার (চিত্র ১৩.৬) করা হয়। ভোল্টমিটার দিয়ে বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পাওয়া যায়। যে দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য পরিমাপ

করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করতে হবে। ভোল্টমিটারেও একটি লাল রঙের ধনাত্মক সংযোগ প্রান্ত এবং একটি কালো রঙের ঋনাত্মক সংযোগ প্রান্ত থাকে। উচ্চ বিভবের বিন্দুতে লাল প্রান্ত এবং নিম্ন বিভবের বিন্দুতে কালো প্রান্ত সংযুক্ত থাকে। বর্তনীর মূল প্রবাহ সংযুক্ত ভোল্ট মিটারের মধ্য দিয়ে চলে যেন এর পরিবর্তন না ঘটাতে পারে, এজন্য একটি উচ্চমানের রোধ এর কুণ্ডলির সাথে সিরিজে যুক্ত থাকে। এতে মূল প্রবাহের নগণ্য অংশ ভোল্টমিটারের মধ্য দিয়ে যায় ফলে প্রবাহের কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় না।



চিত্র ১৩.৬ : ভোল্টমিটার

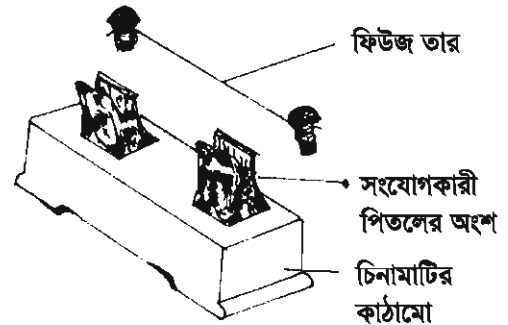
বৈদ্যুতিক সুইচ

টর্চবাতি বা বাড়ির বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে বা নেভাতে হলে সুইচ টিপতে

হয়। সুইচ টিপলে কী হয়? সুইচ টিপলে বিদ্যুৎ বর্তনীতে সংযোগ স্থাপন হয় অথবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ সুইচ হচ্ছে বিদ্যুৎ বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন বা বিচ্ছিন্ন করার একটি কৌশল। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদি যে কোনো যন্ত্রের সাথে একটি করে সুইচ পৃথক পৃথকভাবে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। বাতির সুইচ অন করলে বাতি জ্বলে, টিভির সুইচ অন করলে টিভি চলে। আবার যখন যেটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন সেটি অফ করে দেয়া যায়। এভাবে প্রয়োজনমত বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। তুমিও বিনা প্রয়োজনে বাতি পাখা বা টিভি অন করে রাখবে না।

ফিউজ

আমরা বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি যে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, তা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির বিদ্যুৎ বর্তনীতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে অনেক সময় তার থেকে বাড়িতে আগুন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এ ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ফিউজ তার (চিত্র ১৩.৭) ব্যবহার করা হয়। ফিউজ তার হচ্ছে টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং গলনাঙ্ক কম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি অভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত হয়ে গলে যায়। ফলে বিদ্যুৎবর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিউজ সিরিজে সংযোগ করতে হয়।



চিত্র ১৩.৭ : ফিউজ তার

ফিউজ বিভিন্ন মানের হয়। সাধারণত আমরা ৫ অ্যাম্পিয়ার, ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৩০ অ্যাম্পিয়ার এবং ৬০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করে থাকি। ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ মানে এর মধ্য দিয়ে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যাবে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদির জন্য ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ এবং ইলেকট্রিক কেটলি বা ইস্ত্রির জন্য ১৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়ির মেইন ফিউজ হয় ৩০ বা ৬০ অ্যাম্পিয়ারের।

টেলিভিশনের সাথে ৩০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগালে কী হবে? টেলিভিশন ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পুড়ে যায়। তাই এ ফিউজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেকট্রিক কেটলির সাথে ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ লাগালে কী হবে? সুইচ অন করলেই ফিউজটি গলে যাবে। কারণ ইলেকট্রিক কেটলিতে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ দিবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে যেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। বাড়িতে ফিউজ পুড়ে গেলে আবার তার লাগাবার সময় অনেক সময় দুই তিনটি তার একত্র করে লাগান হয়। এ রকম কখনো করা উচিত নয়। কারণ, এতে ফিউজের মান বেড়ে যায়। দুইটি ৫ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ তার একত্র করলে ১০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ হয়ে যাবে।

সার্কিট ব্রেকার

সার্কিট ব্রেকার এক ধরনের ফিউজ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তনী ভেঙে দেয় আবার জোড়া লাগায়। বর্তনীতে কোনো কারণে হঠাৎ প্রবাহ বেড়ে গেলে সার্কিট ব্রেকার অফ হয়ে যায়। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ স্বাভাবিক হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন হয়ে যায়। এভাবে সার্কিট ব্রেকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

আর্থ তার

বৈদ্যুতিক ইন্সুলি বা কেটলির আবরণ স্টীলের তৈরি। এগুলোর ভিতরে থাকে তারের কুড়লী যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তারকে ঢেকে রাখা হয় বলে তারের বিদ্যুৎ আবরণকে স্পর্শ করতে পারে না। কোনো ত্রুটির কারণে যদি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার আবরণকে স্পর্শ করে তবে আবরণটিও বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। সে অবস্থায় আবরণটি কেউ স্পর্শ করলে সে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক পাবে। এ জন্য এ ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সংযোগের জন্য তিনটি তার থাকে। দুইটি বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য থাকে আর একটি আর্থ তার অর্থাৎ মাটির সঙ্গে সংযোগের জন্য। এ আর্থ তারটি যন্ত্রের আবরণের সাথে লাগানো থাকে। তাই আবরণটি বিদ্যুতায়িত হলে সেই বিদ্যুৎ এ তারের মধ্যে সরাসরি মাটিতে চলে যায়। এ তারের ভিতর দিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে ফিউজ তার পুড়ে বিদ্যুৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে যন্ত্রটিও রক্ষা পায়, বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়।

বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়ার সময় একটি মোটা লোহা বা তামার দণ্ড মাটিতে পুঁতে তার সাথে মোটা তামার তার দিয়ে আর্থ সংযোগ করা হয়। তিন পিনের বৈদ্যুতিক সকেটের আর্থ পিনের সাথে এ তারের সংযোগ থাকে।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ফলে প্রধানত দুই ধরনের ক্ষতি হতে পারে :

- (১) বৈদ্যুতিক শক লাগা,
- (২) ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যাওয়া।

মানুষের দেহ বিদ্যুৎ পরিবাহী। তবে সাধারণ অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় ৫০,০০০ ওহম বলে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ তেমন ক্ষতি করে না। কিন্তু অত্যধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের মধ্য দিয়ে চললে প্রচুর শক লাগে যাকে বৈদ্যুতিক শক বলে। বৈদ্যুতিক শকে দেহের কোষ নষ্ট হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা এবং স্থিতিকাল যত বেশি হয়, মৃত্যুর সম্ভাবনা তত বাড়ে।

বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার উত্তপ্ত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা কোনো কারণে অত্যন্ত বেড়ে গেলে তার এত বেশি উত্তপ্ত হয় যে তা থেকে ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা যে সব কারণে ঘটতে পারে তা হল —

- ১। শর্ট সার্কিট
- ২। ওভারলোড

শর্ট সার্কিট : তোমার স্কুলে যাবার রাস্তা যদি মাঠ ঘুরে যায় তখন শর্ট কাট করে অনেক সময় তুমি রাস্তা দিয়ে না

গিয়ে মাঠের মধ্য দিয়েই চলে আস। অর্থাৎ পথ সংক্ষেপ বা ছোট কর। সে রকম বৈদ্যুতিক বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে পথ ঘুরে যাওয়ার কথা সে পথের পরিবর্তন করে কোনো কারণে সংক্ষিপ্ত পথে বিদ্যুৎ প্রবাহ যাওয়াকে শর্ট সার্কিট বলে। যেমন তোমরা দেখেছ দুইটি রবার বা প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া তার দিয়ে বাড়িতে সব বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়। এ তার দিয়ে বিদ্যুৎ বাল্বে যায় তারপর বাল্বের মধ্য দিয়ে অপর তার দিয়ে ফিরে আসে। বাল্বের মধ্যে যে সবু তার আছে তার বাধার কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা কম থাকে। এখন যদি কোনো কারণে বাল্ব পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তার দুইটি একে অপরটির সাথে লেগে যায় তখনই শর্ট সার্কিট হয়। তারের মধ্য দিয়ে তখন প্রবল বেগে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কারণ বাধা দেয়ার জন্য মাঝে কিছু থাকে না।

ওভার লোড : ওভার লোড হল বর্তনীতে যতটুকু পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া নিরাপদ, তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া।

শর্ট সার্কিট বা ওভার লোড হতে পারে

১। নিম্নমানের বৈদ্যুতিক তার বা সরঞ্জাম ব্যবহার করলে

২। ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগের ফলে।

বৈদ্যুতিক সংযোগ তারের উপর প্লাস্টিক বা রবারের আবরণ থাকে এ কারণে যে, রবার এবং প্লাস্টিক অন্তরক পদার্থ। এ আবরণ যদি নিম্নমানের হয় তবে তা গলে গিয়ে অন্তরক নষ্ট হয়ে যায়। তাই তার দুইটি একে অপরকে স্পর্শ করলেই শর্ট সার্কিট হয়। অনেক সময় একই বর্তনীতে অনেকগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সংযোগ করা হয়। এতে বর্তনী ওভারলোডেড হয়। কখনো একই সকেটে এক সাথে বাতি, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি লাগাবে না। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সকেট ব্যবহার করবে।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে

১। ঠিক মানের ফিউজ তার ব্যবহার করতে হবে।

২। যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে আর্থ সংযোগ করতে হবে।

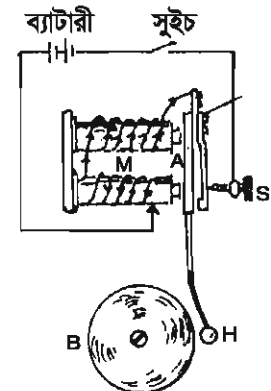
৩। উন্নতমানের বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করতে হবে।

৪। মাঝে মাঝেই তার পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে অন্তরক নষ্ট হয়ে গেছে কিনা।

বিদ্যুতের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অসংখ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক ইন্সট্রি, হিটার এবং বাল্ব এর প্রস্তুত ও কার্যপ্রণালি তোমরা সন্তম শ্রেণীতেই পড়েছ। এখানে আরো একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা : বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বিদ্যুৎ চুম্বকের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ। এতে একটি অশৃঙ্খরাকৃতি বিদ্যুৎ চুম্বক একটি কাঠের বা লোহার পাটাতনের উপর বসানো থাকে (চিত্র ১৩.৮)। একটি নরম লোহার পাতের সাথে একটি হাতুড়ি লাগানো থাকে। পাতটি বৈদ্যুতিক চুম্বকের মেবুধয়ের M এর সামনে বসানো থাকে এবং এর সাথে একটি স্প্রিং যুক্ত থাকে। স্প্রিং এর আবদ্ধ প্রান্ত বিদ্যুৎ চুম্বক যে অন্তরিত তামার তার দিয়ে জড়ানো থাকে তার এক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে। যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ থাকে তখন স্প্রিং এর অন্য প্রান্ত স্কু S কে স্পর্শ করে থাকে। এ স্কু S একটি সুইচ ও ব্যাটারীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুম্বক জড়ানো



চিত্র ১৩.৮ : বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

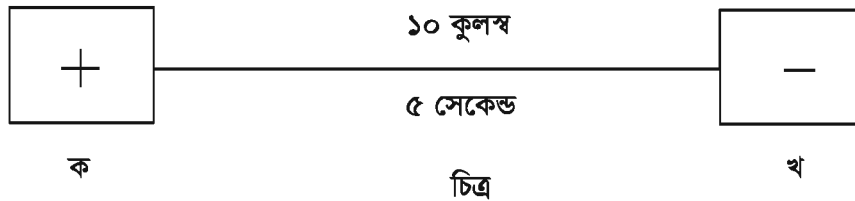
তারের সাথে যুক্ত। হাতুড়ির সামনে একটা ঘণ্টা B বসানো থাকে।

সুইচ টিপলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং বিদ্যুৎ চুম্বক জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়। ফলে বৈদ্যুতিক চুম্বকটি চুম্বকত্ব লাভ করে। সেটি তখন নরম লোহার পাত A কে আকর্ষণ করে। পাতটি চুম্বকের দিকে সরে আসায় ওর সঙ্গে যুক্ত হাতুড়ি ঘণ্টা B কে আঘাত করে। ফলে ঘণ্টাটি শব্দ করে বেজে উঠে। কিন্তু স্প্রিংটি S স্কু থেকে সরে আসায় বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুম্বকটি চুম্বকত্ব হারায়। তখন A আবার তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেয়ে স্কু S কে স্পর্শ করে। ফলে আবার বর্তনী সম্পূর্ণ হয় ও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এতে চুম্বকটি পুনরায় চুম্বকত্ব পায় এবং হাতুড়িকে আকর্ষণ করে ঘণ্টা বাজায়। এভাবে যতক্ষণ সুইচ টিপে রাখা হয় ততক্ষণ বারবার হাতুড়ী ঘণ্টায় আঘাত করতে থাকে এবং ঘণ্টা বাজতে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- বিদ্যুৎ শক্তির বাণিজ্যিক একক কী?
ক. ওয়াট
গ. ওয়াট-ঘণ্টা
খ. জুল
ঘ. কিলোওয়াট-ঘণ্টা
- কুলম্ব কোন রাশির একক?
ক. রোধ
গ. বিদ্যুৎ প্রবাহ
খ. বিভব পার্থক্য
ঘ. চার্জ
- এক মেগা ও'ম- এর সমান?
ক. 10^3
গ. 10^6
খ. 10^{-3}
ঘ. 10^{-6}
- অ্যাম্পিয়ার, ভোল্ট এবং ওয়াটের মধ্যে সম্পর্ক কী?
ক. অ্যাম্পিয়ার = ভোল্ট \times ওয়াট
গ. ওয়াট = ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার
খ. ভোল্ট = ওয়াট \times অ্যাম্পিয়ার
ঘ. ওয়াট = ভোল্ট \times অ্যাম্পিয়ার
- অ্যামিটার দিয়ে কী পরিমাপ করা হয়?
ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ
গ. রোধ
খ. বিভব পার্থক্য
ঘ. বৈদ্যুতিক চার্জ



চিত্র থেকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

- উপরের চিত্রের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ঘটে?
ক. প্রোটন 'ক' থেকে 'খ' এ যায়
গ. ইলেকট্রন 'ক' থেকে 'খ' এ যায়
খ. প্রোটন 'খ' থেকে 'ক' এ যায়
ঘ. ইলেকট্রন 'খ' থেকে 'ক' এ যায়

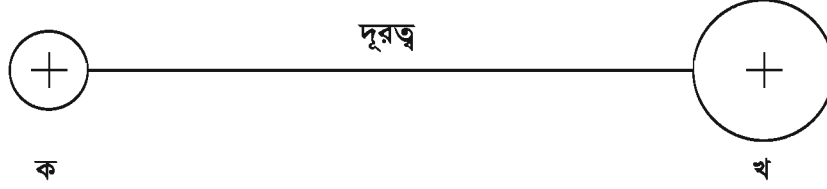
৭. চিত্রের বর্তনীতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়?

ক. $\frac{1}{2}$ অ্যাম্পিয়ার

খ. ২ অ্যাম্পিয়ার

গ. ২.৫ অ্যাম্পিয়ার

ঘ. ৫০ বৈদ্যুতিক চার্জ



৮. চিত্রে দুইটি চার্জের বিকর্ষণ বল নির্ভর করে-

i. চার্জের পরিমাণের ওপর

ii. চার্জ দুইটির মধ্যকার দূরত্বের ওপর

iii. চার্জ যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির ওপর।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

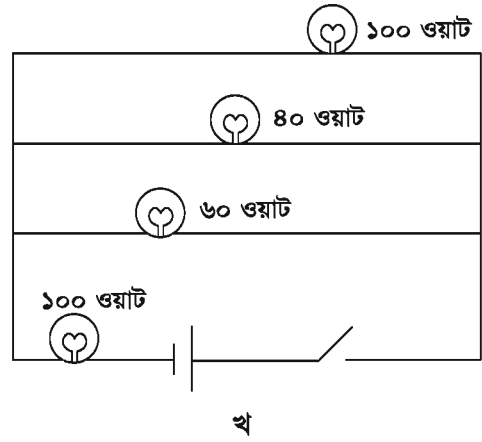
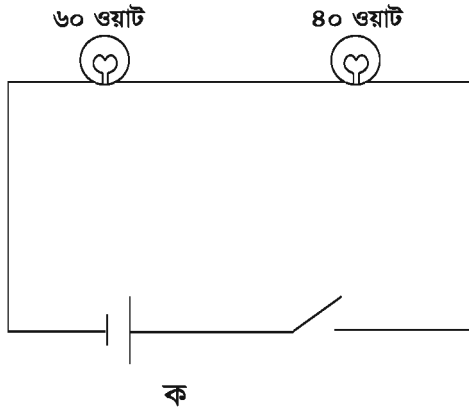
খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



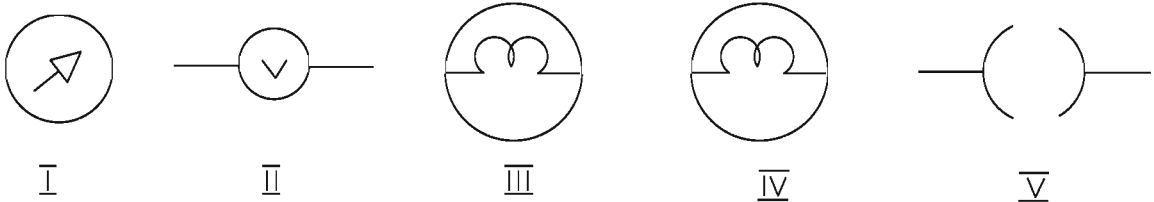
ক. বিদ্যুৎ বর্তনী কি?

খ. 'ক' বর্তনীর মধ্যে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে ব্যাখ্যা কর।

গ. খ নং চিত্রের জন্য প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে বাতি জ্বালালে ও ফ্যান ঘুরালে ৩০ দিনে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

ঘ. গৃহে বিদ্যুতায়নে ক ও খ বর্তনীর কোনটি সুবিধাজনক উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২.

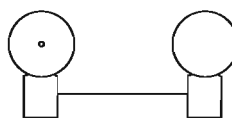




VI



VII



VIII

উপরের প্রতীকগুলো পর্যবেক্ষণ কর।

- ক. প্রতীক (VII) এর নাম লিখ।
- খ. প্রতীক (VIII) এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- গ. চিত্রের প্রতীকগুলো ব্যবহার করে একটি বর্তনী অংকন কর।
- ঘ. বর্তনীতে প্রতীক (i) এবং (ii) কীভাবে সংযোগ করা হয় তার কারণসহ এদের কাজ ব্যাখ্যা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এখন হয়তো আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে অথবা অস্টেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা। তুমি ইচ্ছে করলেই রেডিওতে শুনতে পাবে তার সরাসরি ধারাবিবরণী। অথবা দেখতে পারবে টেলিভিশনের পর্দায় জীবন্ত সে খেলা। এ শুধু সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে।

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগ। যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত উন্নত সে দেশ তত বেশি সমৃদ্ধশালী। জীবনযাত্রার মান তত উন্নত। বিদ্যুতের আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। এখন সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে। এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, ভিসিআর, কম্পিউটার, টেলেক্স, ফ্যাক্স ইত্যাদি বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ সব ব্যবহারে আমাদের কাজ করা হয়েছে সহজ। মানুষের জীবনের যে মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা তা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

আগের দিনে মানুষ ফসল বোনার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো কখন বৃষ্টি হবে। এখন পাম্পের সাহায্যে মাটির নিচ থেকে পানি তুলে জমিতে সেচ দিয়ে সময়মত ফসল বোনা হচ্ছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করে, বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার করে, ফসল উৎপাদন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। পানি সেচ এবং সার ব্যবহার করে অনুর্বর পতিত জমিতে এমনকি মরুভূমিতেও ফসল ফলানো হচ্ছে। নানা রকম কীটনাশকও আবিষ্কার হয়েছে যা দিয়ে ইঁদুর এবং পোকাকার হাত থেকে শস্য রক্ষা পাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালন করে এ সবের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই আমরা এখন আলু টমেটো সারা বছরই খেতে পাই। এভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন রকম কৃত্রিম সুতা, যেমন- নাইলন, রেয়ন, টেট্রন ইত্যাদি। সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী আবিষ্কার হওয়াতে মজবুত দালান কোঠা বানান সম্ভব হচ্ছে। বাড়ি বৃষ্টি আগুনের ক্ষতি থেকে এ সব দালান কোঠা মানুষকে রক্ষা করছে। আবার বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি করে জমি বাঁচানো হচ্ছে।

বলা হয় স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, স্বাস্থ্যই সম্পদ। এ স্বাস্থ্য রক্ষার, অকাল মৃত্যু রোধে, নীরোগ দেহ এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভে বিজ্ঞানের অবদান অভূতপূর্ব। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রেগের মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি এখন পৃথিবী থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। তোমার বাবা দাদাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে তারা যখন ছোট ছিলেন তখন এ সব রোগের মহামারীতে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাত। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা এখন আর কোনো সমস্যাই নয়। অথচ কিছুদিন আগেও এ সব রোগে আক্রান্ত হলে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। টিকা আবিষ্কারের ফলে হাম, বসন্ত, হুপিং কাশি, পোলিও, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকারের মত রোগ প্রতিরোধ করাও সম্ভব হয়েছে। আবার রোগ যথাসময়ে নির্ণয় করে সুচিকিৎসার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র। যেমন- এক্সরে, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মেশিন, আলট্রাসোনোগ্রাম, এনডোস্কোপ, স্ক্যানার ইত্যাদি। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একজনের হৃৎপিণ্ড বা কিডনী অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করে নতুন জীবন দান করা সম্ভব হচ্ছে। চোখে কর্নিয়া সংযোজনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে চোখের দৃষ্টি।

যানবাহন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজে চড়ে আমরা দ্রুত এবং আরামে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি। আগে যে দেশে যেতে লাগতো কয়েক মাস, সে দেশে এখন কয়েক ঘণ্টাতেই পৌঁছানো যায়। আগে পাশের বাড়িতে একটি খবর পৌঁছাতে নিজেকে যেতে হত। এখন টেলিফোনে শুধু পাশের বাড়িতে কেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথাবার্তা বলা যায়, খবরাখবর আদান প্রদান করা যায়, টেলিফোন ছাড়াও রয়েছে টেলেক্স, ফ্যাক্স, যার সাহায্যে চিঠিপত্রও আদান প্রদান করা যায়।

বিজ্ঞানের অবদান রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার, টেপ রেকর্ডার, সিনেমা আমাদের শুধু যে আনন্দ দান করে তাই নয় এগুলোর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শুনতে এবং দেখতে শিখতে পারি। দূরশিক্ষণে রেডিও ও টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়।

মোট কথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এখনো বিজ্ঞানের সব সুবিধা সবাই ভোগ করতে পারি না। এর অন্যতম কারণ, ঠিক বিজ্ঞান চর্চার অভাব। আমরা যদি জাতি হিসেবে উন্নতি সাধন করতে চাই, তবে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্র সম্পর্কে কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হল।

রেডিও

রেডিও তোমরা সবাই দেখেছ এবং হয়তো ব্যবহার করেছ। ব্যাটারীচালিত বহনযোগ্য ছোট রেডিওকে অনেক সময় ট্রানজিস্টর বলা হয়। কিন্তু ট্রানজিস্টর রেডিও নয় রেডিও তৈরির একটি উপাদান মাত্র। কিন্তু ট্রানজিস্টর আবিষ্কার ছোট আকারের বহনযোগ্য রেডিও প্রস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে বলে এর গুরুত্ব খুবই বেশি। ট্রানজিস্টর নামটির প্রচারের জন্যই এ রকম হয়েছে। সেলাই মেশিনকে যেমন আমরা অনেক সময় সিজার মেশিন বলি। সিজার কোনো মেশিন নয়, কোম্পানীর নাম।

আবার রেডিও বলতে আমরা মনে করি একটি সংবাদ বা সংগীত শোনার যন্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় রয়েছে একটি শব্দ প্রেরক এবং একটি গ্রাহক যন্ত্র। এ শব্দ হতে পারে সংবাদ পড়ার, সংগীতের অথবা কোনো কথাবার্তার। আমাদের বাড়িতে যে রেডিওটি আমরা ব্যবহার করি সেটি হল গ্রাহক যন্ত্র। রেডিও স্টেশনে থাকে প্রেরকযন্ত্র। রেডিও প্রেরক যন্ত্র এবং গ্রাহকযন্ত্র বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে। তোমরা অনেক সময় ওয়াকিটকি দিয়ে কথা বলতে শুনে থাকবে বিশেষ করে রাস্তার পুলিশদের। এগুলো একাধারে রেডিও প্রেরক এবং গ্রাহকযন্ত্র। তবে এগুলো দিয়ে খুব বেশিদূর পর্যন্ত যোগাযোগ করা যায় না। জাহাজে থাকে রেডিও প্রেরক এবং গ্রাহকযন্ত্র যার সাহায্যে সব সময় অন্য জাহাজ বা স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। শখ করে অনেকে বাড়িতেও প্রেরকযন্ত্র রাখে যার সাহায্যে দূরের কারো সাথে কথা বলা যায়, বন্ধুত্ব পাতানো যায়।

রেডিও হচ্ছে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে এবং বিদ্যুৎ শক্তিকে পুনরায় শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। প্রেরক যন্ত্রের প্রথমই রয়েছে একটা মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোনের সামনে শব্দ করা হয়। মাইক্রোফোনের কাজ হল এ শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। এ বিদ্যুৎ শক্তিকে কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যে বিবর্ধিত করে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। প্রেরকযন্ত্রের শেষে রয়েছে একটি অ্যানটেনা। এ অ্যানটেনার সাহায্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যে প্রেরণ করা হয়। শূন্যে ছড়িয়ে পড়া এ তরঙ্গ সরাসরি অথবা বায়ুমণ্ডলের আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে গ্রাহক যন্ত্রের অ্যানটেনাতে পৌঁছায়। অ্যানটেনা তরঙ্গের বিদ্যুৎ শক্তিকে ধরে প্রেরণ করে গ্রাহক যন্ত্রের অন্যান্য অংশে। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তিকে বিবর্ধিত করা হয়। তারপর প্রেরণ করা হয় লাউডস্পীকারে। লাউডস্পীকার বিদ্যুৎ শক্তিকে আবার শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ লাউডস্পীকারের কাজ হল মাইক্রোফোনের কাজের বিপরীত। মাইক্রোফোন দিয়ে যে শব্দ প্রেরণ করা হয়, লাউডস্পীকার দিয়ে সেই শব্দ শোনা যায়।

টেলিভিশন

টেলিভিশনের সাহায্যে আমরা একই সঙ্গে শব্দ শুনি এবং ছবি দেখি। রেডিওর মতই টেলিভিশনেও একটি প্রেরক যন্ত্র আছে। প্রেরক যন্ত্রগুলো টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্রে থাকে। এ প্রেরক যন্ত্রের দুইটি অংশ, একটি শব্দ প্রেরণের জন্য, আরেকটি ছবি প্রেরণের জন্য। শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ, রেডিওতে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের পদ্ধতিতেই মোটামুটি হয়ে থাকে। ছবি ধারণ করা হয় টেলিভিশন ক্যামেরায়। ক্যামেরা পর্দায় ছবির যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে। অর্থাৎ এখানে আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ বিদ্যুৎশক্তিকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গোৎপাদিত করে প্রেরক যন্ত্রের অ্যান্টেনার সাহায্যে শূন্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ তরঙ্গ আমাদের বাড়ির টেলিভিশন বা গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনাতে ধরা পড়ে। অ্যান্টেনা থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে টেলিভিশনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার তা ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে টেলিভিশনের পর্দায় পড়ে। তখন আমরা সে ছবি দেখতে পাই। একই অ্যান্টেনাতে শব্দ থেকে রূপান্তরিত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গও ধরা পড়ে। সেই তরঙ্গ টেলিভিশনের আরেকটি অংশ দিয়ে এসে লাউডস্পীকারে শব্দ সৃষ্টি করে। এমন ব্যবস্থা থাকে যে শব্দ ও ছবি একই সাথে শোনা ও দেখা যায়।

সুতরাং টেলিভিশন হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে শব্দ শক্তি এবং আলোক শক্তিকে একই সাথে বিদ্যুৎ শক্তিতে এবং বিদ্যুৎশক্তিকে পুনরায় শব্দ শক্তি এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

টেলিভিশন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তা একটি টেপে সংরক্ষণ করা যায়। একে বলে ভিডিও রেকর্ডিং। টেপটিকে বলে ভিডিও ক্যাসেট। এ ক্যাসেট ভিসিপি আর ভিসিআর এর সাহায্যে টেলিভিশনে দেখা ও শোনা যায়। বিয়ের অনুষ্ঠান এভাবে ভিডিও রেকর্ড করে পরবর্তীতে হয়তো তোমরা দেখেছ। সিনেমা, নাটক থেকে শুরু করে যে কোনো ঘটনা রেকর্ড করে এভাবে পরে দেখা যায়। যেমন দেখানো হয়, টেলিভিশনের সংবাদে সারাদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার রেকর্ড করা অংশ।

টেলিভিশন একটি বিষয়কর আবিষ্কার

টেলিভিশনের সাহায্যে উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে ঘটা ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। আমরা অবশ্য বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই টেলিভিশন বেশি ব্যবহার করি। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে একজন শিক্ষক টেলিভিশনের মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করতে পারেন।

শিক্ষাদানের এ প্রয়োগ বাংলাদেশ টেলিভিশনে গণশিক্ষার অনুষ্ঠান হয়তো তোমরা দেখেছ। বিজ্ঞানের জটিল বিষয় টেলিভিশনের চিত্রের সাহায্যে সহজ করে বোঝানো যায়, দেশ বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতা টেলিভিশনে দেখে আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিধিও বাড়াতে পারি।

কম্পিউটার

কম্পিউটার বিজ্ঞানের আরেকটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার। সারা বিশ্বেই কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলছে। এর কারণ কম্পিউটারে কাজ করা সহজ করছে। দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে কাজ করায় কম্পিউটারের জুড়ি নেই। অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন কি ব্যক্তিগত কাজে বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ছোট বড় অনেক রকমের হতে পারে। শুধু দেখতে ছোট বা বড় নয়, কাজ করার ধারা, শক্তি ও গতির ওপর নির্ভর করে কম্পিউটারকে বৃহৎ, মাঝারি বা ক্ষুদ্র শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্র বা মাইক্রো কম্পিউটার। এ কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটারও (পিসি) বলে।

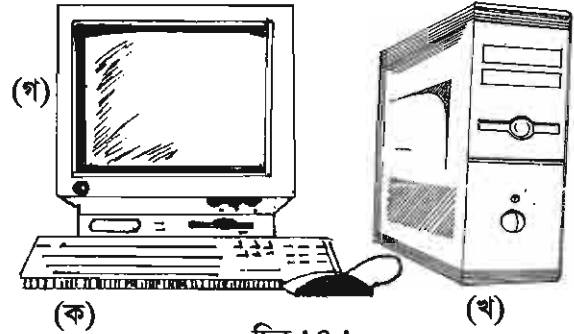
পিসি- এর প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে (ক) গ্রহণকারী অংশ (Input Unit), (খ) কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit), (গ) নির্গমনকারী অংশ (Output Unit)।

গ্রহণকারী অংশটি দেখতে একটি টাইপরাইটারের কী বোর্ডের মত (চিত্র ১৪.১ ক)। এ কী-বোর্ড দিয়েই কম্পিউটার পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ দেখতে একটি চ্যাপ্টা বাক্সের মত (চিত্র ১৪.১ খ)। এটা কম্পিউটারের মস্তিষ্ক। কী বোর্ডের নির্দেশমত এটা কাজ করে।

নির্গমনকারী অংশ ছোট পর্দার একটি টেলিভিশনের মত দেখতে (চিত্র ১৪.১ গ)। একে মনিটর বলে। কী-বোর্ডের যে নির্দেশ দেওয়া হয় সে মত লেখা ফুটে উঠে মনিটরে।

কম্পিউটারের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এর এতো ব্যাপক ব্যবহার তা হল, কম্পিউটারের তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার এবং অতি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা। যে সব কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় তা হল :



চিত্র ১৪.১

১। **টাইপের কাজ:** একে ওয়ার্ড প্রসেসিং বলে। দ্রুত ও নির্ভুলভাবে টাইপের কাজ করা যায় বলে এতে অফিস আদালতের দক্ষতা বাড়ে।

২। **তথ্য সংরক্ষণের কাজ :** যেমন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের তথ্য- কতজন কর্মচারী, কে কবে যোগদান করেছে, কার কত বেতন ইত্যাদি। বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোনের বিল সম্পর্কিত তথ্য, ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাবের তথ্য ইত্যাদি।

৩। **টিকিৎসা ক্ষেত্র :** রোগ নির্ণয় এবং ওষুধ নির্বাচনের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার হয়।

৪। শিল্প কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, চাহিদা, সরবরাহ যাচাই ও নিশ্চিত করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

৫। রেল ও বিমানের টিকিট বুকিং, রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, উড়োজাহাজের স্বয়ংক্রিয় ওঠানামা ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

৬। অস্ত্র দিয়ে শত্রুর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে সামরিক বাহিনীতে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সামরিক অস্ত্র নির্মাণের কাজেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

৭। বিজ্ঞানীরা গবেষণা কাজে ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করেন। তথ্য সংগ্রহ, বাছাই, বিশ্লেষণ এবং জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায় অতি অল্প সময়ে, পূর্বে যা করতে হয়ত সময় লাগতো বছরের পর বছর।

৮। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রকাশের কাজে আমাদের দেশে এখন কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করে নিজে নিজে শেখা যায়। তা ছাড়া এখন কম্পিউটারের সাহায্যে শুধু দেশের ভিতরই নয় দেশের বাইরেও অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদান করা যায়।

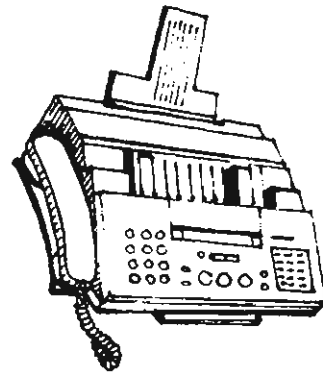
৯। মুদ্রণ শিল্পেও এখন ব্যাপকহারে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারে কম্পোজ, ডিজাইন ইত্যাদি করতে সময় যেমন লাগে কম, ব্যয়ও তেমন কম।

টেলেক্স এবং ফ্যাক্স

টেলেক্স ও ফ্যাক্স যোগাযোগের দুইটি অত্যাধুনিক মাধ্যম। টেলিফোনের যেমন নম্বর থাকে, টেলেক্স এবং ফ্যাক্সের তেমন নম্বর আছে। টেলেক্স যন্ত্রে একটি টাইপরাইটার আছে। যে তথ্য, সংবাদ বা চিঠি প্রেরণ করতে হবে তা এ টাইপরাইটারে

টাইপ করতে হয়। যে নম্বরে প্রেরণ করা হয় সেই নম্বরে টেলেক্সে তখন তা টাইপ হয়ে বেরিয়ে আসে।

ফ্যাক্স মেশিন একটি টেলিফোনের সাথে যুক্ত থাকে। যে তথ্য প্রেরণ করতে হবে তা একটি কাগজে টাইপ করে বা হাতে লিখে রাখতে হয়। যে নম্বরে ফ্যাক্স প্রেরণ করতে হবে সেই নম্বর ডায়াল করে কাগজটি মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অপরপ্রান্তে তার হুবহু নকল বেরিয়ে আসে। ফটোকপি মেশিনে যেমন যে কোনো লেখা বা ছবির কপি করা যায় ফ্যাক্স এর সাহায্যেও ছবি নকশা, ম্যাপ ইত্যাদি প্রেরণ করা যায়।



চিত্র ১৪.২ : ফ্যাক্স মেশিন

সৌর চুলা

সূর্য থেকে আমরা শক্তি পাই তাপ ও আলোক রূপে। সূর্য থেকে পাওয়া তাপশক্তি কাপড়-চোপড়, ধান-চাল, পাট ইত্যাদি শূকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ তাপ বিশেষ ব্যবস্থায় রান্নার কাজেও ব্যবহার করা যায়। এর জন্য এক ধরনের কড়াই আকারের চকচকে ধাতব চাকতি ব্যবহার করা হয়। এ চাকতির সাহায্যে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে এক জায়গায় ঘনীভূত করা হয়। ফলে সেই জায়গায় উষ্ণতা বেড়ে যায়। সেই তাপে তখন রান্না বান্না করা যায়। এ রকম কোনো ব্যবস্থাকেই সৌর চুলা বলে।

সৌর চুলার তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং মেঘলা দিনে বা রাতে তা ব্যবহার করা যায় না। তাই এ চুলা খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। তবে সূর্যের শক্তি নবায়নযোগ্য, এ শক্তি পেতে খরচ হয় না, পরিবেশ দূষিত করে না, এগুলোই সৌর চুলার বড় সুবিধা।

বায়োগ্যাস

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, গোবর খড়কুটো ও অন্যান্য পচনশীল আবর্জনা শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এভাবে রান্না করা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। এতে কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-পাতিল নোংরা হয়। এ থেকে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তাও বেশিরভাগ কাজে লাগে না। তাই রান্না করতে সময়ও লাগে প্রচুর।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন যে গোবর এবং অন্যান্য পচনশীল বস্তুকে যদি বায়ুশূন্য স্থানে পচানো যায় তবে এক ধরনের গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ গ্যাসকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অবশিষ্ট গ্যাস প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড।

শুধু গরু মহিষের গোবর থেকেই নয়, হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরিপানা বা জলজ উদ্ভিদ পচিয়ে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যায়।

যে সব কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয় তা হল :

- ১। রান্না করার কাজে
- ২। বাতি জ্বালাতে
- ৩। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে
- ৪। পাম্প চালাতে

এ ছাড়াও বায়োগ্যাস দিয়ে গাড়ি চালানো যায়, খাদ্যশস্য, ফলমূল সংরক্ষণ করা যায়। আবার বায়োগ্যাস উৎপন্ন হবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা জমিতে উন্নতমানের জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মাছ ও মুক্তার চাষেও তা ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাসের আরো সুবিধা হল, এ গ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত। এতে কাপড় চোপড় বা আসবাবপত্র নোংরা হয় না। তা ছাড়া মলমূত্র বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, রোগ জীবাণু ছড়ায় না। বায়োগ্যাস

শক্তির একটি অনবায়নযোগ্য উৎস। বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় বায়োগ্যাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে গরু-মহিষের যা সংখ্যা তাদের গোবর থেকে বছরে ১৫ লক্ষ টন কেরোসিনের সমান বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যায়। ৫/৬ জন লোকের পরিবারের রান্নাবান্নার এবং বাতি জ্বালাতে ৩/৪ টি গরুর গোবরই যথেষ্ট।

উন্নত চুলা

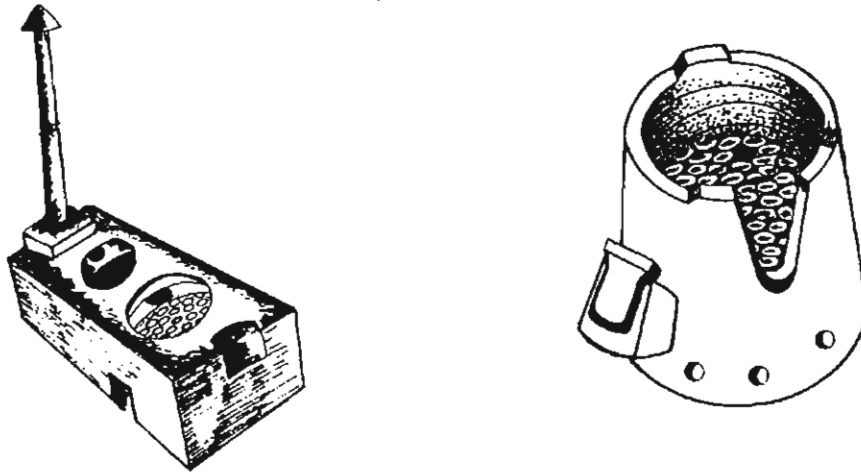
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে ধরনের চুলা ব্যবহার করা হয় তাতে দেখা গেছে যে, জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায়, তার শতকরা ৮৫-৯০ ভাগই অপচয় হয়। মাত্র শতকরা ১০-১৫ ভাগ কাজে লাগে। জ্বালানির এ বিরাট অপচয় রোধের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা উদ্ভাবন করেছে। সাধারণ চুলার তুলনায় এ উন্নত চুলার সুবিধা হল:

১। এতে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ জ্বালানি খরচ কম হয়।

২। ধোঁয়া কম হয় ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না।

৩। রান্না করতে সময় কম লাগে।

উন্নত চুলার (১) ঝিকগুলোর উচ্চতা কম, মাত্র আধা ইঞ্চি। এর ফলে বেশি তাপ ঝিকের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না (২) চুলার ভিতরে অল্প দূরত্বে একটি ছাঁকনি থাকে। এতে ছাঁকনির উপরে যে আগুন জ্বলে তা পুরোপুরি পাতিলের তলায় তাপ দেয়। (৩) চুলার ছাঁকনির নিচে বাতাস ঢোকানোর জন্য পথ আছে। বাতাস জ্বালানিকে ভালোভাবে পোড়াতে সাহায্য করে, ফলে চুলায় ছাই ব্যতীত কোনো ময়লা হয় না।



চিত্র ১৪.৩ : উন্নত চুলা

বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা আছে, যেমন- বহনযোগ্য, অবহনযোগ্য, ছাঁকনিসহ, ছাঁকনিবিহীন, অর্ধেক বা সম্পূর্ণ মাটির নিচে, একমুখী বা দ্বিমুখী চিমনিযুক্ত ইত্যাদি উন্নত চুলা। কোনোটি বাড়িতে রান্নাবান্নার উপযোগী, কোনোটি বা বেশি লোকের রান্না যেখানে হয় যেমন- হোটেল, ছাত্রাবাস সেখানের উপযোগী। কোনোটিতে শুধু লাকড়ি ব্যবহার করা যায়, কোনোটিতে আবার সব ধরনের জ্বালানি, যেমন- কাঠ, খড়কুটো, ঘুটে, কাঠের গুড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। উন্নত চুলা মাটি দিয়ে অতি সহজেই তৈরি করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

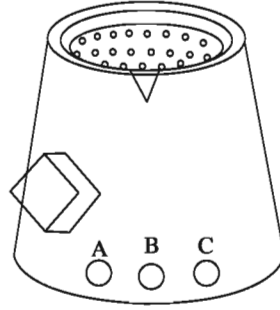
- টেলিভিশনে ছবি প্রেরণ করা হয় কীভাবে?

ক. শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে	খ. আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে
গ. বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করে	ঘ. আলোক তরঙ্গ রূপে
- শব্দকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যায়-

ক. রেডিও	খ. ফ্যাক্স
গ. টেলেক্স	ঘ. ইন্টারনেট
- বায়োগ্যাসের কোন উপাদান জ্বালানির কাজে লাগে?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড	খ. অক্সিজেন
গ. মিথেন	ঘ. নাইট্রোজেন

নিচের চিত্রের সাহায্যে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-



- চুলাটিতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

ক. তেল	খ. গ্যাস
গ. কাঠ	ঘ. সূর্যের আলো
- ছিদ্র A, B ও C চুলায়-
 - অক্সিজেন প্রদান করে
 - জ্বালানী পোড়াতে সাহায্য করে
 - বাতাস প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. 'A' চিহ্নিত অংশের নাম?
 খ. লাউড স্পিকার ও 'A' চিহ্নিত অংশের পার্থক্য কী?
 গ. দুইটি এন্টেনার মধ্যে মধ্যে কোনো সংযোগ দেখানো হয়নি কেন ব্যাখ্যা কর?
 ঘ. আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দ প্রেরণ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

২.



- ক. চিত্রের ব্যবস্থাটিকে কী বলা হয়?
 খ. পাত্রের তলায় তাপমাত্রা বেড়ে যায় কেন?
 গ. চাকতিটি চকচকে না হলে কী হত ব্যাখ্যা কর?
 ঘ. পরিবেশ বাস্ধব জ্বালানী হিসেবে এ ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান : ফল ও বীজ

ফল

আমরা জানি ফুল থেকে ফল হয়। আর ফল বলতে আম, কাঁঠাল, কলা, কমলা ইত্যাদি যা পাকলে রান্না ছাড়াও খাওয়া যায় তাকেই বুঝে থাকি। তা ছাড়া আমরা সবজি হিসেবে কুমড়া, বিজ্জা, পটল, টেঁড়স, বরবটি, লাউ, শিম ইত্যাদি খেয়ে থাকি, এগুলোও কিছু ফল। এ সব ফল, ফুলের স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয় রূপান্তরিত হয়ে গঠিত হয়। এ ডিম্বাশয়ের রূপান্তর হয় পরাগায়ন ও নিষেকের পর। পরাগায়ন ও নিষেকক্রিয়া না ঘটলে ফুলের গর্ভাশয় অপরিপুষ্ট অবস্থায় ঝরে পড়ে, পরিণামে ফল গঠিত হয় না। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল ফলের সংজ্ঞা সহজ ভাষায় দেওয়া খুব কঠিন। তবে ফলের সংজ্ঞা নিম্নরূপে দেওয়া যায়।

ফুলের গর্ভাশয় নিষিক্ত, পরিপুষ্ট ও পরিণত হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।

ফলের বিভিন্ন অংশ

একটি সাধারণ ফলের প্রধানত দুইটি অংশ থাকে। যেমন-

(১) ফলত্বক ও (২) বীজ

(১) **ফলত্বক** : ফলের বাইরের আবরণকে ফলত্বক বলে। একটি সরস ফল, যেমন- আম। আমের ত্বক সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত থাকে। যথা-

(ক) **বহিঃত্বক** : আমের বাইরের খোসা বা বহিঃত্বক পুরু হয়ে থাকে।

(খ) **মধ্যত্বক** : এটি ফলের রসালো অংশ। এ মধ্যত্বক খাওয়া হয়।

(গ) **অন্তঃত্বক** : এটি ফলত্বকের ভেতরের অংশ (আমের আঁটি)। এ আঁটি বীজকে ঢেকে রাখে।

(২) **বীজ** : ফলের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক বীজ থাকতে পারে। তবে আমের একটি মাত্র বীজ আঁটির মধ্যে লুকানো থাকে। আমের বীজ দ্বিবীজপত্রী।

ফলের প্রকারভেদ : উৎপত্তি, প্রকৃতি, উৎস, নিষিক্তকরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুসারে ফলের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে।

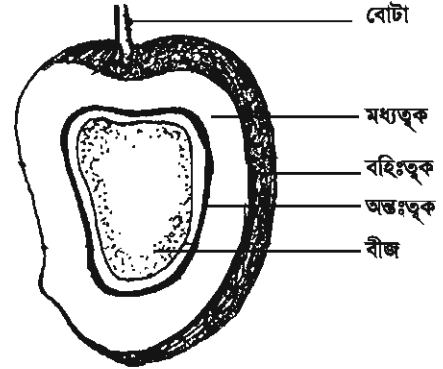
১। ফুলের কোন অংশ থেকে ফল সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে ফলকে প্রথমত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

(ক) **প্রকৃত ফল** : যে ফল শুধু ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয় তাকে প্রকৃত ফল বলে। যেমন- আম, জাম, কুল, মটর ইত্যাদি।

(খ) **অপ্রকৃত ফল** : ডিম্বাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ ফল গঠনে অংশ নিলে সেই ফলকে অপ্রকৃত ফল বলে। যেমন- চালতা, আপেল, ডুমুর ইত্যাদি। চালতার বৃতি এবং আপেলের পুষ্পাঙ্ক ফল গঠনে অংশ নেয়।

২। ফলের উৎস ও প্রকৃতি অনুসারে ফলকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

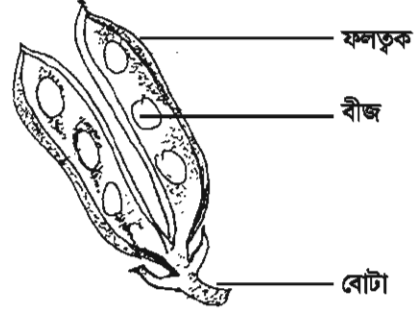
(ক) **সরল ফল** : যে ফল একটি ফুলের একটিমাত্র গর্ভপত্র বা একাধিক যুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্টি হয়



চিত্র ১৫.১ : ফলের বিভিন্ন অংশ

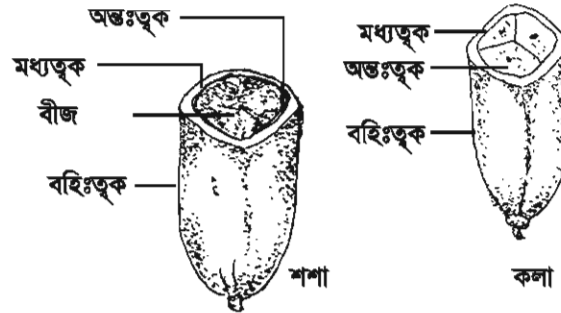
তাকে সরল ফল বলে। যেমন- আম, জাম, মটর ইত্যাদি। ফলত্বকের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সরল ফলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- নীরস বা শুষ্ক ফল এবং সরস বা রসালো ফল।

নীরস বা শুষ্ক ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং ফল পরিপক্ব হলে ত্বক শুকিয়ে ফেটে যায় তাকে নীরস বা শুষ্ক ফল বলে। যেমন- মটর, সরিষা, টেঁড়স ইত্যাদি।



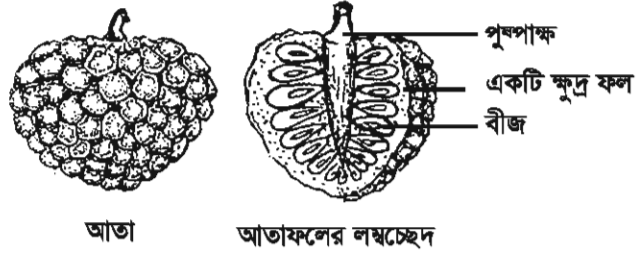
চিত্র ১৫.২ : নীরস বা শুষ্ক ফল (মটর)

সরস বা রসালো ফল : যে ফলের ফলত্বক পুরু এবং রসালো তাকে সরস ফল বলে। রসালো ফল পাকলে ফলত্বক সাধারণত ফেটে যায় না। যেমন- আম, কলা, আপেল, শসা ইত্যাদি।



চিত্র ১৫.৩ : রসালো ফল

(খ) গুচ্ছ ফল : যে সব ফল একটি ফুলের একাধিক মুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয় তাকে গুচ্ছ ফল বলে। এ ফুলের স্ত্রীসত্ত্বকে যত সংখ্যক গর্ভপত্র থাকে তত সংখ্যক ছোট ছোট ফল উৎপন্ন হয়। এখানে এক সাথে এক গুচ্ছ ফলের সৃষ্টি হয়। এ ছোট ফলের একটি গুচ্ছকে ইন্টারিও বলে। যেমন- আতা, পদ্ম ইত্যাদি।



চিত্র ১৫.৪ : গুচ্ছ ফল

(গ) যৌগিক ফল : যখন একটি পুষ্পমঞ্জরীর সব ফুলগুলো মিলে একটি ফলে পরিণত হয় তখন সে ফলকে যৌগিক ফল বলে। এ ফলে মঞ্জরীর ফুলগুলোর নরম বৃত্তাংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি ফলে পরিণত হয়। যৌগিক ফলের ভেতরে অসংখ্য বীজ থাকে। যেমন- আনারস, কাঁঠাল, ডুমুর ইত্যাদি।



চিত্র ১৫.৫ : যৌগিক ফল

(৩) সাধারণত নিম্নোক্তকরণের পর ফলের

উৎপত্তি হয়। আবার কখনও কখনও নিষিক্তকরণ ছাড়াই ফলের উৎপত্তি হতে পারে। নিষিক্তকরণ হয়েছে কি হয়নি এর ওপর নির্ভর করে ফলকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

স্বাভাবিক ফল : যে ফল নিষেক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় এবং যার বীজ সাধারণত পুষ্ট হয় তাকে স্বাভাবিক ফল বলে। যেমন- আম, কাঁঠাল।

পারমেনোকার্পিক ফল : যে ফল নিষেক ক্রিয়া ছাড়া উৎপন্ন হয় এবং যার বীজ পুষ্ট হয় না তাকে পারমেনোকার্পিক ফল বলে। যেমন- কলা।

ফলের প্রয়োজনীয়তা

১। ফল বীজকে সুরক্ষিত রাখে।

২। ফলের বীজ নতুন চারাগাছ তৈরির মাধ্যমে বংশ বিস্তার তথা উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে।

বীজ : অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ফুল ফোটে। ফুল থেকে ফল হয়। আর এ ফলের মধ্যে বীজ থাকে। তাহলে এখন প্রশ্ন হল বীজ কী? বীজ হল নিষিক্ত ডিম্বকের পরিণত রূপ। অর্থাৎ পরিণত, নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। যেমন- ছোলা বীজ, ডাল বীজ, শিম বীজ ইত্যাদি।

বীজের গঠন ও বীজের বিভিন্ন অংশের কাজ

প্রধানত দুইটি অংশ নিয়ে একটি বীজ গঠিত হয়। যেমন-

(ক) **বীজত্বক :** বীজের বাইরের আবরণকে বীজত্বক বলে। অধিকাংশই বীজের বীজত্বক দুইটি স্তরে বিভক্ত থাকে। যেমন-

১। **বহিঃত্বক :** বীজ ত্বকের বাইরের শক্ত ও পুরু স্তরের নাম বহিঃত্বক এবং

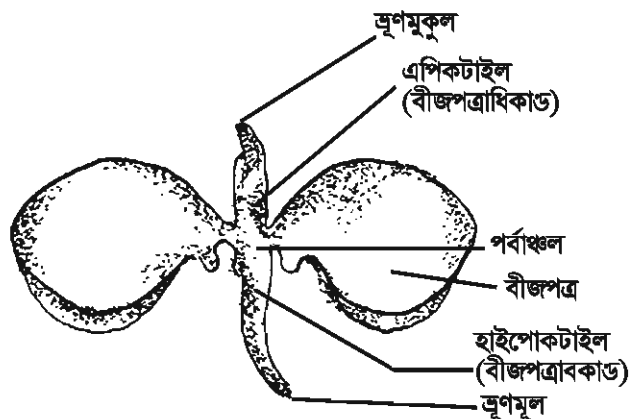
২। **অন্তঃত্বক :** বীজত্বকের ভেতরের পাতলা স্তরের নাম অন্তঃত্বক।

(খ) **কার্নেল :** বীজত্বকের ভেতরের অংশকে কার্নেল বলে। প্রত্যেকটি কার্নেলের দুইটি অংশ থাকে। ১। ভ্রূণ ২। শাঁস বা এন্ডোসপার্ম।

১। **ভ্রূণ :** বীজত্বক দিয়ে আবৃত সুপ্ত শিশু উদ্ভিদই ভ্রূণ। ভ্রূণ ভ্রূণাঙ্ক ও বীজপত্র নিয়ে গঠিত। যে অক্ষের সঙ্গে বীজপত্র সংযুক্ত থাকে তাকে ভ্রূণাঙ্ক বলে। ভ্রূণাঙ্কের যে স্থানে বীজপত্র যুক্ত থাকে সে স্থানকে পর্বাস্থল বলে। পর্বাস্থলের ওপরে ভ্রূণাঙ্কের যে অংশ থাকে সে অংশকে বীজপত্রাধিকাভ বা এপিকটাইল বলে। পর্বাস্থলের নিচের অংশকে বীজপত্রাবকাভ বা হাইপোকটাইল বলে। ভ্রূণাঙ্কের অগ্র প্রান্তকে ভ্রূণমুকুল বলে এবং ভ্রূণাঙ্কের নিম্ন প্রান্তকে ভ্রূণমূল বলে। ভ্রূণমুকুল বৃদ্ধি পেয়ে বিটপে এবং ভ্রূণমূল মূলে পরিণত হয়।

বীজপত্র : একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে। খাদ্য সঞ্চয়ী বীজপত্র পুরু ও রসালো হয়। যে বীজপত্র খাদ্য সঞ্চয় করে না তা পাতলা হয়।

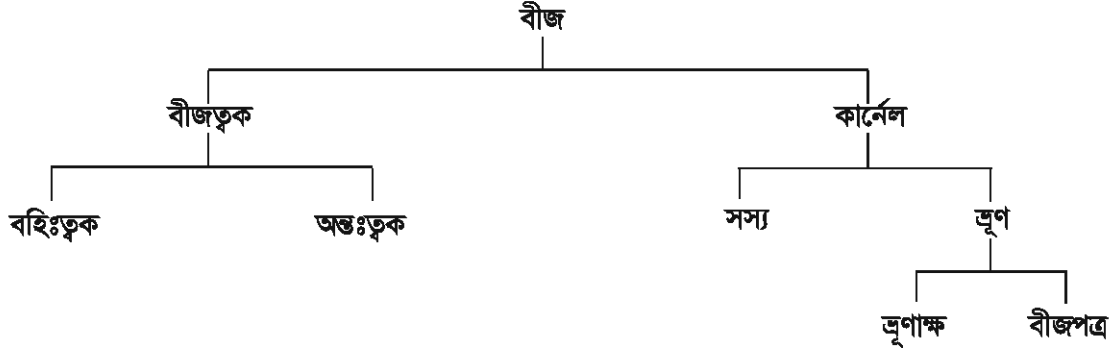
বীজপত্রের কাজ : ১। ভ্রূণ রক্ষা করা ২। শাঁস না থাকলে বীজের ভ্রূণের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা ৩। শাঁসযুক্ত বীজে শাঁস থেকে খাদ্য শোষণ করে বর্ধিষ্ণু ভ্রূণে প্রদান করা। ৪। মৃত্তকাদী অজ্জরোদগমে সবুজ পত্র হিসেবে কাজ করে।



চিত্র ১৫.৬ : ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ

২। শাঁস : যে কোষগুচ্ছ বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে তাকে শাঁস বলে। এ সব সঞ্চিষ্ট খাদ্যের মধ্যে থাকে স্টার্চ, প্রোটিন, তেল ও চর্বি।

একটি আদর্শ বীজের (ধান) বিভিন্ন অংশের ছক



বীজের শ্রেণীবিভাগ

(ক) বীজপত্রের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বীজকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

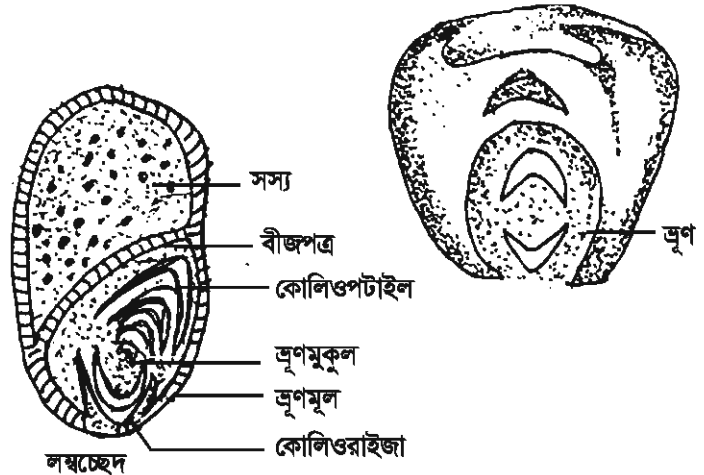
একবীজপত্রী বীজ : যে সব বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে তাদের একবীজপত্রী বীজ বলে। যথা- ধান, গম ও ভুট্টা ইত্যাদি।

দ্বিবীজপত্রী বীজ : যে সব বীজে দুইটি বীজ পত্র থাকে তাদের দ্বিবীজপত্রী বীজ বলে। যথা - ছোলা, মটর, শিম, কুমড়া, শসা, আম ইত্যাদি।

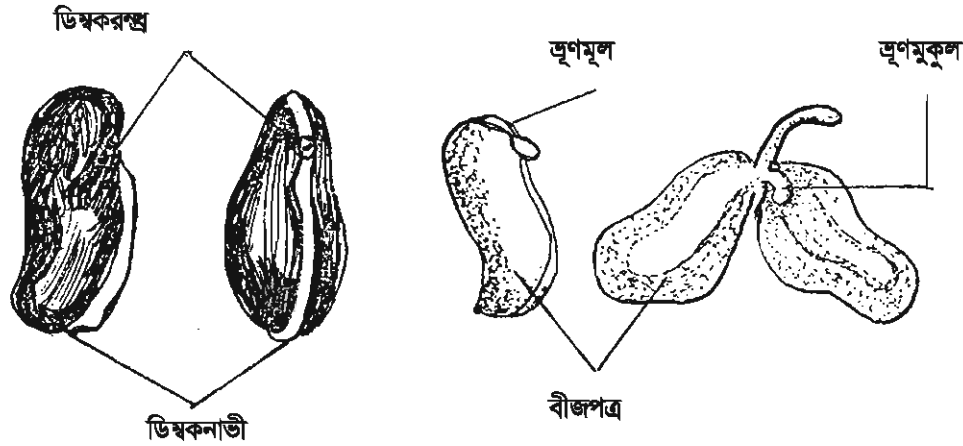
(খ) বীজে সস্যের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বীজকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন -

সস্যল বীজ : যে সব বীজে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শাঁস বা সস্য বিদ্যমান থাকে তাদেরকে সস্যল বীজ বলে। এ সকল বীজে বীজপত্র খাদ্য সঞ্চয় করে না বলে পাতলা হয়। যেমন- ধান, গম, রেড়ি, ভুট্টা ইত্যাদি।

অসস্যল বীজ : যে সব বীজে সস্য থাকে না তাদেরকে অসস্যল বীজ বলে। যেমন- ছোলা, কুমড়া, মটর, আম, শিম ইত্যাদি। প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে বলে এ সকল বীজের বীজপত্র বেশ পুরু হয়।



চিত্র ১৫.৭ : সস্যল বীজ



চিত্র ১৫.৮ : অসস্যাল বীজ- শিম

অঙ্কুরোদগম

শুকনো বীজে ভ্রূণ বা শিশু উদ্ভিদ সুপ্ত থাকে। সুপ্ত অবস্থায় বীজকে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। কিন্তু তখনও বীজের জীবনীশক্তি অটুট থাকে। এ সুপ্ত অবস্থায় বীজের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে কিন্তু প্রয়োজনীয় শ্বাসকার্য চলে। বীজ প্রয়োজনীয় পানি, অক্সিজেন, উত্তাপ ও আলো পেলে সুপ্ত ভ্রূণ জেগে উঠে বাড়তে শুরু করে এবং এক সময় বীজত্বক ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সুপ্ত অবস্থা থেকে ভ্রূণের এ জাগরণকে অঙ্কুরোদগম বলে।

অঙ্কুরোদগমের প্রভাবক

বীজের অঙ্কুরোদগম কতকগুলো প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সব প্রভাবক দুই প্রকার যেমন- ১। বাহ্যিক প্রভাবক এবং ২। অভ্যন্তরীণ প্রভাবক।

অঙ্কুরোদগমের বাহ্যিক প্রভাবকগুলো হচ্ছে পানি, অক্সিজেন, তাপ, আলো এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হচ্ছে খাদ্য, সুপ্ততা, বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ও বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা। এ সব প্রভাবকের কারণে বীজের অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হয়। তবে কোনো কোনো বীজে আলোর অভাব হলে অঙ্কুরোদগম হয় না। যেমন- তামাক। আবার ধুতরা, বিলাতী বেগুনে আলোর একেবারেই দরকার নেই। সফল অঙ্কুরোদগমের জন্য যে পরিমিত পানি, অক্সিজেন ও তাপের প্রয়োজন তা নিচের পরীক্ষাটি দিয়ে প্রমাণ করা যায়।

বীজের অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষণ

উপকরণ : কাঠের টুকরা একটি, তিনটি ছোলা বীজ, আলপিন তিনটি, মোম, বিকার ও পানি।

পরীক্ষণ : (১) কাঠের টুকরায় মোমের প্রলেপ লাগিয়ে এর ওপর সমান দূরত্বে তিনটি ছোলা বীজ পিন দিয়ে আটকে দেই (২) এবার কাঠের টুকরাটি বিকারে হেলান দিয়ে রেখে এমনভাবে বিকারে পানি ঢেলে দেই যেন প্রথম বীজটি পানির ওপরে থাকে, দ্বিতীয় বীজটি আংশিকভাবে পানিতে ডুবে থাকে এবং তৃতীয় বীজটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ডুবে থাকে। এভাবে বিকারটি কয়েকদিন রেখে দেই।



চিত্র ১৫.৯ : অঙ্কুরোদগম

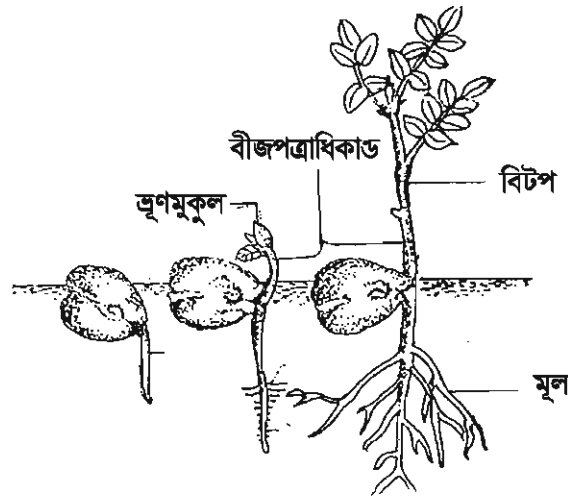
পর্যবেক্ষণ : তিন চার দিন পরে দেখা যাবে যে, প্রথম বীজটিতে মোটেই অঙ্কুরোদগম হয়নি। দ্বিতীয় বীজটিতে স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে এবং তৃতীয়টিতে আংশিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : প্রথম বীজটি অক্সিজেন, তাপ ও আলো পেয়েছে কিন্তু পানি পায়নি বলে অঙ্কুরোদগম হয়নি। দ্বিতীয় বীজটি প্রয়োজনীয় পানি, তাপ, অক্সিজেন ও আলো পেয়েছে বলে স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে। তৃতীয় বীজটি পানি ও তাপ পেয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায়নি বলে আংশিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে।

অঙ্কুরোদগমের শ্রেণীবিভাগ

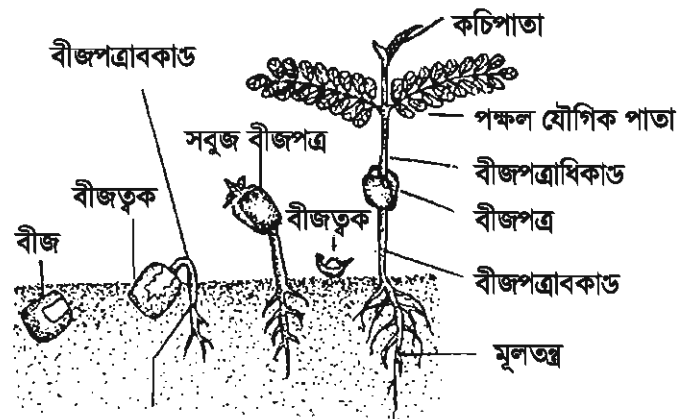
বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত তিন প্রকার :

(১) **মৃৎগত অঙ্কুরোদগম বা হাইপোগিজিয়াল জারমিনেশন :** যে অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়ায় বীজপত্রাধিকাডের (এপিকটাইল) দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভ্রূনমুকুল মাটির ওপরে উঠে আসে কিন্তু বীজপত্র মাটির নিচে থেকে যায় তাকে মৃৎগত অঙ্কুরোদগম বা হাইপোগিজিয়াল জারমিনেশন বলে। যেমন- আম, ছোলা, মটরশুটি, ধান গম ইত্যাদি।



চিত্র ১৫.১০ : ছোলা বীজের মৃৎগত অঙ্কুরোদগম

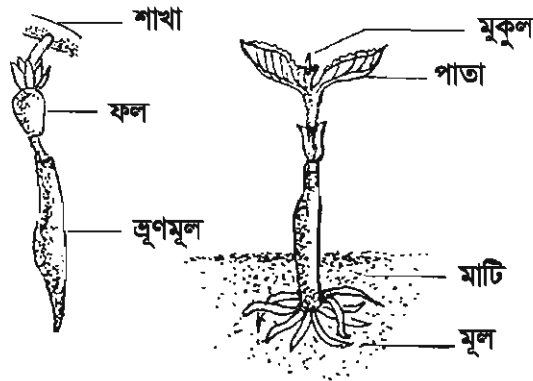
(২) **মূষভেদী অঙ্কুরোদগম বা এপিজিয়াল জারমিনেশন :** যে অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়ায় বীজপত্রাবিকাডের (হাইপোকটাইল) দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বীজপত্র বীজতুক ফেটে মাটি ভেদ করে ওপরে উঠে আসে তাকে মূষভেদী অঙ্কুরোদগম বা এপিজিয়াল জারমিনেশন বলে। যেমন- তেঁতুল, লাউ, পিঁয়াজ, কুমড়া, শিম ইত্যাদি।



চিত্র ১৫.১১ : তেঁতুল বীজের মূষভেদী অঙ্কুরোদগম

(৩) **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বা ভিভিপেরাস জারমিনেশন** : সমুদ্রের তীরবর্তী লোনা মাটিতে যে সব উদ্ভিদ জন্মে তাদেরকে লোনা মাটির উদ্ভিদ বলে। লোনা মাটির অধিকাংশ উদ্ভিদে যে বিশেষ ধরনের অঙ্কুরোদগম দেখা যায় তাকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। যেমন- গরান, কেওড়া, কাকরা ইত্যাদি।

লোনা মাটির উদ্ভিদের বিশেষত্ব এই যে, গাছের সজো যুক্ত থাকা অবস্থায় ফলের ভেতর বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। ভ্রূণমূল ফলত্বক ভেদ করে বের হয়ে ঝুলে থাকে এবং বীজপত্রাবকাড বেড়ে ফুলে ওঠে। এ সময় ভ্রূণমুকুলও বৃদ্ধি পেয়ে ওজনে বেড়ে যায়। ওজন বাড়ার কারণে গাছ হতে চারা বিচ্ছিন্ন হয়ে খাড়াভাবে নরম মাটিতে ঢুকে আটকে যায়। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগমের দরুন সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় জোয়ার ভাটার টানে বীজ ভেসে যেতে পারে না। তা না হলে সমুদ্র উপকূলে বনরাজি জন্মাতে পারত না।



চিত্র ১৫.১২ : জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

বীজের অঙ্কুরোদগমের গুরুত্ব

- ১। কৃষিকাজে বীজের অঙ্কুরোদগম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ২। বীজের অঙ্কুরোদগম কম হলে শস্যের উৎপাদন কম হবে।
- ৩। বীজ বপন করার পূর্বে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার নির্ণয় করা দরকার।
- ৪। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার কম হলে কী পরিমাণ অতিরিক্ত বীজ বপন করতে হবে তা নিরূপণে অঙ্কুরোদগম জানা দরকার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি অপ্রকৃত ফল?

- ক. আম
গ. আপেল

- খ. জাম
ঘ. লিচু

২. শিশু উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় বীজের

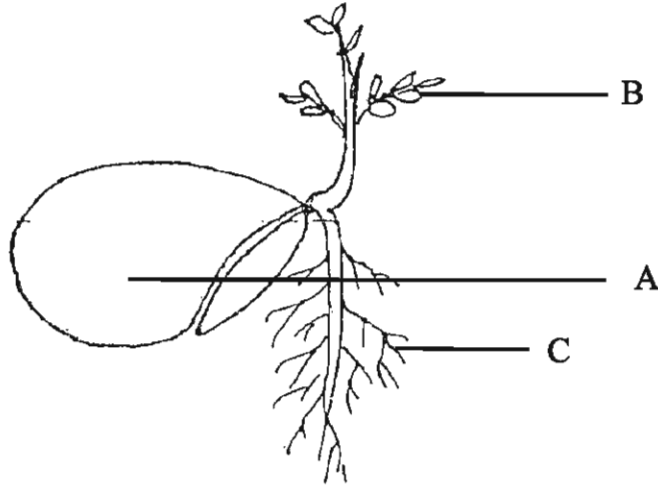
- i. বীজপত্র থেকে
ii. ভ্রূণ থেকে
iii. ভ্রূণ মুকুল ও ভ্রূণ মূল থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. ii ও iii

- খ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র হতে ৩ এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. A এবং C চিহ্নিত অংশের নাম কী?

- ক. ফল ও মূল
গ. বীজপত্র ও প্রধান মূল

- খ. বীজ ও মুকুল
ঘ. বীজপত্র ও ভ্রূণ মূল

৪. ওপরের চিত্রে

- i. A অংশটি খাদ্য সম্বিষ্ট রাখে
ii. B অংশটি বিটপ তৈরি করে
iii. C অংশটি কাণ্ডে পরিণত হয়

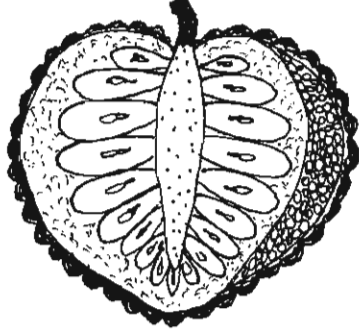
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. i ও iii

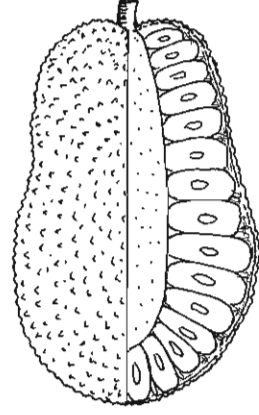
- খ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্র - ক



চিত্র - খ

- ক. উৎস ও প্রকৃতি অনুসারে 'খ' ফলটি কোন প্রকারের?
- খ. 'খ' ফলটিকে এ ধরনের ফল বলা হয় কেন?
- গ. 'ক' ও 'খ' ফল দুটির পার্থক্য বর্ণনা কর।
- ঘ. 'খ' ফলটি একটি অর্থকরী ফল- এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।
২. রহিমা বেগম সবসময় বাড়ির আঙিনায় লাউ কুমড়া, শিম ইত্যাদি সবজির আবাদ করেন। এজন্য প্রতি বছর তিনি বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করেন। যদিও তার বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি সঠিক হয় না। একবার রহিমা বেগম বীজ রোপণ করার পর লক্ষ করেন কিছু বীজের স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে। অবশিষ্ট বীজগুলোর মধ্যে কিছু বীজের কোনো অঙ্কুরোদগমই হয়নি এবং অধিকাংশ বীজে অসম্পূর্ণ অঙ্কুরোদগম হয়েছে।
- ক. লাউ গাছে কী ধরনের অঙ্কুরোদগম হয়?
- খ. কিছু বীজের কেন স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে?
- গ. ওপরের শেষোক্ত ধরনের বীজে ঐ রকম অঙ্কুরোদগমের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অধিক ফলনের লক্ষ্যে সফল অঙ্কুরোদগমের জন্য রহিমা বেগমের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

ষোড়শ অধ্যায়

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ : মরিচ গাছ

উদ্ভিদে ফুল হয় কিনা এর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ জগতকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা- অপুষ্পক ও সপুষ্পক উদ্ভিদ।

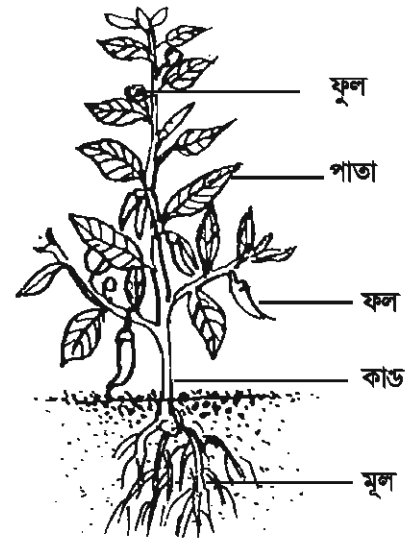
যে সব উদ্ভিদে ফুল হয় এদের সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। আমাদের চারপাশের প্রায় সকল পরিচিত উদ্ভিদই সপুষ্পক, যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, গোলাপ, চাঁপা, শেফালী, ধান, গম, পাট, কপি, মুলা, গাজর, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনে প্রভৃতি। এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা সপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। পূর্ববর্তী শ্রেণীতে আমরা উদ্ভিদের অঙ্গাঙ্গিসংস্থানের সম্বন্ধে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের অতি পরিচিত এবং নিত্যদিনের ব্যবহার্য মরিচ গাছ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানব।

মরিচ

মরিচ আমাদের দেশের অধিকাংশ রান্নার কাজে ব্যবহৃত মসলার একটি উপাদান। তা ছাড়া মরিচ এদেশের একটি অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে যে দুই ধরনের মরিচের চাষাবাদ হয়ে থাকে তা হচ্ছে (ক) মিঠা মরিচ ও (খ) ঝাল মরিচ। এ দুই ধরনের মরিচ আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে আমরা সবচেয়ে বেশি যে মরিচ ব্যবহার করি তার বৈজ্ঞানিক নাম *Capsicum frutescens*। এ মরিচ গাছ বর্ষজীবী বীজবীজ। মরিচ মসলা হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও এ থেকে সস তৈরি করা হয়। মিঠা মরিচ তরকারি ও সালাদ হিসেবে খাওয়া যায়।

মরিচ গাছের বহিঃঅঙ্গাঙ্গিসংস্থান

মরিচ গাছ একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ। মরিচের প্রধান মূলতন্ত্র আছে। তা ছাড়া কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল রয়েছে। মরিচ গাছ শাখা-প্রশাখা বহুল এবং ঝোপের ন্যায়। পত্র বিন্যাস একান্তর, পত্রবৃত্ত ছোট এবং বড় দুই রকমের হয় এবং পত্রফলকের শীর্ষ সরু। মিঠা মরিচের পত্রকক্ষে একটি মাত্র ফুল হয়। ঝাল মরিচের পত্রকক্ষে দুই বা ততোধিক ফুল পাওয়া যায়। পুষ্পবৃত্ত লম্বা। যুক্ত বৃতির অগ্রভাগে পাঁচটি ছোট দাঁত আছে। এগুলো একেকটি বৃত্তাংশ। দলমণ্ডলের পাঁচটি সাদা পাপড়ি যুক্ত থাকে এবং দেখতে চোঙের মত। পুষ্পস্তবকে পাঁচটি পুষ্পকেশর থাকে। পরাগধানী কালো বা গাঢ় বেগুনি রঙের। গর্ভাশয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠে অনেক ডিম্বক থাকে। মরিচ গাছে স্ব ও পর পরাগায়ন ঘটে। মরিচে ক্যাপসিসিন নামক ফেনল জাতীয় পদার্থের দরুন ঝাল লাগে। মিঠা মরিচের ক্যাপসিসিন কম থাকে বলে ঝাল কম। মিঠা ও ঝাল মরিচে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি' এবং অল্প পরিমাণে ভিটামিন 'এ' এবং 'ই' থাকে।

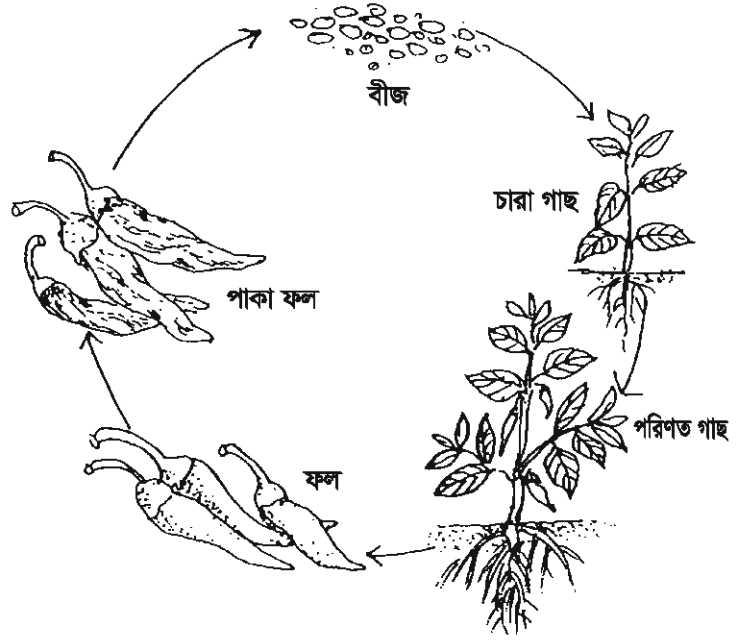


চিত্র ১৬.১ : মরিচ গাছ

একটি মরিচ গাছের জীবনচক্র

কোনো উদ্ভিদই চিরকাল বেঁচে থাকে না। সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনকাল মোটামুটি নির্দিষ্ট। এ সব উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। প্রয়োজনীয় ও পরিমিত পরিমাণে আলো, বাতাস, পানি পেলে বীজ থেকে চারা গজায়। চারা ক্রমশ বড় হয় এবং এক সময় তাতে ফুল আসে। ফুল থেকে ফল এবং ফলের মধ্যে বীজ জন্মায়। বীজ থেকে আবার নতুন চারা গাছ জন্মে। উদ্ভিদের জীবনে বীজ থেকে চারাগাছ, পরিণত গাছ থেকে ফুল, ফল এবং আবার বীজ হওয়াকে উদ্ভিদের জীবনচক্র বলা হয়।

একটি মরিচ নিয়ে আমরা পরীক্ষা করি। এ মরিচের জন্ম কোথা থেকে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি। অপরাপর সপুষ্পক উদ্ভিদের মত মরিচ গাছেরও জন্ম হয়েছে মরিচের বীজ থেকে। মরিচ পাকার পর তার বীজ বের করে নিয়ে বপন করলে ৩/৪ দিন পর তা থেকে চারা গজায়। এ চারা গাছে তখন সবু কাড আর দুই চারটি নরম পাতা থাকে। আস্তে আস্তে ছোট চারা গাছটি বেড়ে তিন চার মাসে শাখা-প্রশাখাসহ একটি গাছে পরিণত হয়। এরপর গাছে ফুল ধরে এবং কচি কচি মরিচ দেখা যায়। এ কচি মরিচগুলো দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে পেকে লাল রং ধারণ করে। মরিচের বীজ উপযুক্ত পরিবেশে পড়লে বা ফেললে তা থেকে আগের মত আবার চারা গজায় এবং সময়ে পরিণত মরিচ গাছ হয়ে ফুলে ফুলে ভরে উঠে। এ চক্রাকার প্রক্রিয়াকে মরিচ গাছের জীবনচক্র বলা হয়।



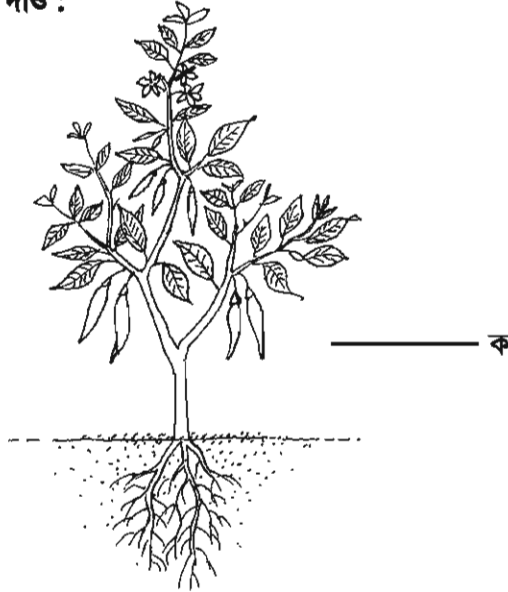
চিত্র ১৬.২ : মরিচ গাছের জীবনচক্র

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মরিচের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
 ক. *Capsicum fruticens*
 গ. *Mangifera indica*
 খ. *Brassica napus*
 ঘ. *Artocarpus heterophyllus*.
২. নিচের কোনটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ?
 ক. ফার্ন
 গ. ধান
 খ. আম
 ঘ. খেজুর
৩. কোনটির কারণে মরিচ ঝাল লাগে?
 ক. ক্যাপসিসিন
 গ. ভিটামিন ই
 খ. ভিটামিন সি
 ঘ. ভিটামিন এ
৪. মরিচ ফুলের
 i. পাপড়ি বিমুক্ত থাকে
 ii. পরাগধানী গাঢ় বেগুনি হয়
 iii. গর্ভাশয়ে ডিম্বক কম থাকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৫. চিত্রের গাছের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
 i. সপুষ্পক উদ্ভিদ
 ii. বর্ষজীবী বীজুৎ
 iii. প্রধান মূলতন্ত্র আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. চিত্রের 'ক' অংশ-

i. মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়

ii. প্রচুর ভিটামিন সি ও বি ধারণ করে

iii. ক্যাপসিসিন নামক পদার্থ ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

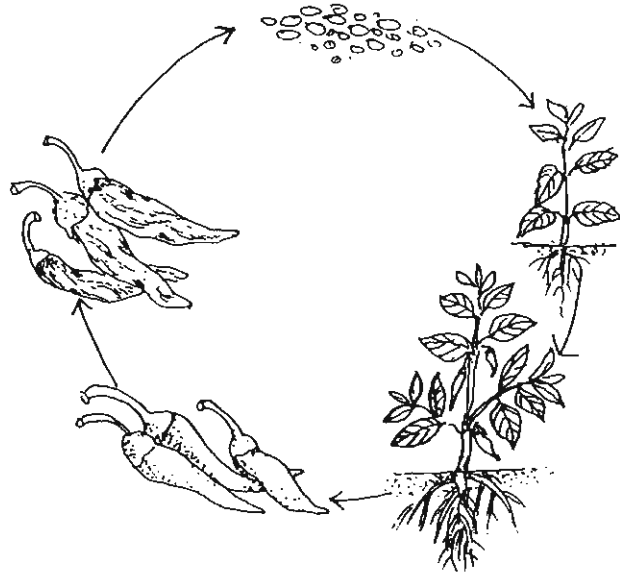
ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :



ক. চিত্রটি কী প্রকাশ করে।

খ. চিত্রের উদ্ভিদটিকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রের আলোকে আম গাছের জীবন চক্রের ধাপগুলো আঁক।

ঘ. খাদ্য হিসেবে তোমার অজিকত উদ্ভিদটির অবদান বর্ণনা কর।

সস্তদশ অধ্যায়

জীব ও তার পরিবেশ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে আমরা নানা রকম উদ্ভিদ দেখতে পাই। এ সব উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলোর ফুল-ফল হয় এবং কতকগুলোর ফুল-ফল কিছুই হয় না। আবার কতকগুলো এক দুই বছর বেঁচে থাকে এবং কতকগুলো বহু বছর বেঁচে থেকে আলো, ছায়া, ফুল ও ফল দান করে। তা ছাড়া কতকগুলোর কাণ্ড খুব নরম এবং কতকগুলোর কাণ্ড বড় ও শক্ত। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদ স্বভোজী, পরজীবী এবং মৃতজীবী। উদ্ভিদের এ রূপ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণীতে শিখেছি। এ শ্রেণীতে আমরা উদ্ভিদের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানব।

উদ্ভিদ যেখানে জন্মে সেখানকার মাটি, পানি, বায়ু, সূর্যালোক ও চারপাশের অন্যান্য জীবন নিয়ে তার পরিবেশ গঠিত হয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে থাকে। যেমন- পানিতে যে ধরনের উদ্ভিদ জন্মে, ডাঙায় সে ধরনের উদ্ভিদ জন্মে না। মরুভূমিতে যে ধরনের উদ্ভিদ জন্মে সেগুলো পানিতে সাধারণত জন্মে না। অনেক স্থলজ উদ্ভিদ লোনা মাটি ও পানিতে জন্মাতে পারে না। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের বাসস্থানের পানির প্রাপ্যতা ও লবণাক্ততার পরিমাণের কম বেশির মধ্যে যে উদ্ভিদগুলো জন্মাতে পারে এদেরকে চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

(১) জলজ উদ্ভিদ (২) স্থলজ উদ্ভিদ (৩) মরু উদ্ভিদ এবং (৪) লোনা মাটির উদ্ভিদ।

১। জলজ উদ্ভিদ : যে সমস্ত উদ্ভিদ পানিতে বা পানিয়ুক্ত স্থানে জন্মে তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ বলে। এ সব জলজ উদ্ভিদ নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, হ্রদ-জলাশয় ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

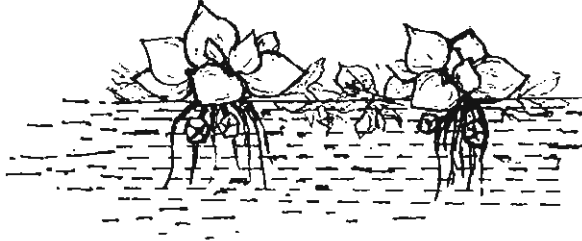
জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হল :

- ১। মূল খুব ছোট এবং মূলরোম নেই।
- ২। মূলের অগ্রভাগে মূলাধার বা মূলখলি থাকে।
- ৩। ভাসমান উদ্ভিদের পাতা বড়, গোলাকার ও লম্বা বোঁটা যুক্ত।
- ৪। পাতার উপরের পৃষ্ঠে মোম জাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে।
- ৫। ভাসমান উদ্ভিদের ফুল উজ্জ্বল হয়।
- ৬। ভাসমান উদ্ভিদ অজাজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে থাকে।

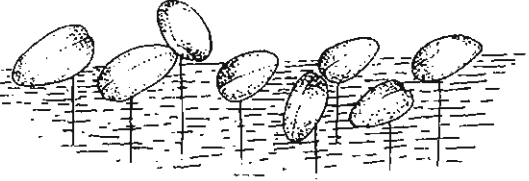
জলজ উদ্ভিদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক) ভাসমান জলজ উদ্ভিদ : যে সকল জলজ উদ্ভিদ পানির উপর ভেসে থাকে এদেরকে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। ভাসমান উদ্ভিদ আবার দুই প্রকার। যথা-

১। মুক্ত ভাসমান : যে সকল ভাসমান উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে চলতে পারে তাদের মুক্ত ভাসমান উদ্ভিদ বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে ভাসমান মূল থাকে। মূলে মূলরোম অনুপস্থিত, কিন্তু মূলখলি থাকে। পাতার উপরের পৃষ্ঠে মোমের আস্তরণ ও পত্ররশ্মি থাকে। যেমন- ক্ষুদিপানা, কচুরিপানা, গুড়িপানা, সিংগারা, অ্যাজোলা প্রভৃতি।



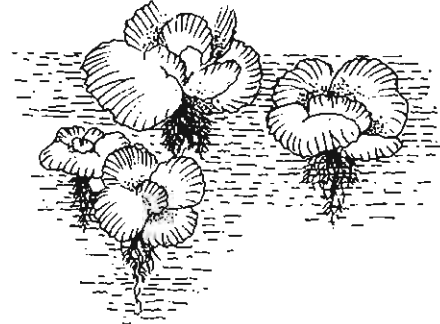
সিংগারা



লেমনা (ক্ষুদিপানা)



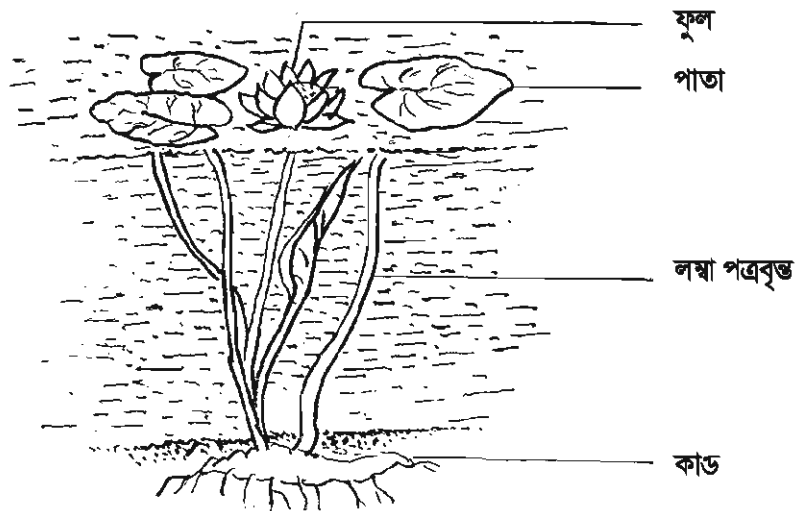
কচুরিপানা



টোপাপানা

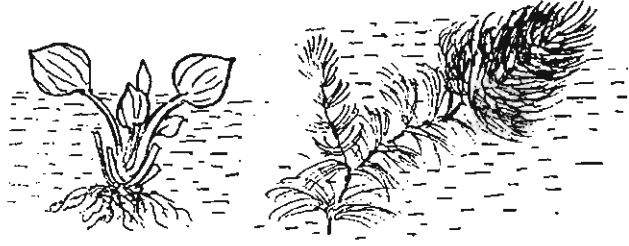
চিত্র ১৭.১ : মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

২। মাটিতে আবদ্ধ ভাসমান : যে সকল উদ্ভিদের পাতা ও ফুল পানিতে ভাসমান কিন্তু মূল পানির নিচের মাটিতে আবদ্ধ থাকে তাকে মাটিতে আবদ্ধ ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। যথা- শাপলা, পদ্ম, মাখনা ইত্যাদি। এদের পত্রবৃন্ত বেশ লম্বা হয় যার জন্য এরা গভীর পানিতেও ভাসতে পারে।



চিত্র ১৭.২ : আবদ্ধ ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

খ) **নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ** : যে সকল উদ্ভিদ সর্বদাই পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাদেরকে নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। যেমন- পাতা শেওলা, হাইড্রিলা, পাতা ঝাঁঝি ইত্যাদি। এদের কাণ্ড খুবই কোমল, দুর্বল, সবু ও সবুজ হয়।



চিত্র ১৭.৩ : নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ

গ) **উভচর উদ্ভিদ** : যে সকল উদ্ভিদ আংশিকভাবে জলজ এবং আংশিকভাবে স্থলজ তাদেরকে উভচর উদ্ভিদ বলে। এ সকল উদ্ভিদ পানির কিনারায় জন্মে কিন্তু এদের কাণ্ড পানির মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। যথা- কেশরদাম, কলমিশাক, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।



চিত্র ১৭.৪ : উভচর উদ্ভিদ

উদ্ভিদের অভিযোজন

প্রতিটি উদ্ভিদ তার নিজস্ব পরিবেশে অতি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থেকে বংশ বিস্তার করে।

এ পরিবেশের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটলে

উদ্ভিদের স্বভাব ও দৈহিক গঠনে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে এভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার নামই উদ্ভিদের অভিযোজন।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন : জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন অনেক উপায়ে হয়ে থাকে তবে এখানে প্রধান কয়েকটি অভিযোজন প্রক্রিয়া বিবৃত করা হল :

(১) জলজ উদ্ভিদের পাতলা আবরণযুক্ত বহিঃভূত্বকে থাকে বলে সারাদেহের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে পারে। সে কারণে এ সব উদ্ভিদের পুরোপুরিভাবে গঠিত মূলরোমের প্রয়োজনীয়তা কম।

(২) এদের ঢেউ খেলানো নরম ও লম্বা পর্বযুক্ত কাণ্ড থাকে বলে পানির স্রোত ও জলজ প্রাণীর চলাচলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। এদের কাণ্ড শক্ত হলে তা সহজেই ভেঙে যেত।

(৩) জলজ উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বহিঃভূত্বকের মাধ্যমে পানি শোষণ করতে পারে। তাই পানি বহনকারী কলার প্রয়োজনীয়তাও কম।

(৪) এ জাতীয় উদ্ভিদের পাতা বড়, বোঁটা বায়ু কুঠরীযুক্ত ও কোষস্থ ফাঁকগুলো বড় বিধায় বেশি বাতাস জমা রাখতে পারে যা এদেরকে পানিতে ভাসতে সাহায্য করে।

(৫) জলজ উদ্ভিদে সাধারণত পানির মাধ্যমে পরাগায়ন হয়ে থাকে। এতে নিষিক্তকরণের নিশ্চয়তা থাকে না বলে যৌন পদ্ধতিতে এদের বংশ বিস্তারে অসুবিধা হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা অজলজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে।

২। **স্থলজ উদ্ভিদ** : যে স্থানের মাটিতে পানির পরিমাণ অতি বেশিও না আবার খুব কমও না, মধ্যম প্রকৃতির, সে স্থানের মাটিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তাদেরকে স্থলজ উদ্ভিদ বলে। স্থলভাগের সকল প্রকার উদ্ভিদই স্থলজ উদ্ভিদ।

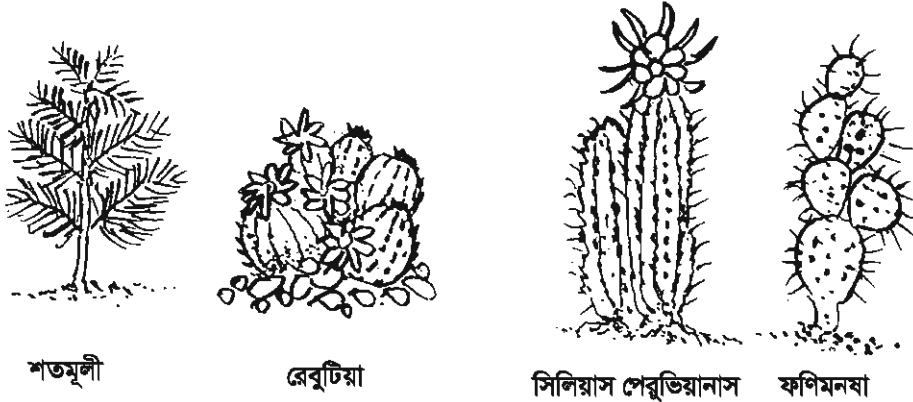
স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

- ১। মূল, মূলরোম, মূলত্র এবং শাখা-প্রশাখায়ুক্ত।
- ২। কাণ্ড সাধারণভাবে স্পষ্ট ও বিকশিত।
- ৩। পাতায় অসংখ্য পত্ররশ্মি ও কিউটিকল থাকে।
- ৪। স্থলজ উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদানকারী কোষগুচ্ছ ও পরিবহনতন্ত্র সুগঠিত থাকে।

৩। **মরু উদ্ভিদ** : যে স্থানে বৃষ্টিপাত হয় না আবার বৃষ্টিপাত হলেও মাটিতে পানির পরিমাণ খুব কম থাকে। এ ধরনের শুষ্ক মাটিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তাদেরকে মরু উদ্ভিদ বলে। যেমন- বাবলা, ফণিমনসা, ঝাউ, শতমূলী, আকন্দ, করবী প্রভৃতি। মাটির শুষ্কতা এ সব উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিস্তারে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না।



চিত্র ১৭.৫ : স্থলজ উদ্ভিদ



শতমূলী

রেবুটিয়া

সিলিয়াস পেরুভিয়ানাস

ফণিমনসা

চিত্র ১৭.৬ : মরু উদ্ভিদ

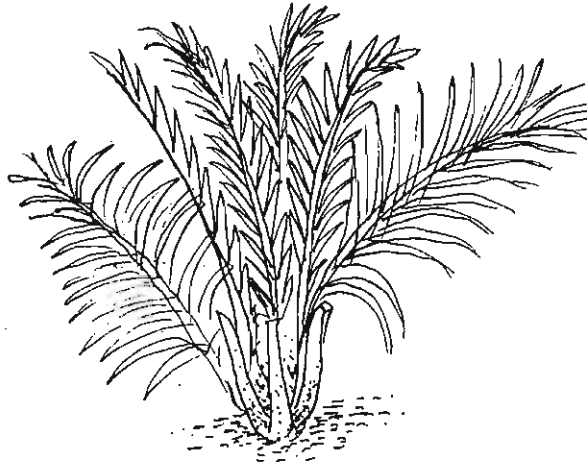
মরু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

পানি সংরক্ষণ, সহজে পানি গ্রহণ এবং সংগৃহীত পানি পরিমিত মাত্রায় খরচ এবং পানি অপচয় রোধ করার জন্য মরু উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন হয়ে থাকে। সেগুলো হল :

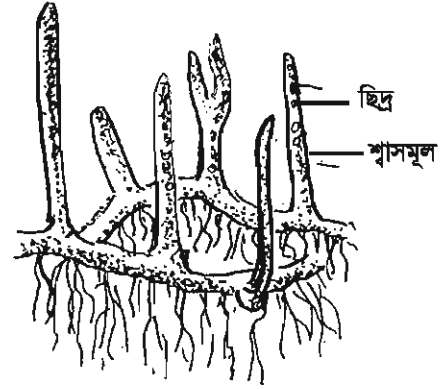
- (১) মরু উদ্ভিদ পানি কম পায় বলে আকারে ছোট ঝোপযুক্ত হয়।
- (২) মরু উদ্ভিদের পাতা ছোট হয়। কাণ্ড পানি সংরক্ষণের জন্য রসালো হয়।
- (৩) এদের প্রধান মূল খুব দীর্ঘ হয় কারণ মাটির গভীর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এদের শাখা মূল খর্বাকার কিন্তু বিস্তৃত এবং অসংখ্য দীর্ঘ মূলরোমযুক্ত হয় যাতে এরা সহজে পানি ও খনিজ লবণ সংগ্রহ করতে পারে।
- (৪) কাণ্ড পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা ও সবুজ হয়।
- (৫) এদের পাতা পানির অপচয় কমানোর জন্য অনাবৃষ্টির সময় ঝরে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শঙ্ক পত্র অথবা কাঁটায় পরিবর্তিত হয়, পত্ররশ্মি ভিতরে এবং রোম দিয়ে ঢাকা থাকে।

- (৬) পাতার বহিঃত্বকে পুরু কিউটিকল থাকে।
 (৭) সামান্য বৃষ্টিতে অঙ্কুরোদগম হয় এবং অল্প সময়ে ফুল, ফল ধারণ করতে পারে।
 (৮) কোষ ছোট আয়তনের এবং পুরু কোষ প্রাচীরযুক্ত হয় যাতে চরম শুষ্কতার সময় নষ্ট না হয়।
 (৯) মরু উদ্ভিদ শুষ্কতার সময় যাতে ঢলে না পড়ে সে জন্য এদের দৃঢ়তা প্রদানকারী কোষের গঠন বলিষ্ঠ হয়।

৪। লোনা মাটির উদ্ভিদ : যে সব উদ্ভিদ লোনা মাটিতে জন্মে সে সব উদ্ভিদকে লোনা মাটির উদ্ভিদ বলে। যেমন- কেওড়া, সুন্দরী, গোয়া, গরান, গোলপাতা, পসুর, বোড়া, হিন্দাল প্রভৃতি। লোনা মাটিতে সব উদ্ভিদ জন্মে না। যে সব উদ্ভিদ লোনা মাটি ও পানির সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে সব উদ্ভিদই লোনা মাটিতে জন্মে। আমাদের দেশের সুন্দরবন এলাকার উদ্ভিদই লোনা মাটির উদ্ভিদ। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের লোনা মাটির উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে। যেমন- সুন্দরী, গোয়া, গরান। এদের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা অপরাপর উদ্ভিদের মধ্যে নেই।



গোলপাতা



সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল

চিত্র ১৭.৭ : লোনা মাটির উদ্ভিদ

লোনা মাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

- (১) লোনা মাটির উদ্ভিদের কাড ও পাতা রসালো, আবার অনেক সময় পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়।
 (২) জোয়ার ভাটার পানি যাতে ভাসিয়ে নিতে না পারে এবং ঢলে না পড়ে সেজন্য এদের ঠেস ও স্তম্ভ মূল হয়।
 (৩) এদের ফল গাছে থাকা অবস্থায় অঙ্কুরোদগম হয়। এরূপ অঙ্কুরোদগমকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।
 (৪) মূল ও মূলের শাখা-প্রশাখা লম্বা হয় এবং মাটির সামান্য নিচ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কিছু উদ্ভিদের শ্বাসমূল সহজে গ্যাস বিনিময়ের জন্য মাটি ভেদ করে ওপরে উঠে আসে।
 (৫) এদের কোষে লবণের পরিমাণ বেশি থাকায় এরা লবণাক্ত পরিবেশেও পানি শোষণ করতে পারে।

লোনা মাটির উদ্ভিদের অভিযোজন

- (১) লোনা মাটি থেকে উদ্ভিদের পানি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। প্রচুর বৃষ্টির সময় লবণাক্ততা কমে যায়। এ সময় এ সব উদ্ভিদ তাদের কোষে পানি সংগ্রহ করে রাখে বলে কোষ, পাতা, কাড ও মূল রসালো থাকে।
 (২) ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রতিদিন জোয়ার ভাটায় নিয়মিত নিমজ্জিত হয়। সে জন্য এ সব উদ্ভিদের কাড থেকে স্তম্ভ ও

ঠেসমূল বের হয়ে উদ্ভিদকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে বলে জোয়ার ভাটায় ভেসে যেতে পারে না।

(৩) লোনা মাটিতে পানিবদ্ধতা থাকে বলে এদের মূলের গ্যাস বিনিময় ব্যাহত হয়। সে কারণে এ সব উদ্ভিদের শ্বাসমূল বের হয়ে পানির ওপরে এসে গ্যাস বিনিময় করে থাকে। এ ছাড়া এ সব শ্বাসমূলে বড় বড় বায়ুকুণ্ডুরী থাকে যা অক্সিজেন পূর্ণ থাকে।

(৪) লোনা মাটিতে বীজ অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হয়। আর বীজ অঙ্কুরোদগম হলেও লবণাক্ততার দরুন মরে যায়। এ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ফল গাছে থাকা অবস্থাতেই জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। ফল মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই মূল কাদায় ঢুকে পড়ে। ফলে জোয়ার ভাটার টানে ভেসে যেতে পারে না।

(৫) লোনার প্রকোপ থেকে রেহাই পাবার জন্য এ উদ্ভিদের শাখা মূলগুলো মাটির উপরের স্তরে বিস্তার ঘটায়। ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্যাস আদান প্রদান সহজে করতে পারে।

বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম

আমাদের চারপাশে নানা রকমের ও নানা জাতের অগণিত জীব ও জড়বস্তু দেখা যায়। এ সব জীব যে শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তা নয়। এরা অন্যান্য উপাদানের (মাটি, পানি, বায়ু, আলো ও তাপ ইত্যাদি) ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। যখন কোনো স্থানে অনেক ধরনের ও জাতের জীব একত্রে দলবদ্ধ হয়ে থাকে তখন এদের মধ্যে গড়ে উঠে বাস্তুসংস্থান।

জীবের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কোনো স্থানে বা এলাকায় জড় ও জীবের মধ্যে নানারূপ সম্পর্ক গড়ে উঠে। কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব ও জড়ের মধ্যে এরূপ গড়ে ওঠা নিবিড় আত্মসম্পর্ককেই বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম বলে। পরিবেশ অনুসারে এ বাস্তুসংস্থান দুই রকম যথা- ১) জলজ বাস্তুসংস্থান এবং ২) স্থলজ বাস্তুসংস্থান। আবার বাস্তুসংস্থানের উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (ক) ভৌত বা অজীব উপাদান এবং (খ) জীব উপাদান। উভয় প্রকারের উপাদানই পরিবেশের প্রত্যেকটি জীবকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম

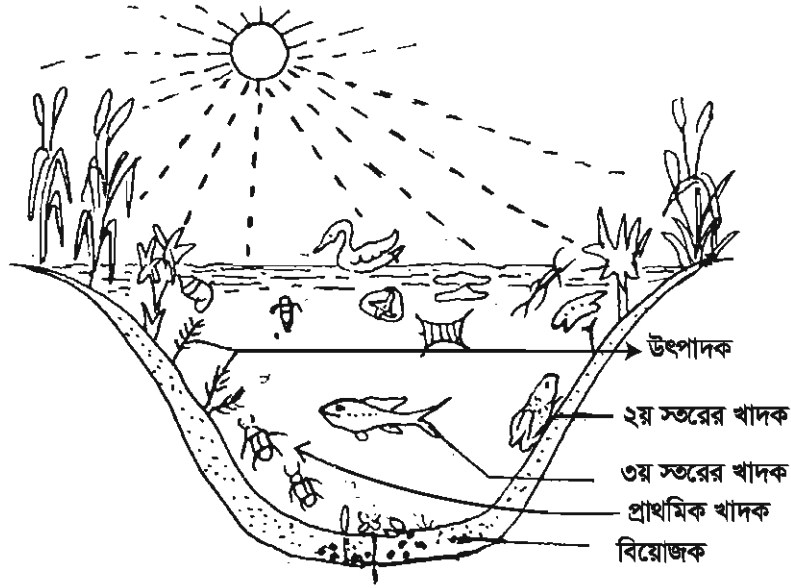
অজীব উপাদান : জলজ বাস্তুসংস্থানের উত্তম বা আদর্শ উদাহরণ হল একটি ছোট পুকুর। কারণ পুকুরে বসবাসকারী জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সহজে বুঝা যায়। একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান নিচে বর্ণনা করা হল :

১। অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নানা প্রকার অজৈব লবণ। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের কার্যকারিতা এ সব অজীব উপাদানকে জীব উপাদান কেমন করে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে।

২। উৎপাদক : পুকুরের পানিতে ভাসমান ও কিনারায় অগভীর পানিতে জন্মে থাকা সবুজ উদ্ভিদ পুকুরে বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক। পুকুরে যে সব জীব বাস করে এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে ভাসমান ও সঞ্চরমান জীব যাদের আমরা প্ল্যাঙ্কটন বলি। আগুবীক্ষণিক উদ্ভিদকে বলা হয় উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। আর আগুবীক্ষণিক প্রাণীকে বলা হয় প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন বা জুয়োপ্ল্যাঙ্কটন। এ ছাড়া পুকুরে রয়েছে সবুজ শেওলা, ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, কচুরিপানা, শাপলা ইত্যাদি।

৩। খাদক : জলজ কীটপতঙ্গ, লার্ভা, মাছ, ঝিনুক, শামুক, বক, চিল, মাছরাঙ্গা ইত্যাদি খাদক পর্যায়ভুক্ত। খাদক স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(ক) প্রথম স্তরের খাদক : উদ্ভিদভোজী সব প্রাণী প্রথম স্তরের খাদক। যথা- ক্ষুদ্র ভাসমান পোকা, মশার শূককীট, কেঁচো, জুয়োপ্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদি।



চিত্র ১৭.৮ : একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান

(খ) **দ্বিতীয় স্তরের খাদক** : যে সব প্রাণী প্রথম স্তরের খাদক আহার করে তাদেরকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলে। যেমন- ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ, জলজ প্রাণী ইত্যাদি।

(গ) **তৃতীয় স্তরের খাদক** : যে সব প্রাণী দ্বিতীয় স্তরের খাদক খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। যথা- বড় মাছ, বক, চিল, উদবিড়াল, বাজপাখি, ঈগল, পানকৌড়ি ইত্যাদি।

৪। **বিয়োজক** : মৃতজীবী ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, পুকুরের তলার কাদাতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বিয়োজকরূপে কাজ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিয়োজিত অজৈব পদার্থ ও লবণ আবার উৎপাদক ব্যবহার করে থাকে।

বাস্তুসংস্থান কীভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে?

১। বাস্তুসংস্থান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যেমন- শক্তি উৎস থেকে উৎপাদকের দিকে প্রবাহিত হয়। উৎপাদক থেকে ব্যবহারকারী জীবের কাছে যায় এবং ব্যবহারকারীর দেহ থেকে শক্তি পরিবেশে মুক্ত হয়।

২। বাস্তুসংস্থানের দরুন প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি জীব অপর একটি জীবকে খাদ্য শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে। ফলে কোনো জীবের সংখ্যা বাড়তে কিংবা সহজে নির্মূল হতে দেয় না। পরিণামে প্রকৃতিতে জীবের সংখ্যার সমতা বজায় থাকে। যেমন- প্রকৃতিতে যদি কোনো কারণে কোনো একটি জীবের সংখ্যা বেড়ে যায় তবে অন্যান্য জীবের সংখ্যা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে শীঘ্রই বাড়তি জীবের সংখ্যা কমে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে।

৭. কোনটি দ্বিতীয় স্তরের খাদক?

ক. ২

খ. ৩

গ. ১ ও ৩

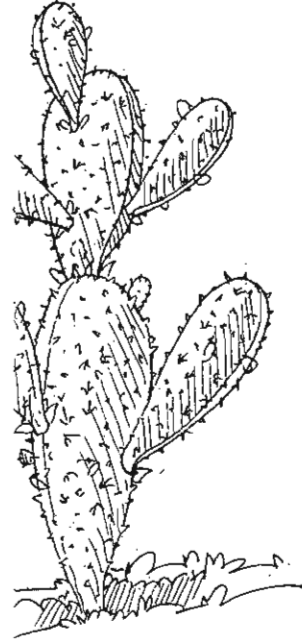
ঘ. ২ ও ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্র A



চিত্র B

ক. B চিত্রটি কী ধরনের উদ্ভিদ?

খ. B চিত্রের উদ্ভিদের পাতাগুলো স্বাভাবিক নয় কেন?

গ. মরুভূমিতে A চিত্রের উদ্ভিদ কেন জন্মায় না ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A ও B চিত্রের উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণকারী অঙ্গের তুলনা কর।

২. সাদমান গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা-মার সাথে খুলনায় দাদার বাড়ি বেড়াতে গেল। দাদা বাড়ি থেকে ওরা একদিন সুন্দরবন বেড়াতে যায়। এই ভ্রমণে জায়গায় জায়গায় অকাতরে গাছ নিধনের চিহ্ন দেখে তার মন খারাপ হলেও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে ওখানে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় উদ্ভিদ, নানা প্রজাতির পাখি এবং রং বেরং এর কীটপতঙ্গ দেখতে পেল। সে বাঘ দেখতে না পেলেও বাঘের গর্জন শুনছিল এবং হরিণও দেখেছিল। সুন্দর বনের এসব কিছু দেখে তার বাস্তুসংস্থানের কথা মনে পড়লো।

ক. উপরে কী ধরনের বাস্তুসংস্থানের কথা বলা হয়েছে?

খ. উক্ত বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক ছোট উদ্ভিদ কেন?

গ. উক্ত বাস্তুসংস্থানে বর্ণিত দুটি প্রাণীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অকাতরে গাছ নিধনে উক্ত বাস্তুসংস্থানের কী প্রভাব পড়বে- আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বন ও পরিবেশ

প্রাকৃতিক উপায়ে আপনা হতে যখন ছোটবড় বৃক্ষলতা ও গাছপালা জন্মে বিস্তীর্ণ এলাকাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে তখন সে বিস্তীর্ণ এলাকাকে আমরা বনভূমি বলি। যেমন, সুন্দরবন। এ বনভূমি প্রকৃতির দান। অবশ্য প্রাকৃতিক উপায়ে গড়ে ওঠা বনভূমি ছাড়াও মানুষের প্রচেষ্টায় বিস্তৃত এলাকায় বৃক্ষ আচ্ছাদন গড়ে উঠতে দেখা যায়। এগুলোকে কৃত্রিম বন বা বাগান বলে। যেমন, কক্সবাজারের রামুর রবার বন বা বাগান। বনভূমি হতে প্রাপ্ত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলে। তা ছাড়া বনভূমিতে বৃক্ষলতা ছাড়াও নানা জাতের কীটপতঙ্গ, পশু পাখি বাস করে। বনে বৃক্ষলতা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি মিলে বনজ পরিবেশ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের বনভূমি হতে কাঠ, বাঁশ, বেত, ফলমূল, মধু, মোম ইত্যাদি পাওয়া যায়।

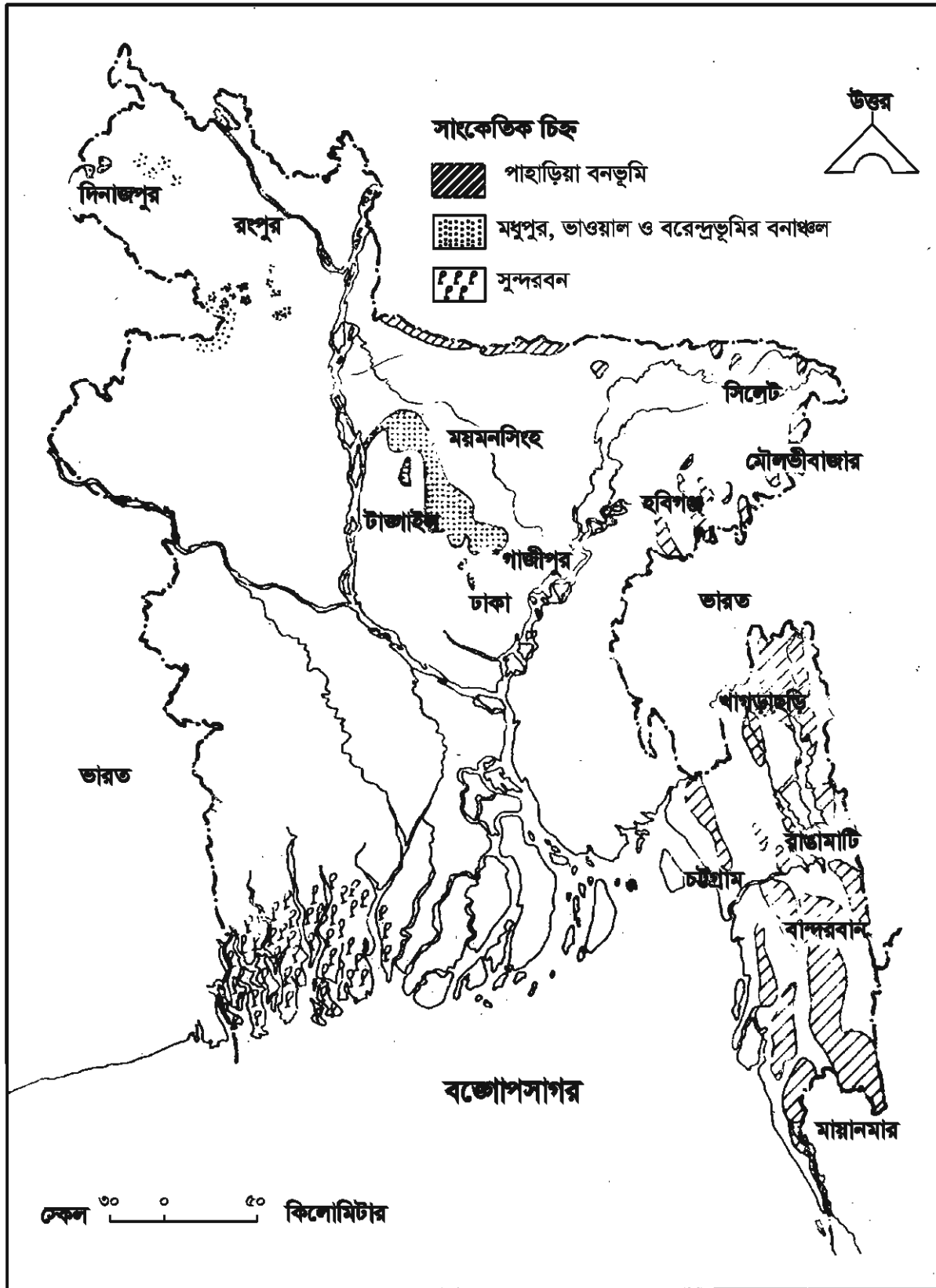
ক. বাংলাদেশের বনের শ্রেণীবিভাগ

যে কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এর মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চলে আবৃত থাকতে হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ছিল ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৩.৬ ভাগ বনভূমি। আসলে ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলে এ হার প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ বনভূমি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের অবস্থান মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখানো হল। বনের অবস্থান, মাটি, জলবায়ু ও বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন,

- ১। পার্বত্য বনভূমি বা পাহাড়ি বন।
- ২। ম্যানগ্রোভ বা লোনা পানির বন বা জোয়ার ভাটার বন।
- ৩। ভাওয়াল-মধুপুর ও বরেন্দ্র ভূমির বনাঞ্চল।
- ৪। অন্যান্য বন।

১। পার্বত্য বনভূমি বা পাহাড়ি বন : বাংলাদেশের পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৩.৬ লক্ষ হেক্টর। এ পাহাড়ি বনভূমি দেশের মোট বনভূমির অর্ধেকের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা জুড়ে রয়েছে এ বন। এখানে প্রায় ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং উষ্ণতা ৩৪° সেলসিয়াস। এ বনভূমিতে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী উভয় প্রকার বৃক্ষ দেখা যায়। পাহাড়ি বনের কোনো কোনো বৃক্ষ প্রায় ৩০.৪৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সমাবেশ এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বনভূমিতে চাপালিশ, তেলসুর, গর্জন, জাবুল, মেহগনি, কড়ই, গামার, ছাতিম, শিমুল, মহুয়া, সেগুন, শিশু, বাঁশ, বেত, তেজপাতা, পাম ও রাবার জন্মে।

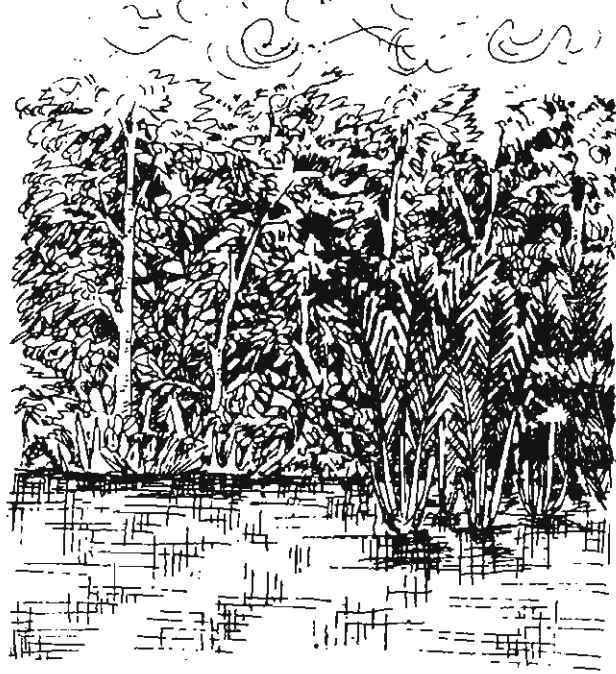
তা ছাড়া পাহাড়ি বনাঞ্চলে হাতি, ভালুক, বানর, বাঘ, বন্যশূকর, বনমোরগ ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায় এবং এ বনে আরও রয়েছে হাজারো রকমের পাখি। এ সব এলাকার বনভূমির ওপর ভিত্তি করে কর্ণফুলী পেপার মিলস, সিলেট পেপার এন্ড পাল্প মিলস কর্ণফুলী রেয়ন মিলস এবং বেত ও বাঁশের ওপর ভিত্তি করে সিলেটে কুটির শিল্প কারখানা গড়ে উঠে।



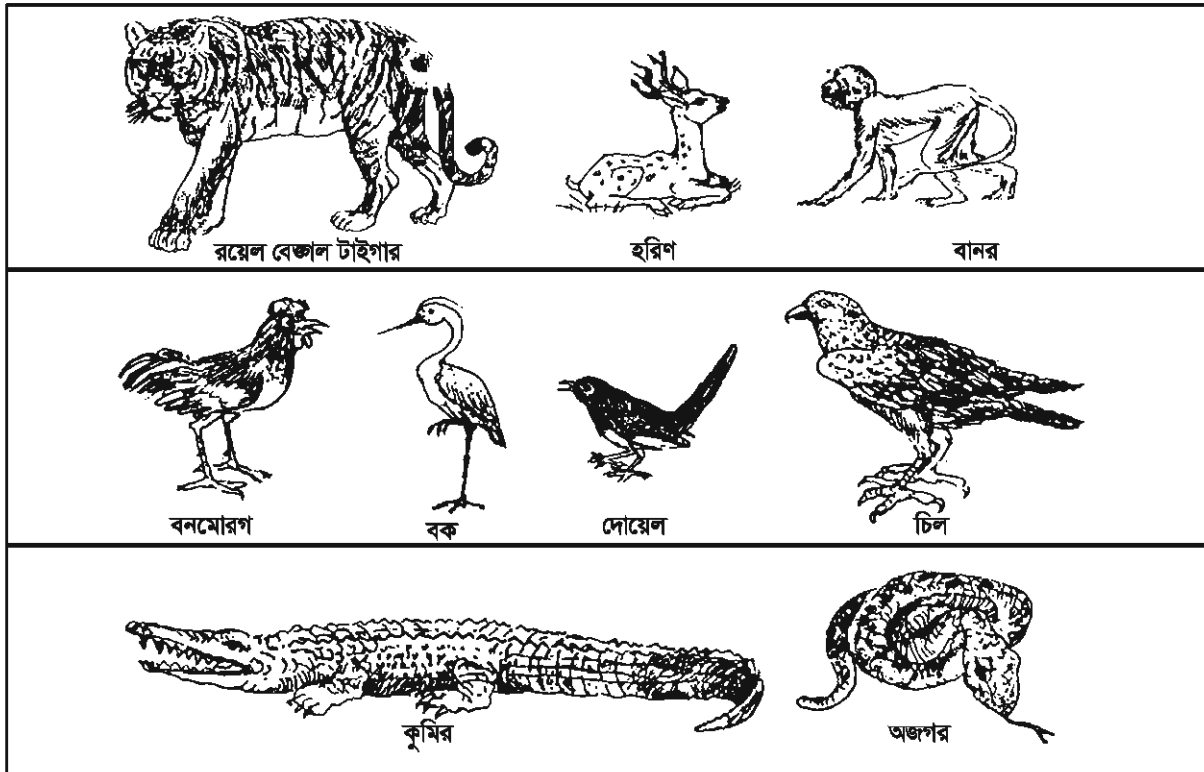
চিত্র ১৮.১ : মানচিত্রে বাংলাদেশের বন এলাকা

২। **ম্যানগ্রোভ বা লোনা পানির বন** : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্র উপকূলের লোনা পানির বনভূমির নাম ম্যানগ্রোভ। এ বনভূমি বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বনভূমি। এ বিখ্যাত বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এ বন সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার ৬,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার এবং বরগুনা ও পটুয়াখালি জেলার ৬২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে।

সুন্দরবনের পূর্বে বালেশ্বর এবং পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী। এ বনের বৈশিষ্ট্য দেশের অপরাপর গাছ থেকে আলাদা। সুন্দরবনের গাছে শ্বাসমূল নামে এক ধরনের মূল রয়েছে। এ মূলের সাহায্যে গাছ গ্যাস বিনিময় করে থাকে। সুন্দরী এ বনের প্রধান বৃক্ষ। প্রতিদিন জোয়ারের সময় এ বনভূমি লোনা পানিতে প্রাণিত হয়। সুন্দরবনে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, ধুন্দল, পসুর, কেওড়া, ওড়া, আমর, বাইন, কাকরা ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মে। গোলপাতা সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য গাছ। এ গাছের পাতা ঘরের চালা ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সুন্দরবনে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। সাধারণত এপ্রিল হতে জুন মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ বনে পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার



চিত্র ১৮.২ : সুন্দরবন এলাকার কিছু উদ্ভিদ



চিত্র ১৮.৩ : বিভিন্ন প্রজাতির পশু ও পাখি

বাস করে। সে সঙ্গে পশু সম্পদের মধ্যে আরও রয়েছে সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ, বানর, বন্যশূকর, অজগর, কুমির এবং নানা প্রজাতির পাখি।

৩। ভাওয়াল-মধুপুর ও বরেন্দ্র ভূমির বনাঞ্চল : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার ৮৭৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ভাওয়াল-মধুপুর গড় এলাকা বিস্তৃত। এ বনের পূর্বে বানার ও পশ্চিমে বংশী নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমি লাল মাটির এলাকা জুড়ে অবস্থিত। শীতকালে প্রয়োজনীয় তাপ ও বৃষ্টিপাতের অভাবে এ বনের বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। এ বনে শাল, গজারি, জাবুল, কড়ই, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। বর্তমানে ভাওয়াল গড়ে রবার, আকাশমণি, অর্জুন ইত্যাদি গাছের চারা রোপন করা হচ্ছে। তা ছাড়া ভাওয়াল ও মধুপুর গড়ে সজাবু, বন বিড়াল, বানর, লেমুর, খেক শিয়াল, বাঘডাসা ও নানা রকমের পাখি দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি এলাকার কিছু অংশে বন রয়েছে এবং এর পরিবেশ প্রায় মধুপুর বনের মত। এ বনে শাল, তালগাছ ইত্যাদি জন্মে।

৪। অন্যান্য বন : ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ইত্যাদি জেলার সমতল ভূমি মিলে এ বনাঞ্চল। এ বনের পরিমাণ আনুমানিক ১.২ লক্ষ হেক্টর। এ ছাড়া বাংলাদেশের কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র আয়তনের বন আছে।

খ. বনজ সম্পদের ব্যবহার

জ্বালানি, মড, কাগজ, দিয়াশলাই, রেয়ন, জাহাজ, লক্ষ, নৌকা, ঘরের খুঁটি, হার্ডবোর্ড, পুল, সাঁকো আসবাবপত্র ও অন্যান্য অনেক শিল্পের কাঁচামাল এবং ওষুধ হিসেবে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়। মৌমাছি বনে মৌচাক তৈরি করে এবং বেশির ভাগ মধু ও মোম বন থেকে পাওয়া যায়।

গ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদের গুরুত্ব

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক হিসেবে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনভূমি কী উপায়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

- ১। বনভূমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ - ঝড়, তুফান, বন্যা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।
- ২। বনপ্রাণীর নিরাপদে বেঁচে থাকা এবং বংশবিস্তারে বনভূমি সহায়তা করে।
- ৩। বন বায়ুপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৪। বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- ৫। আবহাওয়া শীতল রাখে ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়তা করে।
- ৬। বনের গাছপালা বায়ুর অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বাড়িয়ে বায়ু নির্মল রাখে।
- ৭। খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- ৮। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

ঘ. বনজ সম্পদ সংরক্ষণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনজ সম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দিন দিন প্রাকৃতিক বন কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে এর প্রসার করা দরকার।

বনজ সম্পদের প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে

- ১। পতিত জমিতে পরিবেশকে ভালো করে এমন বৃক্ষাদির চারা রোপণ করে বনভূমি তৈরি করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- ২। সরকার বনজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন-
 - (ক) বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন সিলেট জেলায় একটি বন বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।
 - (খ) চট্টগ্রামে একটি বনজ সম্পদ পরীক্ষাগার স্থাপন করেছে।
 - (গ) কক্সবাজারের বনাঞ্চলে টেঁড়পাতা ও রবার চাষের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।
 - (ঘ) রামু, রাউজান, ফটিকছড়ি ও মৌলভীবাজারের রশিদপুরে রবারের চাষ করা হচ্ছে।
 - (ঙ) রাঙামাটি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের মধুপুরের বনাঞ্চলে রবার চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

- ৩। সরকার জনসাধারণকে বনায়নে আকৃষ্ট করার জন্য সামাজিক বনায়ন (কমিউনিটি ফরেস্ট প্রকল্প) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
 ৪। বৃক্ষরোপণ মৌসুমে সরকারি নার্সারী থেকে নামমাত্র মূল্যে জনসাধারণকে বৃক্ষ ও ফলের চারা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে।
 ৫। সরকার নির্বিচারে বৃক্ষ ও প্রাণী নিধন রোধকল্পে বন ও বনপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ বন আইন ১৯৯০ এবং বনপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ কঠোরভাবে অনুসরণ করেছে। এ আইন অমান্যকারীকে কমপক্ষে ১ বছরের জেলসহ ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং উর্ধ্বে ২ বছরের জেলসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে।

অনুশীলনী

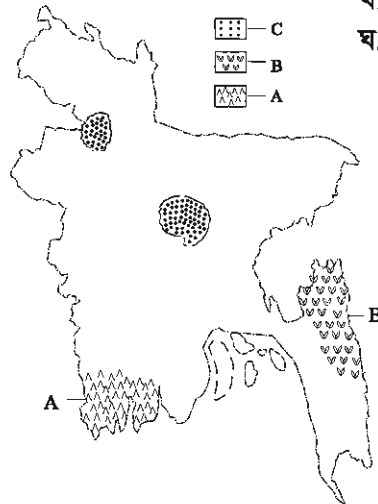
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- প্রাকৃতিক বন কোনটি?
 ক. সুন্দরবন
 গ. জাতীয় উদ্যান
 খ. রামুর রাবার বন
 ঘ. মিরপুর উদ্যান
 - পাহাড়ি বনভূমির
 i. বৃক্ষগুলো চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী ধরনের
 ii. বৃক্ষের পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য
 iii. বৃক্ষের পাতা দিয়ে ঘরের চালা তৈরি হয়
- নিচের কোনটি সঠিক ?
 ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii
- ভাওয়াল মধুপুরের বনের মত বাংলাদেশের অন্য বন হল -
 i. সিলেটের কমলা বাগান
 ii. উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি
 iii. সুন্দরবন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- টেল্ডু পাতার বনভূমি কোথায় সৃষ্টি করা হয়েছে?
 ক. বান্দরবানে
 গ. সিলেটে
 খ. রামগড়ে
 ঘ. কক্সবাজারে

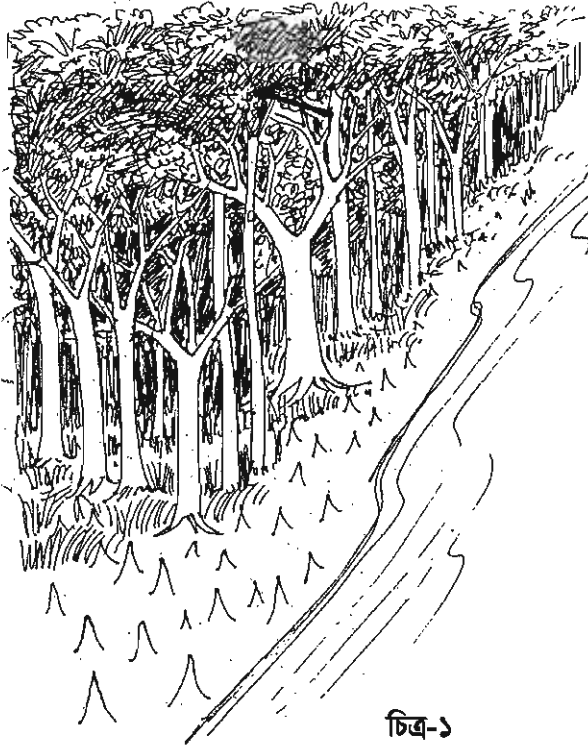
সৃজনশীল প্রশ্ন :



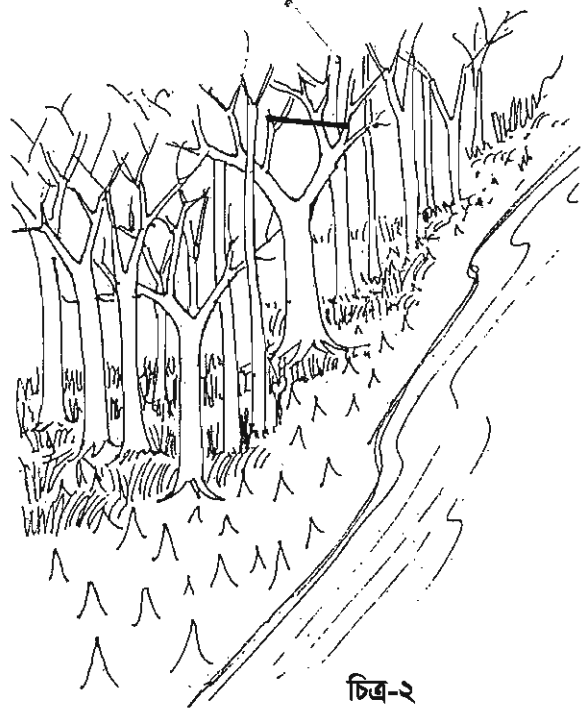
চিত্র- বাংলাদেশের বনাঞ্চল

১. ক. A চিহ্নিত বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলো কী ধরনের?
 খ. B চিহ্নিত স্থানে কাগজের মিল গড়ে উঠেছে কেন?
 গ. A চিহ্নিত বনাঞ্চলের বনসম্পদ কমে গেলে আমাদের দেশে এর কী প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যই A অঞ্চলের বনাঞ্চল অন্যটি থেকে আলাদা-আলোচনা কর।

২.



চিত্র-১



চিত্র-২

- ক. ১ নং চিত্রের গাছগুলো বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলে দেখা যায়?
- খ. ২ নং চিত্রে বনের অবস্থা এরকম হলো কেন?
- গ. ১ নং বনাঞ্চলের আয়তন বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা কতভাগ নির্ণয় কর।
- ঘ. ১ নং বনাঞ্চলের সাথে পাহাড়ি বনাঞ্চলের তুলনা কর।

উনবিংশ অধ্যায়

শক্তি, জীব ও প্রাকৃতিক সম্পদ

শক্তি কথাটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। শক্তি বলতে শুধু শরীরের বলকেই বোঝায় না, খেলায় মাঠের দক্ষ খেলোয়াড়, ভাল গায়ক, বিশিষ্ট শিল্পী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, যিনি সাধারণের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো কিছু প্রদর্শন করেন আমরা বলি তাদের শক্তি আছে। যে কোনো কাজ করতে গেলেই শক্তির প্রয়োজন। আমাদের শক্তি আছে বলেই আমরা নানা কাজে করতে পারি। শক্তি আছে বলেই গরু, ঘোড়া, ইত্যাদি প্রাণী এবং নানা রকম যন্ত্র কাজ করে।

খাদ্য, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা শক্তি পেয়ে থাকি। কল কারখানা চালিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে শক্তির প্রয়োজন। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের সাথে সাথে শক্তিকে নানা ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। যে ব্যক্তি বা জাতি বিভিন্ন শক্তিকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যক্তি বা জাতিই প্রকৃত শক্তিশালী। কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইত্যাদি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে মানুষ শক্তির বিকল্প উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। খাদ্য আমাদের দেহের শক্তি যোগায়। শক্তি দেহের তাপ সংরক্ষণ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার শক্তি আমরা কাজে লাগিয়ে থাকি। এ মহাবিশ্বে শক্তি নানারূপে বিরাজ করছে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির যে কয়টি রূপ দেখতে পাই তা হল :

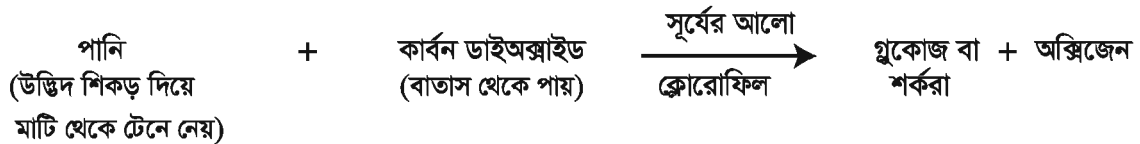
(১) রাসায়নিক শক্তি (২) যান্ত্রিক শক্তি (৩) তড়িৎ শক্তি (৪) তাপ শক্তি (৫) আলোক শক্তি (৬) চুম্বক শক্তি (৭) শব্দ শক্তি (৮) পারমাণবিক শক্তি (৯) সৌরশক্তি।

সৌরশক্তি

আমাদের পৃথিবীতে সমগ্র শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। সৌরশক্তির প্রধান উপাদান হল তাপ ও আলো। এ দুইটি জীবনের জন্য অপরিহার্য। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলোকশক্তি আসে সূর্য থেকে। এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ দেহে বায়ু থেকে প্রাপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে তুলে নেয়া পানি মিলে শর্করা বা গ্লুকোজ তৈরি হয়। মানুষ ও সমস্ত প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, ফল ইত্যাদি অঙ্গে জমা থাকে। উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত এ শক্তি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আমরা শক্তি পেয়ে থাকি।

জীব তার প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সৌরশক্তি থেকে পায়

মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সৌরশক্তি থেকে পেয়ে থাকে। প্রথমে খাদ্যের কথাই ধরা যাক। উদ্ভিদ দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে।



মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। উদ্ভিদ যে খাদ্য প্রস্তুত করে তা তার কাণ্ডে, মূলে, বীজে ও ফলে পুঁজি করে রাখে। আর তা খেয়ে প্রাণী জীবন ধারণ করে। তাই দেখা যাচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। আর সকল প্রকার খাদ্য প্রস্তুতের মূল উৎস হল সূর্য।

খাদ্যের পরেই জ্বালানির কথায় আসা যাক। কিছুদিন পূর্বেও কয়লা ছিল অন্যতম জ্বালানি। আমাদের দেশের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত জ্বালানিই কিন্তু পরোক্ষভাবে উদ্ভিদজাত পদার্থ। পূর্বেই বলেছি উদ্ভিদে সৌরশক্তি সঞ্চিত থাকে। কাঠ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি যখন পোড়ানো হয় তখন এ সবের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বের হয়ে আসে। এভাবে দেখা যায় আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, জ্বালানি সবই পেয়ে থাকি সৌরশক্তি থেকে।

সূর্য পৃথিবীকে তাপ দিয়ে উষ্ণ করছে, ফলে পৃথিবী প্রাণীর বসবাসের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবী সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপ সঞ্চয় করে রাখে এবং বায়ুমণ্ডলে তা ছেড়ে দেয়। ফলে বায়ু উষ্ণ ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং সৃষ্টি হয় বায়ুশূন্যতার। চারদিক থেকে বায়ু দ্রুত বেগে ছুটে এসে বায়ুশূন্যতা পূরণ করে। এভাবে সৌরশক্তির প্রভাবে পৃথিবীতে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

সূর্য থেকে তাপ প্রাপ্ত হয়ে হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। এ পানি বৃষ্টি অথবা বরফরূপে নেমে এসে পাহাড়ে অথবা নদীতে পড়ে। আমরা আবার বিশুদ্ধ পানি পাই।

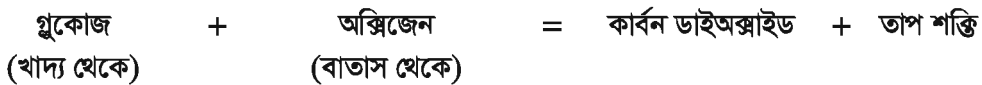
সুতরাং আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি পৃথিবী নামক এ গ্রহে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল শক্তি আমরা সূর্য থেকে পেয়ে থাকি। এ পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বের জন্য চারটি প্রধান প্রক্রিয়া দরকার।

(১) সূর্য থেকে অবিরাম শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের জন্য সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসার পথে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হলে প্রাকৃতিক নিয়মে যে চক্র অনুষ্ঠিত হয় তা বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।

(২) চারটি প্রধান জৈব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রূপান্তর চক্র সৌরশক্তির কারণে সফলভাবে চলতে থাকা। এ চক্রগুলো হল : পানি চক্র, অক্সিজেন চক্র, কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র এবং নাইট্রোজেন চক্র।

(৩) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে সূর্যের আলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করে সে প্রক্রিয়াকে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলে। আমরা জানি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এখন তোমরা ভেবে দেখ পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্বের জন্য গাছ লাগানো এবং বন ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা কত প্রয়োজন। উদ্ভিদ মানুষকে শুধু খাদ্যদ্রব্যই সরবরাহ করে না, বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ, পানীয়, মসলা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও আমরা উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি।

(৪) উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের কোষে খাদ্যের সাথে অক্সিজেন মিলিত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। বিক্রিয়াটি হল :



এ প্রক্রিয়াকে শ্বসন প্রক্রিয়া বলে। এ প্রক্রিয়ার ফলে দেহের বৃদ্ধিসাধন হয় এবং দেহ শক্তি পায়।

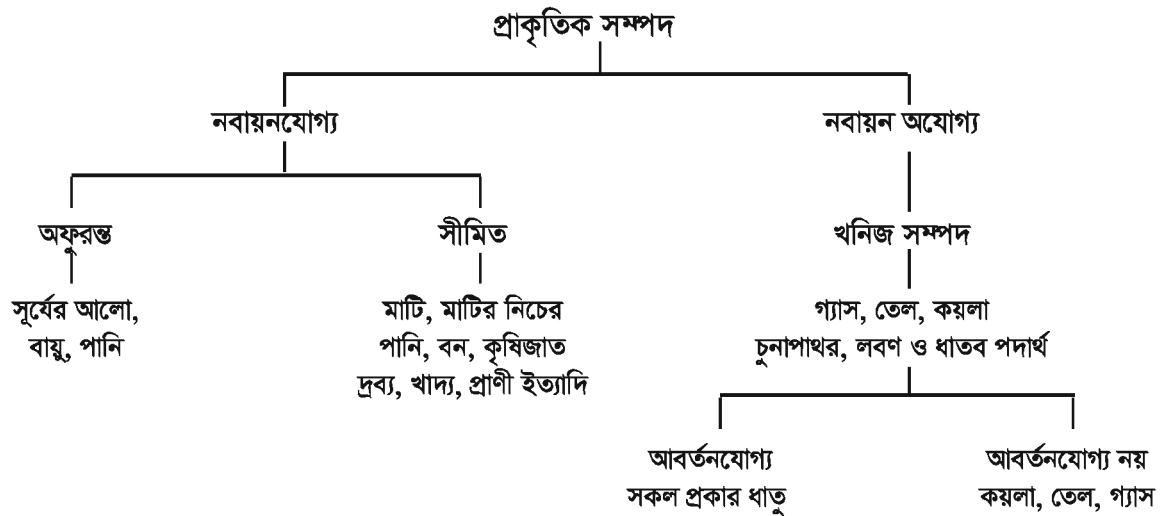
ওপরের এ চারটি মৌলিক কর্মকাণ্ডের প্রধান শক্তি হল সৌরশক্তি। এ পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের জন্য সৌরশক্তির কত প্রয়োজন তা তোমরা এখন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছ।

মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

গৃহবাসী আদিম মানুষ অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করত, তাদের জীবনের চাহিদাও খুব সীমিত ছিল। সে সময় নির্মল বায়ু ও বিশুদ্ধ পানির প্রাচুর্য ছিল। মানুষের চাহিদা খাদ্য ও বাসস্থানের মধ্যে সীমিত ছিল। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার বিকাশ ঘটে, মানুষের জীবনের চাহিদা বেড়ে যায়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষের আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত করেছে এবং পৃথিবীর জনসংখ্যাও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। বাড়তি জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের জন্য তৃণভূমি ও বনাঞ্চল উজাড় করে কারখানা গড়ে উঠছে। কল-কারখানা চালনা ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম চালানোর জন্য স্থাপন করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারখানা ও মোটর যানের ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করছে। পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে বন ও উদ্ভিদ উজাড় হচ্ছে। আবার অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান যেমন- বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদির দূষণ হচ্ছে। ফলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা যেন হুমকির সম্মুখীন। জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

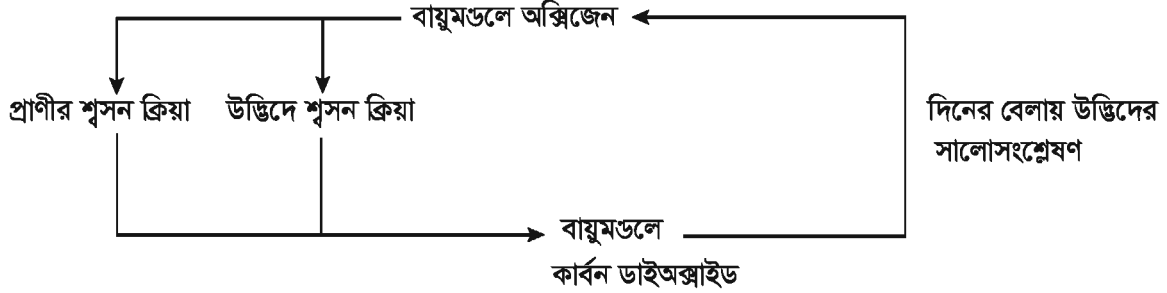
প্রকৃতি থেকে আমরা যা কিছু পাই সেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতিতে রয়েছে বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, নানা প্রকারের খনিজ পদার্থ যেমন- গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি। এগুলো সবই আমাদের জীবনে নানা কাজে লাগে। তাই এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ। সূর্যের আলোও কিন্তু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীর বুকে প্রাণী জীবন রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদকে নবায়নযোগ্য (Renewable) এবং নবায়ন অযোগ্য (Non Renewable) এ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।



নবায়নযোগ্য সম্পদ

ওপরের চার্টে দেখা যায় সূর্যের আলো, বায়ু পানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক উপায়ে রূপান্তর চক্রের মাধ্যমে বারবার নবায়ন হতে থাকে। এ চক্রের যে কোনো একটি বন্ধ থাকলে আমরা মারা যাব। জীবন ধারণের জন্য এ রূপান্তর চক্র হলো মৌলিক। আগেই বলেছি সৌরশক্তির প্রধান উপাদান হল তাপ ও আলো। সূর্যের আলো ও তাপের ফলেই

পানি, সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার চক্রগুলো চলতে থাকে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন উদ্ভিদে খাদ্য তৈরি হয়, অন্যদিকে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন তৈরি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং বায়ুমণ্ডলের পরস্পরের মধ্যে অক্সিজেনের এ চক্রকে অক্সিজেন চক্র বলে।



আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ০.০৩৬ ভাগ। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করতে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে। প্রাণী খাদ্য হিসেবে গাছ-পালা খায় এবং নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদও নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এ চক্রাকার প্রক্রিয়াকে কার্বনচক্র বলে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের পরিমাণও বাড়ছে। বাড়তি মানুষের আবাসস্থল নির্মাণের জন্য ও বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য বন উজাড় করে ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। আবাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। বন উজাড় করার ফলে সালোকসংশ্লেষণ কম হচ্ছে ফলে অক্সিজেন কম তৈরী হচ্ছে। গাছপালা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে যে খাদ্য তৈরি করত তা কম হচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন উদ্ভূত থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া মানুষ প্রচুর কলকারখানা তৈরি করেছে। কলকারখানায় জ্বালানী পুড়ে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। কাজেই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। প্রাণীর পরিবেশে ও জীবনে এ অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে।

তোমরা লক্ষ করেছ মানুষের জীবনের সাথে গাছ গাছড়ার মরা বাঁচার সম্পর্ক। যান্ত্রিক সভ্যতা যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সকল যুগেই থাকবে। এ কারণে উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন। উদ্ভিদ সংরক্ষণ না করলে প্রাকৃতিক নিয়মে যে কার্বনচক্র, অক্সিজেনচক্র, নাইট্রোজেন চক্র ইত্যাদি ঘটে তা বিঘ্নিত হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, পরিবেশকে সুন্দর দূষণমুক্ত রাখার জন্য কোনো দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ ৭ থেকে ৯ ভাগ এবং বাড়ির আঙিনা ও রাস্তার পাশের গাছ মিলিয়ে মাত্র ১৬ ভাগ। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই বেশি করে গাছ লাগানো উচিত।

মাটি সংরক্ষণ

আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাটির ওপর নির্ভরশীল। মাটিতে জন্মানো গাছপালা থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য আসে। আমাদের বস্ত্র, আসবাবপত্র, কাগজ ওষুধ প্রভৃতি নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির উৎস উদ্ভিদ। উদ্ভিদের জীবনে প্রধান সহায় মাটি। এ জন্য মাটি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাতাস ও পানি ওপরের মাটি অপসারণ করে মাটির ক্ষয়সাধন করেছে। বাতাস মাটি উড়িয়ে নেয়, বৃষ্টি, নদীর পানি তা ধুয়ে নেয়। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াকে মাটি ক্ষয় বলে। ক্ষয় হলে উর্বর মাটি অনুর্বর মাটিতে পরিণত হয়। ফলে বিপুল

পরিমাণ ভাল জমি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ বন জঙ্গল, গাছপালা কেটে ফেলে ভূমির ক্ষয় সাধন করছে। সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে মাটির ক্ষয় রোধ করা যায়।

- (১) প্রবাহমান পানি ও বায়ুর পথে বাধা সৃষ্টি করা।
- (২) স্বাভাবিক নিয়মে মাটির ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেওয়া।
- (৩) মাটিতে বেশি করে গাছ লাগানো ও তৃণভূমির সৃষ্টি করা।

উদ্ভিদ নানাভাবে মাটি ক্ষয়রোধ করে। মাটিতে তৃণ, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা থাকলে বৃষ্টির পানি মাটি ক্ষয় করতে পারে না। উদ্ভিদের শিকড় মাটির ভিতর প্রবেশ করে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। ফসলের গাছগুলোর গোড়া মাটিতে রেখে দিলে ভূমি ক্ষয় কমে ও জমি উর্বর হয়। জমির ধারে ঢালু জায়গায় ঘাস, ধনচে ও অন্যান্য গাছপালা লাগানো উচিত। ঘাস ও অন্যান্য তৃণ বড় হয়ে মাটির ওপর একটি আবরণের সৃষ্টি করে। মাটি সংরক্ষণের জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। যেমন, একেবারে মাটি ঘেষে মাঠের ঘাস কাটা উচিত নয়। গরু, ছাগল, ভেড়া যেন মাটির স্বাভাবিক আচ্ছাদন সমূলে খেয়ে না ফেলে। বনের গাছপালা হিসাব করে কাটা উচিত। যাতে করে বিস্তীর্ণ এলাকা অনাচ্ছাদিত না থাকে। নতুন গাছ লাগিয়ে মাটি ক্ষয়রোধ করা উচিত। মাটিতে হিউমাস বা গোবর সার, খইল, কম্পোস্ট ইত্যাদি প্রয়োগ করে মাটির ক্ষয় কমানো হয়। সার ও হিউমাসযুক্ত মাটি চোষ কাগজের মতো পানি চুষে নিতে পারে। মাটিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে ভাল ফসল হয় না। এ ছাড়া রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী পোকামাকড় মরে যায়। এতে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষ করা উচিত। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করলে উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। কারণ একই ধরনের ফসল মাটি থেকে একই ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে মাটিকে অনুর্বর করে থাকে।

মাটি ক্ষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকলে জমি কখনও অনুর্বর হয় না। কিন্তু একবার মাটি ক্ষয় শুরু হলে তা রোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই, মাটি ক্ষয়ের লক্ষণাদি আমাদের জানা দরকার এবং তা প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

পানি

পানি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের দেশে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর আছে। বর্ষাকালে এগুলো পানিতে ভরা থাকে। বাংলাদেশে পানির এ প্রাচুর্য দেখে মনে হয় পানি অফুরন্ত। কিন্তু শুকনো মৌসুমে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পানির অভাবে কৃষি কাজ দুষ্কর হয়ে পড়ে। লোকজন ও জীবজন্তু পানির অভাবে কষ্ট পায়। শুকনো মৌসুমে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য মাটির নিচের পানি উঠানো হয়। ফলে মাটির নিচে পানির সঞ্চিত ভান্ডার কমতে থাকে, পানির স্তর নিচে নেমে যায়। এ কারণে মাটির নিচের পানি উত্তোলনের জন্য যতবেশি গভীর অগভীর নলকূপ বসানো হবে পানি স্তর ততই নিচে নেমে যাবে। ব্যাপক বনায়ন ও শস্য চাষ আবহাওয়া আর্দ্র রাখে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ায় এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এভাবে মাটির নিচের পানির স্তর সংরক্ষণ করা সম্ভব। নদ-নদী, খাল-বিলের পানি শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে গেলে বর্ষাকালে বৃষ্টির ফলে তা পূরণ হয়। পানি চক্রের কারণে এটা সম্ভব। পানি চক্রের জন্য সূর্যের আলো ও তাপ প্রয়োজন হয়। সাগর, নদী-নালা, গাছপালা থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে বাতাস ভেসে বেড়ায় এ বাষ্প ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। পানির এ চক্রকে পানি চক্র বলে। পানি চক্রের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই পানি বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়।

খনিজ সম্পদ

প্রকৃতির অমূল্য অবদান খনিজ সম্পদ। কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস সবই সৌরশক্তির অবদান। সৌরশক্তি এ সব পদার্থে সঞ্চিত থাকে। জ্বালানি হিসেবে পোড়ালে এ সঞ্চিত শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। খনিজ সম্পদ একটি নবায়ন অযোগ্য (Non Renewable) পদার্থ। অর্থাৎ ব্যবহার করতে করতে এ সম্পদ এক সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই এ সম্পদগুলো যাতে অতি মাত্রায় ব্যবহার না করা হয় সেদিকে আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস একটি মূল্যবান সম্পদ। এ গ্যাস শহরে রান্নার কাজে এবং শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবেও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের হরিপুর গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপজাত হিসেবে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর বড়পুকুরিয়ায় কয়লার সম্পদ পাওয়া গেছে। এ সব অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলনের কাজ এগিয়ে চলছে।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এ সব সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. প্রাকৃতিক গ্যাসে কোন শক্তি সঞ্চিত থাকে?

ক. তাপ শক্তি	খ. আলোক শক্তি
গ. রাসায়নিক শক্তি	ঘ. সৌরশক্তি
২. ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল কোনটি?

ক. কার্বন মনোক্সাইড	খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস	ঘ. হাইড্রোজেন অক্সাইড
৩. একই জমিতে বার বার একই ফসলের চাষ করলে-
 - i. জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায়
 - ii. গাছের জন্য উপযোগী পুষ্টিকর উপাদান কমে যায়
 - iii. জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. কোনটি শক্তির রূপ নয়?

ক. যান্ত্রিক শক্তি

খ. চুম্বক শক্তি

গ. খাদ্য শক্তি

ঘ. তাপ শক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. A. $H_2O + CO_2 \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যের আলো}} \text{গ্লুকোজ} + O_2$

B. $\text{গ্লুকোজ} + O_2 \longrightarrow CO_2 + \text{তাপশক্তি}$

ক. 'A' নং বিক্রিয়াটিকে কী বলা হয়?

খ. 'B' নং বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

গ. 'B' নং বিক্রিয়াটি প্রাণীর শ্বাসকার্যে কীভাবে সহায়তা করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিক্রিয়া দুটির ভূমিকা আলোচনা কর।

২. কাঠ, কাঁচ, লবণ, লোহা, তামা, পানি, বেল, চিনি, চাল, ডাল, সূর্যের আলো, বায়ু, হাঁস মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু, মানুষ, গোবর, কয়লা।

ক. তালিকার সবগুলোকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয় কেন?

খ. তালিকার নবায়নযোগ্য সম্পদকে শ্রেণীকরণ কর।

গ. তালিকায় নবায়ন অযোগ্য সম্পদের একটি চার্ট তৈরি কর।

ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

বিংশ অধ্যায়

মেরুদণ্ডী প্রাণী : মুরগি

আমাদের পরিবেশে আমরা নানা রকম প্রাণী দেখতে পাই। এ সব প্রাণীর মধ্যে গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, কাক, কোকিল, হাঁস, মুরগি, সাপ, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি সবারই মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। এদেরকে মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। আবার তেলাপোকা, কেঁচো, প্রজাপতি ও বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীদেরও আমাদের পরিবেশে সব সময় দেখতে পাই। এ প্রাণীগুলোর মেরুদণ্ড নাই এ জন্য এদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডীদের বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমরা পূর্বের ক্লাসে কিছু জেনেছি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ

আমরা সপ্তম শ্রেণীতে মেরুদণ্ডী প্রাণী ও এদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিশদ জেনেছি। মৎস্যকুলের উদাহরণ হিসেবে রুই মাছ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ ক্লাসে মেরুদণ্ডী প্রাণী মুরগি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে পাঠ অবতারণার জন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হল :

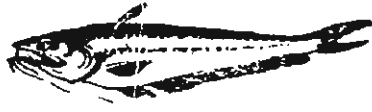
১। **মৎস্যকুল (Pisces) :** এ সব মেরুদণ্ডী প্রাণী সারা জীবন পানিতে বসবাস করে। এদের দেহে জোড় বিজোড় পাখনা আছে যা দিয়ে সাঁতার কাটে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাস কার্য চালায়। অধিকাংশ মাছের গায়ে আইঁশ থাকে। প্রায় সব মাছই ডিম পাড়ে। মৎস্যকুলের মধ্যে রয়েছে রুই, কাতলা, ইলিশ, শোল, বোয়াল, মৃগেল, পাঙ্গাস, পুঁটি, টেংরা, কৈ, শিং, টাকি ইত্যাদি।



কাতল মাছ



রুই মাছ



বোয়াল মাছ



কৈ মাছ



শোল মাছ



মাগুর মাছ



পুঁটি মাছ

চিত্র ২০.১ : মৎস্যকুল

২। **উভচর (Amphibia) :** আমাদের পরিবেশে কিছু কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে যারা স্থলে ও পানিতে বাস করতে পারে তাদেরকে উভচর প্রাণী বলে। যেমন- ব্যাঙ। এ উভচর প্রাণী জীবনের প্রথম দিকে ব্যাঙাচি অবস্থায় কিছুকাল পানিতে কাটায় এবং মাছের মত ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। পরিণত বয়সে কোনো প্রজাতি স্থলে ও কোনো প্রজাতি

পানিতে বাস করে। চামড়া নগ্ন অর্থাৎ চামড়ায় লোম, পালক বা আঁইশ কিছুই থাকে না। এই উভচর প্রাণীর দুই জোড়া পা আছে, পায়ে আঙুল আছে কিন্তু নখ নেই। এরা পানিতে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।



কুনোব্যাঙ

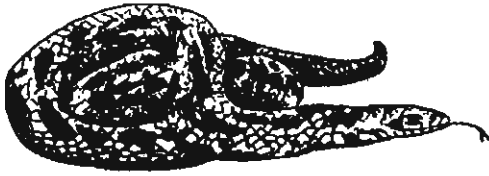


সোনাব্যাঙ

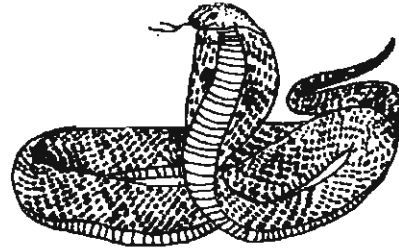
চিত্র ২০.২ : উভচর প্রাণী

৩। সরীসৃপ (Reptilia) : এ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের কিছু সংখ্যক স্থলে এবং কিছু সংখ্যক পানিতে বাস করে। আবার কিছু সংখ্যক প্রজাতি পানিতে ও স্থলে সমানভাবে

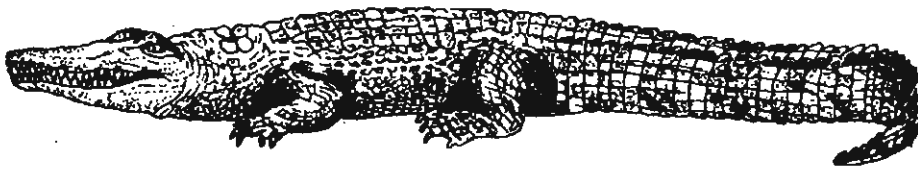
বাস করতে পারে। এ সব মেবুদভী প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে। এদের ফুসফুস আছে। গায়ের চামড়া শুকনো বা শক্ত আবরণে ঢাকা। আঙুল নখরযুক্ত যেমন- কচ্ছপ, টিকটিকি, গুঁইসাপ, সাপ, কুমির ইত্যাদি।



অজগর



পদ্ম গোখরা

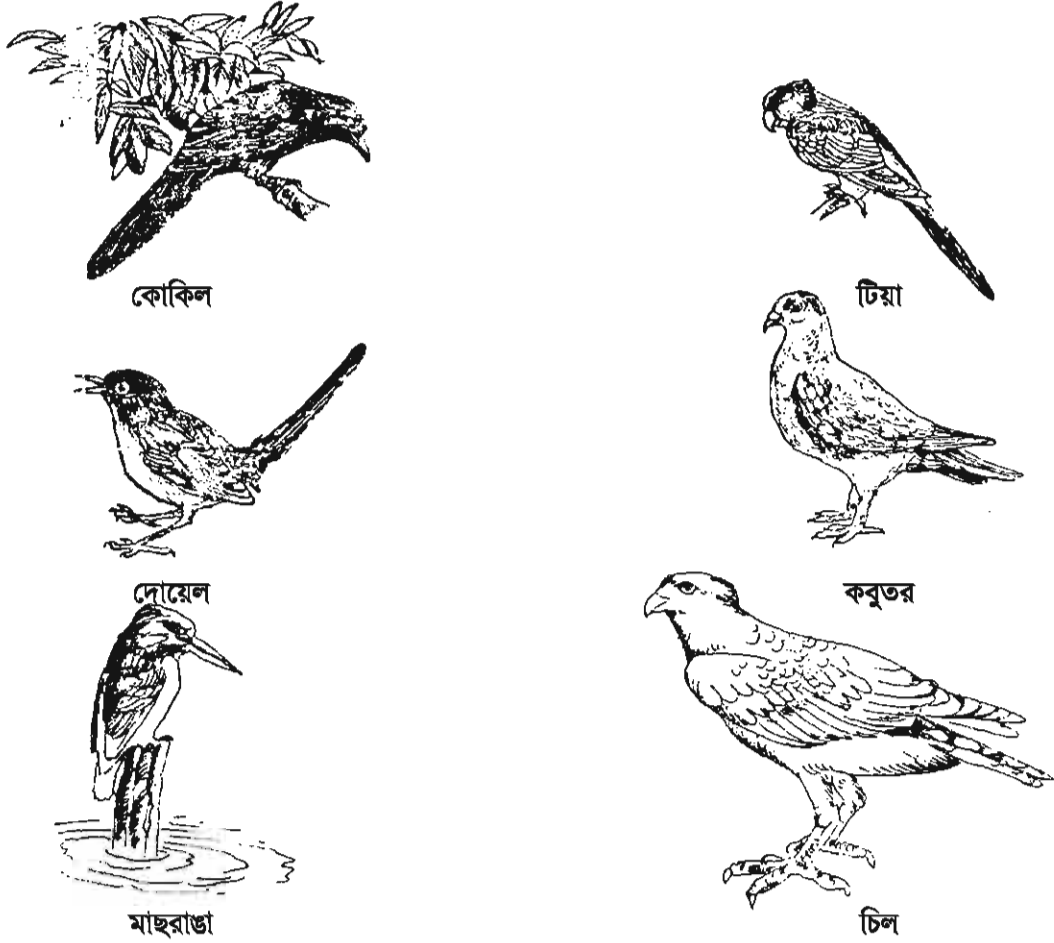


কুমির

চিত্র ২০.৩ : সরীসৃপ

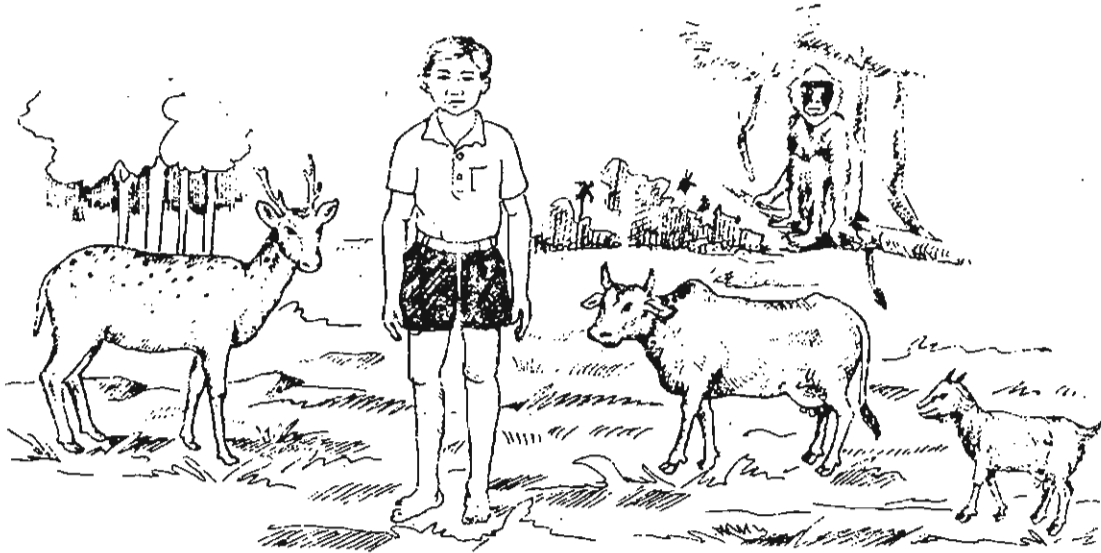
৪। পক্ষীকুল (Aves) : মেবুদভী প্রাণীর মধ্যে আর এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের দেহ পালকে ঢাকা এবং ডানার সাহায্যে উড়তে পারে। ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায় এবং শক্ত ঠোঁট আছে কিন্তু কোনো দাঁত নেই। পাখি ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। এ জাতীয় মেবুদভী প্রাণীকে পাখি বলে। যেমন- হাঁস, মুরগি, কবুতর, চডুই, চিল, টিয়া, শালিক, কাক, কোকিল, মাছরাঙা, ফিঙে ইত্যাদি।

৫। স্তন্যপায়ী (Mammalia) : প্রাণী জগতের সর্বোচ্চ স্তরের মেবুদভী প্রাণী হল স্তন্যপায়ী। এদের দেহ লোমে আবৃত। বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা মাতৃস্তন্য পান করে থাকে। এ স্তন্যপায়ী মেবুদভী প্রাণীর মধ্যে চামটিকা ও বাদুড় আকাশে উড়তে পারে কিন্তু দেহ লোমে ঢাকা। আবার তিমি ও শূশুক পানিতে বাস করে কিন্তু এরা বাচ্চা প্রসব করে ও



চিত্র ২০.৪ : পাখি

বাচ্চাকে স্তন্য পান করায়। তা ছাড়া এদের ফুলকা নেই, ফুসফুস আছে তা দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এ শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে আছে গরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া, বাঘ, বানর ইত্যাদি। মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী।



চিত্র ২০.৫ : স্তন্যপায়ী প্রাণী

মুরগি একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী

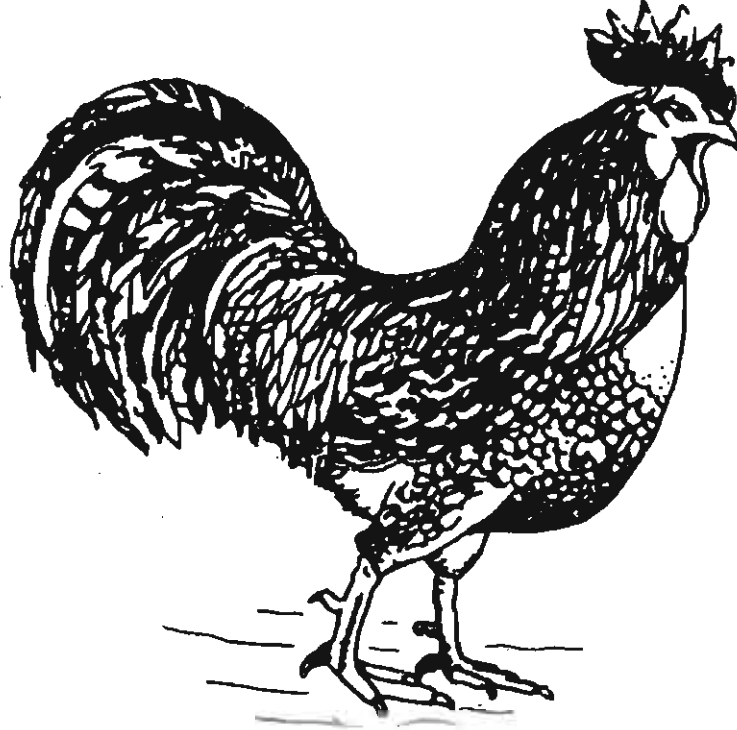
মুরগি : মুরগি পাখি (Aves) শ্রেণীর গৃহপালিত প্রাণী। বাংলাদেশের প্রায় প্রতি বাড়িতেই মুরগি পালন করতে দেখা যায়। মুরগি আমাদের আশিষের অন্যতম উৎস। বর্তমানে বাংলাদেশে মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা ও স্বকর্মসংস্থানের উত্তম উপায়ও বটে। নিম্নে মুরগির বহিঃঅঙ্গসংস্থান ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান আলাদা আলাদাভাবে বিবৃত করা হল :

মুরগির বহিঃঅঙ্গসংস্থান

মুরগির প্রধান বহিঃঅঙ্গ হল (১) মাথা (২) খড় (৩) ডানা (৪) লেজ (৫) পা (৬) পালক ইত্যাদি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কাজ আলোচনা করা হল :

(১) **মাথা :** গলার উপর থেকে ঠোঁটের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশকে মাথা বলে। মাথা চক্ষু, নাক, কান, কানের লতি, মাথার ঝুটি, গলার ফুল, ঠোঁট ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাদ্য খায়, শত্রুকে আঘাত করে, চক্ষু দিয়ে দেখে। কান দিয়ে শুনে সতর্ক হয়।

(২) **খড় :** গলার পর থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত অংশকে খড় বলে।



চিত্র ২০.৬ : মুরগির বহিঃঅঙ্গসংস্থান

(৩) **ডানা :** মুরগির পিঠের সামনের দিকের একটি অঙ্গ হল পাখা। পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাখা দুইটি দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। ডানার অগ্রভাগের পালকগুলো বড়, লম্বা ও শক্ত। প্রতিটি পালকের গোড়া ডানার ত্বকের ভেতরে আবদ্ধ থাকে।

কাজ : ডানার সাহায্যে মুরগি উড়ে থাকে। পোষা মুরগি বেশি দূর উড়ে যেতে পারে না কিন্তু বন মুরগি বেশ উড়তে পারে। ডানা দিয়ে বাচ্চাকে ঢেকে রাখে আবার ডানা দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

(৪) **লেজ :** মুরগির দেহের পেছনের সব অংশ লেজ। মুরগির লেজের পালক স্বাভাবিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে মাটিতে

চলাফেরা করতে এবং উড়ে যেতে সহায়তা করে থাকে। চলার গতি রোধ করতেও লেজ সহায়তা করে থাকে। মুরগির লেজকে পুচ্ছ বলে।

(৫) পা : অন্যান্য পাখির মতো মুরগিরও নিম্নাঙ্গ যেমন- উরু, পাজর, হাঁটু, গোড়ালী আছে। পায়ের গোড়ালী ও পায়ের পাতায় পালক নেই কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ আছে। প্রতি পায়ে চারটি আঙুল আছে এবং আঙুলের অগ্রভাগে ধারাল নখর আছে। পায়ের আঙুলের তলদেশে নরম মাংসপিণ্ড থাকে।

কাজ : পায়ের সাহায্যে মুরগি চলাফেরা করে। পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খাদ্য বের করে থাকে। তা ছাড়া শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে পা দিয়ে আঘাত করে শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়।

(৬) পালক : অন্যান্য পাখিদের মতো পালক মুরগির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুরগির সারা দেহ পালকে আবৃত থাকে। মুরগির দেহে তিন প্রকার পালক দেখা যায়। এর মধ্যে ডানা ও লেজের পালক বড় হয়। ডানার সঙ্গে যুক্ত পালককে ডানা পালক বা রেমিজেন্স বলে। লেজের কাছে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো ১২ টি পালককে পুচ্ছ পালক বা রেট্রিসেস বলে।

কাজ : পালক মুরগির দেহকে রোদ, বৃষ্টি ও আঘাত থেকে রক্ষা করে। দেহের তাপ সংরক্ষণ করে। তবে পালকের প্রধান কাজ হল উড়তে সাহায্য করা। পালক ছাড়া মুরগি উড়তে পারত না।

মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান : মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থানের মধ্যে রয়েছে পেশীতন্ত্র, কঙ্কালতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি।

পেশীতন্ত্র : মুরগির পেশীসমূহের বিন্যাস বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অন্য মেবুদডী প্রাণীদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুরগির প্রধান প্রধান পেশীসমূহ হল- উড্ডয়ন পেশী, পেটোরেলিস মেজর এবং পেটোরেলিস মাইনর।

কাজ : পেশীর সাহায্যে মুরগি দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। শ্বাস - প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি কাজ পেশীর সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

কঙ্কালতন্ত্র : মুরগির অঙ্গসংস্থানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল কঙ্কালতন্ত্র। এদের অস্থি ফাঁপা ও হালকা কিন্তু মজবুত। দেহকে উড্ডয়নে সহায়তা করার জন্য অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া দেহের আয়তন ছোট রাখতে অস্থিগুলো সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অস্থিদের মধ্যে স্টারনাম, সিনসাক্রাম, হিউমারাস, ফিয়ার ও বেডিসমূহ প্রধান।

কাজ : কঙ্কালতন্ত্র মুরগির দেহাকৃতি বজায় রাখে। দেহের অঙ্গসমূহকে ধরে রাখে। মুরগির চলনে কঙ্কালতন্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিপাকতন্ত্র : মুরগির দাঁত নেই। তাই এরা খাদ্য সরাসরি গিলে ফেলে। আর এর জন্যে তাদের পৌষ্টিকনালী কিছুটা ভিন্ন ধরনের। পাকস্থলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ক্রপ রয়েছে। এটি একটি খাদ্যাধার। এর পরের অংশে গিজার্ড নামে থলে রয়েছে। গিজার্ড পেষণকারী অঙ্গ। এখান থেকে খাদ্য পাকস্থলিতে প্রেরণ করা হয়।

মুরগির পরিপাকতন্ত্রের দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এ প্রকোষ্ঠ দুইটির একটি হল গ্রন্থিবহুল এবং অপরটি হল পেশীবহুল। এ পেশী বহুল প্রকোষ্ঠকে গিলা বলা হয়। আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব যে মুরগি খাদ্য গ্রহণকালে মাঝে মাঝে ছোট পাথরের নুড়ি গিলে ফেলে। এ পাথর নুড়িগুলো মুরগির খাদ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সাহায্য করে। খাদ্য যখন পেশীবহুল প্রকোষ্ঠে এসে আলোড়িত হতে থাকে তখন এই নুড়ির ঘর্ষণের ফলে পিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর ক্ষুদ্রান্ত্রে যাবার সময় জীর্ণ খাদ্যবস্তু হতে খাদ্যের সারাংশ রক্তে শোষিত হয় এবং অজীর্ণ ও অসার বস্তু পায়ু পথে বের হয়ে যায়।

রক্তসংবহনতন্ত্র : মুরগির রক্তসংবহনতন্ত্রে রয়েছে-হৃৎপিণ্ড, ধমনীতন্ত্র, শিরাতন্ত্র, কৈশিকনালী, রক্তরস, রক্তের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকা ইত্যাদি। মুরগির হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এ প্রকোষ্ঠ গুলো হলো (১) ডান অলিন্দ (২) বাম অলিন্দ (৩) ডান নিলয় এবং (৪) বাম নিলয়। হৃৎপিণ্ড অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। হৃৎপিণ্ড প্রসারণের সময় দূষিত ও অক্সিজেনবিহীন রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ হতে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে রক্ত পরিশোধিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে আসে। বাম অলিন্দ হতে এ শোধিত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে পরে মহাধমনীতে আসে। মহাধমনীর শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।



চিত্র ২০.৭ : মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান

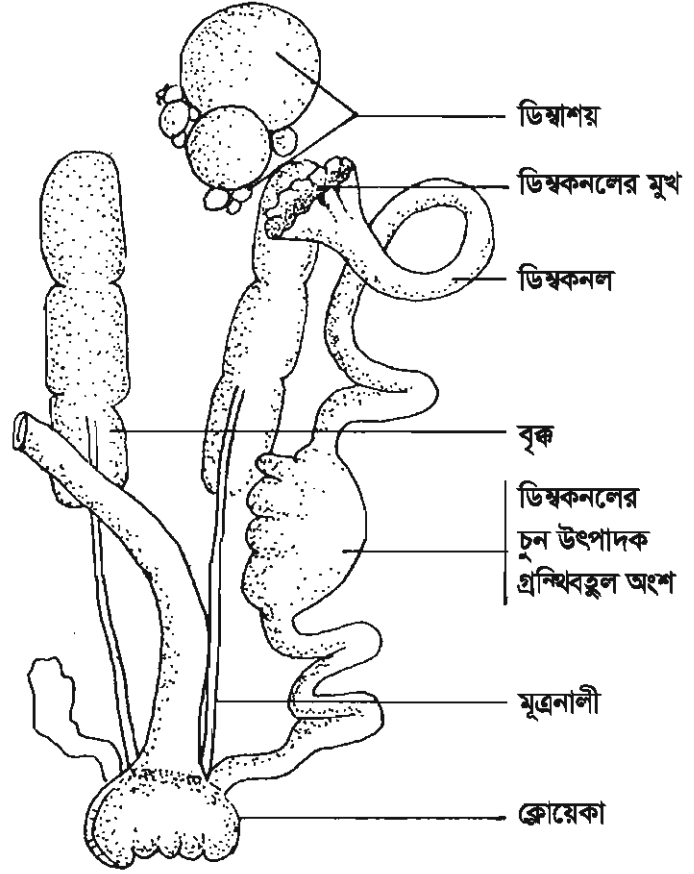
ফুসফুস : মুরগি ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। মুরগির এক জোড়া ফুসফুস বক্ষ পিঞ্জরের পিঠের পিঞ্জরাস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। মুরগির ফুসফুসের একটি বিশেষত্ব হল যে- ফুসফুস থেকে কয়েক জোড়া অতি পাতলা বায়ু থলি বের হয়ে বক্ষ, উদর ও গলা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই বায়ু থলিগুলো শ্বাসনের জন্য অতিরিক্ত বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করায়, এ ছাড়া বেলুনের মতো ফুলে মুরগিকে উড়তেও সাহায্য করে।

ব্রেনচতন্ত্র : মুরগির দেহের ভেতরে পিঠের মেবুদডের সমান্তরাল তিন খণ্ডবিশিষ্ট গাড় বাদামি রঙের দুইটি বৃক থাকে। প্রত্যেকটি বৃক হতে একটি করে মূত্রনালী বের হয়ে ক্রোয়েকায় মিলিত হয়। বৃকের ভেতর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তের দূষিত জলীয় অংশ পৃথক হয়ে মূত্রনালী পথে ক্রোয়েকায় এসে অল্প হতে আগত পানির সঙ্গে বের হয়ে যায়।

প্রজননতন্ত্র : মুরগির বৃকের দুই পাশে দুইটি শুক্রাশয় থাকে। এ শুক্রাশয় থেকে উৎপন্ন শুক্রাণু নিষ্কিপ্ত হয়। মুরগির স্ত্রী প্রজননতন্ত্রে একটি মাত্র ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বাশয়ে প্যাচানো ডিম্বকনল ক্রোয়েকায় এসে মিলিত হয়। ডিম্বাশয়ে খোলা

মুখটি ভাজ বিশিষ্ট দেখতে অনেকটা চুড়ির মত। ডিম্বাশয়ে প্রথমে হলুদ বর্ণের কুসুম উৎপন্ন হয়। কুসুমের আবরণের উপর প্রাণপঙ্ক বেষ্টিত একটি অতি ক্ষুদ্র ডিম্বানু থাকে। কুসুমটি পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ডিম্বকনল দিয়ে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসতে থাকে। কুসুম অ্যালবুমিন নামক সাদা ও আধা তরল পদার্থে পরিবেষ্টিত হয়। এ অ্যালবুমিনই হল ডিমের সাদা অংশ। অতঃপর ডিম্বক নালীর নিচের দিকে চুন উৎপাদন গ্রন্থিবহুল অংশ হতে অ্যালবুমিনের উপর পাতলা পর্দার মত একটি আবরণ পড়ে ডিমের খোসা সৃষ্টি হয়। ডিমের খোসা প্রথমে নরম থাকে পরে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে শক্ত হয়। ডিম্বকনালী হতে ডিম ক্রোয়েকা হয়ে পায়ুপথে নির্গত হয়। মুরগির ডিমকে মুরগির নিচে তা দিয়ে অথবা ডিম ফুটানোর যন্ত্রে রেখে ২১ দিনে ৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের কাছাকাছি রেখে দিলে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

খাদ্য হিসেবে মুরগির ডিমের স্থান দুধের পর। মুরগির মাংস সহজে হজম হয় এবং সকল বয়সের লোক খেতে পারে। বর্তমানে মুরগি পালন স্বকর্মে নিয়োজিত হওয়ার একটি উত্তম উপায়। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে মুরগির মাংস ও ডিম রপ্তানী করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তা ছাড়া মুরগির পালক দিয়ে খেলার সরঞ্জাম ও সৌখিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। মুরগির বিষ্ঠা উত্তম সার। অধিকন্তু মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ২০.৮ : মুরগির রেনচন ও প্রজননতন্ত্র

উন্নত জাতের মুরগি পালন

উন্নত জাতের মুরগির পরিচিতি : সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে চার শ্রেণীর উন্নত জাতের মুরগি রয়েছে। এ সব মুরগি আমাদের দেশের আবহাওয়াতেও ভালভাবে পালন করা যায়। নিম্নে উন্নত জাতের মুরগির নাম, বৈশিষ্ট্য এবং প্রতি জাতের একটির বিবরণ দেওয়া হল।

(ক) আমেরিকান জাত

বৈশিষ্ট্য

- ১। পায়ের নাল পালকহীন
- ২। কানের লতি লাল
- ৩। পায়ের রং হলুদ

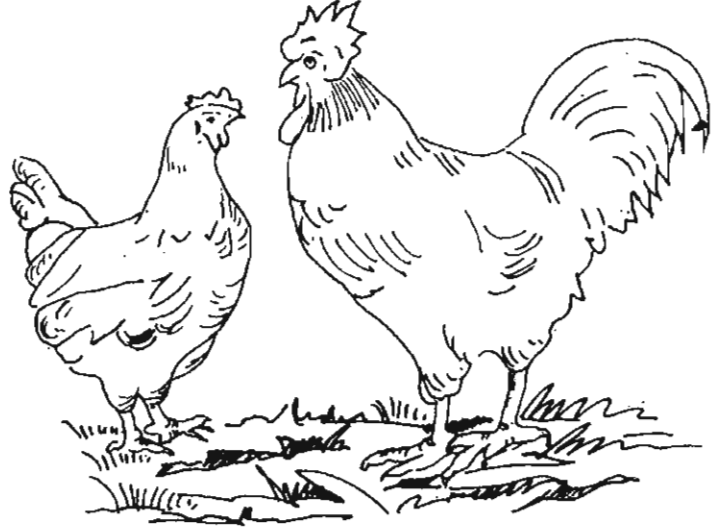
আমেরিকান জাতভুক্ত মুরগির নাম

- ক) রোড আইল্যান্ডরেড (আরআইআর)
- খ) নিউহ্যাম্পশায়ার
- গ) প্লিমাউথ রকস

৪। আকার মাঝারি

৫। ডিমের রং বাদামি

ব্রোড আইল্যান্ডরেড : এ জাতের মুরগি থেকে মাংস ও ডিম বেশি পাওয়া যায়। তাই পালন লাভজনক। গায়ের রং বাদামি লাল। পূর্ণ বয়স্ক মুরগির ওজন ২ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বছরে প্রায় ১৫০টি ডিম দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকে।



চিত্র ২০.৯ : ব্রোড আইল্যান্ডরেড

(খ) ভূমধ্যসাগরীয় জাত

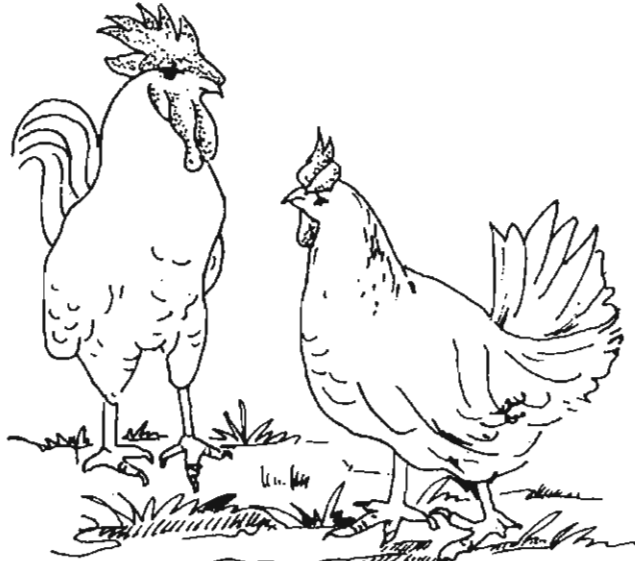
বৈশিষ্ট্য

- ১। পায়েরনালা পালকহীন
- ২। পালক দেহের সঙ্গে বিন্যস্ত থাকে
- ৩। আকারে ছোট ও কম বয়সে ডিম দেয়
- ৪। কুঁচে হয় না
- ৫। গায়ের ও কানের লতির রং সাদা
- ৬। ডিমের রং সাদা এবং ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা উত্তম (লেয়ার)

ভূমধ্যসাগরীয় জাতভুক্ত মুরগির নাম

- (ক) লেগহর্ন
- (খ) মিনরকা
- (গ) এনকোনা

লেগহর্ন : লেগহর্ন- এর মধ্যে অনেক উপজাত আছে তন্মধ্যে হোয়াইট লেগহর্ন- এর ডিম উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক। প্রাপ্ত বয়সের একটি মুরগির ওজন দেড় কেজি থেকে আড়াই কেজি হয়ে থাকে। প্রতিটি বছরে ৩০০টিরও বেশি ডিম পাড়ে। ডিম উৎপাদনে হোয়াইট লেগহর্ন বিশ্ববিখ্যাত।



চিত্র ২০.১০ : হোয়াইট লেগহর্ন

(গ) ইংলিশ জাত

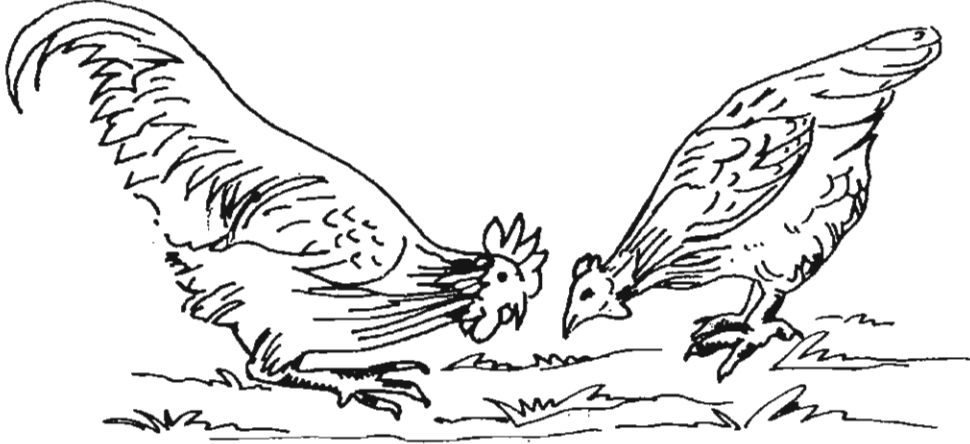
ইংলিশ জাতভুক্ত মুরগির নাম

বৈশিষ্ট্য

- ১। পায়ের নালা পালকহীন
- ২। ওজন সব মুরগির চেয়ে বেশি
- ৩। দ্রুত বর্ধনশীল
- ৪। নানা রঙের হয়ে থাকে
- ৫। তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ডিম দেয়
- ৬। অধিক মাংসের জন্য পালনযোগ্য
- ৭। ব্রয়লার জাত মাংস উৎপাদনের জন্য উত্তম।

- (ক) অস্ট্রাল্প
- (খ) কর্নিশ
- (গ) অরপিংটন

অস্ট্রাল্প : এ জাতের মুরগি মাংস ও ডিমের জন্য প্রসিদ্ধ। গায়ের রং চকচকে সবুজাভ কালো। মাথার খুঁটি একক। দেহ প্রশস্ত। পূর্ণ বয়স্ক মুরগির ওজন দুই থেকে সাড়ে তিন কেজি হয়ে থাকে। বছরে ১০০টি থেকে ১২০টি ডিম দিয়ে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।



চিত্র ২০.১১ : অস্ট্রাল্প

(ঘ) এশিয় জাত

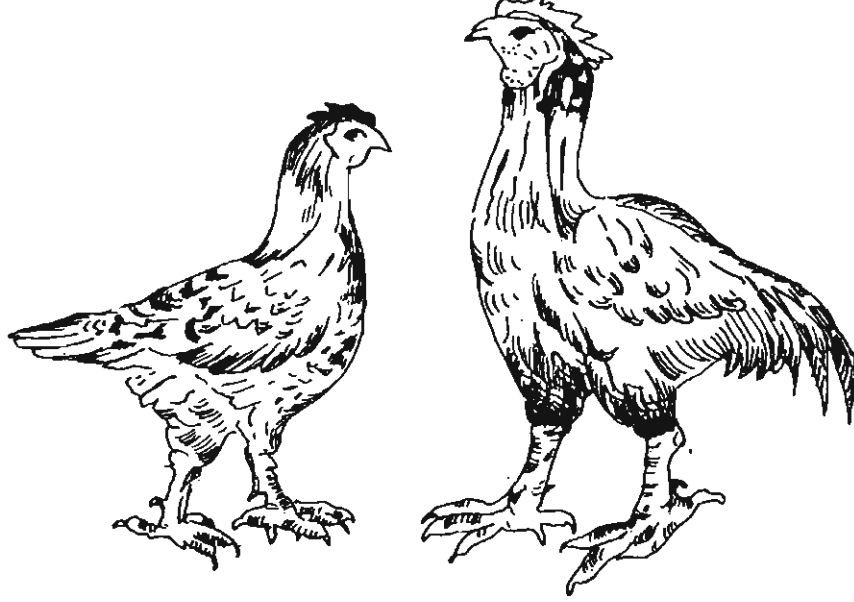
এশিয় জাতভুক্ত মুরগির নাম

বৈশিষ্ট্য

- ১। কোনো কোনোটির পায়ের নালায় পালক থাকে
- ২। চামড়ার রং হলুদ বর্ণের
- ৩। কানের লতি লাল
- ৪। আকার মাঝারি
- ৫। ডিম সাদা ও ঈষৎ বাদামি।

- (ক) আসিল
- (খ) কোচিন
- (গ) ব্রাহ্মা

আসিল : বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল এলাকায় আসিল জাতের মুরগি দেখা যায়। এ জাতের মুরগি লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। প্রতিটি মুরগির ওজন দেড় কেজি থেকে তিন কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বছরে ৪০টি থেকে ৬০টি ডিম দিয়ে থাকে।



চিত্র ২০.১২ : আসিল মুরগি

মুরগি পালন পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়ে থাকে। যথা- ১) খোলা জায়গায় (মুরগি ছাড়া অবস্থায়) পালন (২) আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন এবং (৩) আবদ্ধ অবস্থায় বা খাঁচার মুরগি পালন।

১। খোলা জায়গায় ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন : গ্রাম বাংলায় ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। মুরগি বাড়ির আশপাশে রাস্তাঘাটে ক্ষেতে খামারে ঘুরে বেড়ায়। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা শস্য কণা, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ, তরকারির খোসা, বীজ, মাছের আঁইশ, নাড়িভুড়ি, পোকামাকড়, নুড়ি পাথর ইত্যাদি খুটে খায়। তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু খাদ্যও দেওয়া হয়ে থাকে। ছোট একটি খোয়াড়ে অনেক মুরগি ও বাচ্চা বাড় বৃষ্টি ও অন্যান্য সময় আশ্রয় নেয় এবং রাত কাটায়। ফলে প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের অভাবে অনেক সময় নানা রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়। অধিকন্তু ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের অসুবিধা হল চিল, ঈগল, বন বিড়াল, শৃগাল, বেজিতে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে এবং যেখানে সেখানে ডিম পাড়ে বলে তা কুকুর বিড়ালে খেয়ে ফেলে।

২। আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন : আজকাল যাদের বসত বাড়িতে খালি জায়গা আছে তারা এ খালি জায়গার চারদিকে ১ ½ থেকে ২ মিটার উপরে লোহার তার কিংবা বাঁশের খোপ কাটা বেড়া দিয়ে এর মধ্যে মুরগি পালন করতে পারে। বেড়ার ভেতরে এক কোণে একটি খোয়াড় তৈরি করা হয়। মুরগি এ খোয়াড়ে বাড়, বৃষ্টি ও অন্যান্য সময় আশ্রয় নেয় এবং রাত কাটায়। মুরগি দিনের বেলায় এর মধ্যে চড়ে বেড়ায়। এ পদ্ধতিতে মুরগি পালনে মুরগিকে খাদ্য, পানি নিয়মিত সরবরাহ করতে হয় এবং খোয়াড় ২/৩ দিন পর পর পরিষ্কার করতে হয়। আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগির রোগ বালাই চিকিৎসা করা হয় বলে মৃত্যু কম হয়। তা ছাড়া মুরগি শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা পায়। ছাড়া অবস্থা থেকে আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন লাভজনক।

৩। আবদ্ধ বা খাঁচার মুরগি পালন : এ পদ্ধতিতে মুরগি লোহার তারে তৈরি খাঁচার পালন করা হয়। কম জায়গায় মুরগি পালন করা যায়। বিশেষ করে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালন সুবিধাজনক। খাঁচার মেঝেতে তারের জাল দেওয়া হয়। এ জালের নিচে টিনের একটি ট্রে দেওয়া হয়। মুরগির পায়খানা জালের ফাঁক দিয়ে নিচের ট্রেতে জমা হয়। এ ট্রে দুই-তিন দিন পরপর পরিষ্কার করতে হয়। খাঁচার মেঝে সামনের দিকে একটু ঢালু করে তৈরি করা হয় যাতে মুরগি ডিম পাড়লে

এ ডিম গড়িয়ে সামনের দিকে চলে আসে। তা ছাড়া খাঁচার সামনে মুরগির খাবার পানি দেওয়ার জন্য দুইটি পাত্র রাখার ব্যবস্থা থাকে। মুরগি তারের ফাঁক দিয়ে গলা বের করে খাদ্য খায় এবং পানি পান করতে পারে। মুরগির খাঁচার আয়তন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে মুরগির খাঁচা ২-৪ তলাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। বহুতলা বিশিষ্ট খাঁচায় প্রতি তলাতে একটি করে টিনের ট্রে দেওয়া হয় যাতে উপরের তলার মুরগির পায়খানা নিচ তলার মুরগির গায়ে না লাগে। প্রচুর আলো বাতাসের জন্য মুরগির খাঁচা ঘরের বারান্দায় রাখা সুবিধাজনক। খাঁচায় উন্নত জাতের মুরগি পালন করলে মুরগিকে সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহ করতে হয় এবং রোগ বালাই- এ আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিক সরিয়ে ফেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন প্রাণীর জোড় বিজোড় পাখনা আছে?

ক. ব্যাঙ

খ. ইলিশ

গ. বাদুর

ঘ. তিমি

২. কোন শ্রেণীর প্রাণী বাচ্চা প্রসব করে?

ক. খেচর

খ. সরীসৃপ

গ. স্তন্যপায়ী

ঘ. উভচর

৩. মুরগির খাদ্য পিষ্ট করে

i. পেশীবহুল প্রকোষ্ঠ

ii. ছোট গুড়ি পাথর

iii. গ্রন্থিবহুল প্রকোষ্ঠ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. ডিমের নরম খোসা শক্ত হয়

i. বাতাসের সংস্পর্শে

ii. অ্যালবুমিনের জন্য

iii. আলোর সংস্পর্শে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. মুরগির কঙ্কালতন্ত্র-

i. দেহাকৃতি বজায় রাখে

ii. দেহের অঙ্গসমূহকে ধরে রাখে

iii. মুরগির চলনে সাহায্য করে।

নিচের কোনটি ঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

৬. রেপ্তিসেস হলো-

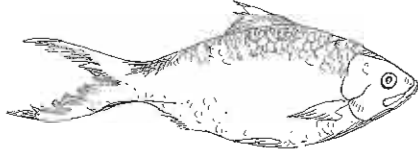
ক. ডানা পালক

গ. চন্দ্রাকার ডানা পালক

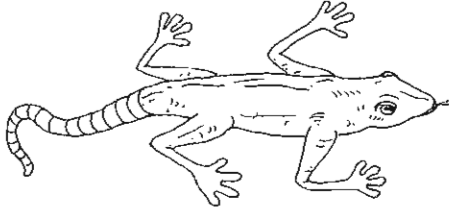
খ. চন্দ্রাকার পুচ্ছ পালক

ঘ. অর্ধচন্দ্রাকার পুচ্ছ পালক

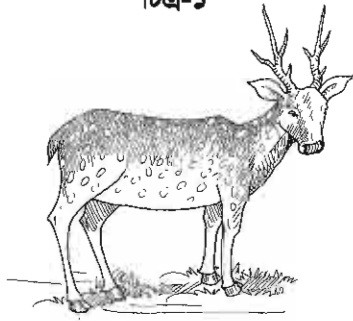
সৃজনশীল প্রশ্ন :



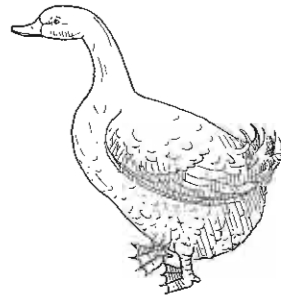
চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩



চিত্র-৪

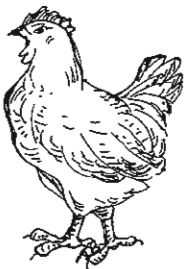
ক. ১ নং চিত্রের প্রাণীটি কিসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়?

খ. ২নং চিত্রের প্রাণীটি সরিসৃপ কেন ব্যাখ্যা কর

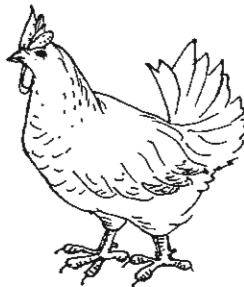
গ. ৪ নং চিত্রের প্রাণীটির বহিঃঅঙ্গসংস্থান চিহ্নিত করে বিভিন্ন অঙ্গের কাজ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ৩ নং চিত্রের প্রাণীটি অন্য ৩টি প্রাণী হতে উন্নততর মতামত দাও

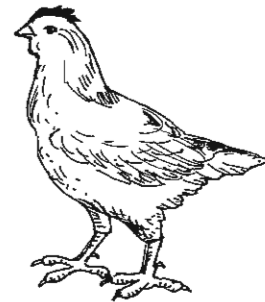
২.



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩

ক. ১ নং চিত্রের মুরগিটির নাম লিখ

খ. ২ নং চিত্রের মুরগিটির পরিপাকতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা কর।

গ. ৩নং চিত্রের মুরগির পালন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের তিনটি মুরগির মধ্যে কোনটি পালন করা লাভজনক যুক্তিসহকারে লিখ।

একবিংশ অধ্যায়

কোষ বিভাজন

আমরা জানি যে, জীবদেহ একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। অবশ্য এককোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদও রয়েছে। আকার আয়তনে একটি কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। এত ছোট যে খালি চোখে এদের দেখাও যায় না। তাই কোষ পর্যবেক্ষণ করতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

সব জীবের কোষ কিছু এক রকম নয়। এক একটি কোষ এক এক আয়তনের হয়। জীবের বিভিন্নতা অনুযায়ী জীবকোষের আকৃতি ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আবার কাজ অনুসারে কোষের আকৃতিও ভিন্ন হয়। যেমন, যকৃত কোষের আকার আকৃতি ফুসফুসীয় কোষের আকার আকৃতি থেকে ভিন্ন।

ক্ষুদ্র একটি কীট বা বৃহৎ একটি প্রাণী যেমন হাতি অথবা একটি বৃহৎ উদ্ভিদ যেমন বট গাছ ইত্যাদি একটি কোষ থেকেই সৃষ্টি। নিশ্চয়ই এখন তোমাদের জানতে ইচ্ছা হচ্ছে কীভাবে একটি ক্ষুদ্র কোষ থেকে বিশাল একটি উদ্ভিদ বা বৃহৎ একটি প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

যৌন প্রজননের সময় শুক্রানু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি হয়। এ জাইগোট বিভাজিত হয়ে জীবদেহ গঠিত হয়। জাইগোট বারবার বিভাজিত হয়ে অসংখ্য কোষ উৎপন্ন হয়। এভাবে বারবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এবং পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠিত হয়।

যে প্রক্রিয়ায় একটি সজীব কোষ বিভাজিত হয়ে দুই বা ততোধিক নতুন কোষ উৎপন্ন হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে। যে কোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ উৎপন্ন করে তাকে মাতৃকোষ বলে। মাতৃকোষ বিভাজনের ফলে যে নতুন কোষ উৎপন্ন হয় তাকে অপত্য কোষ বলে। সংক্ষেপে বলা চলে যে পদ্ধতিতে মাতৃকোষ থেকে অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে কোষ বিভাজনের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

জীবদেহের বৃদ্ধির পাশাপাশি ভ্রূণের পরিস্ফুটন, জীবদেহের ক্ষয়পূরণ, প্রজনন ইত্যাদি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে।

জীবদেহে প্রধানত দুই ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়। (১) মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং (২) মিয়োসিস কোষ বিভাজন।

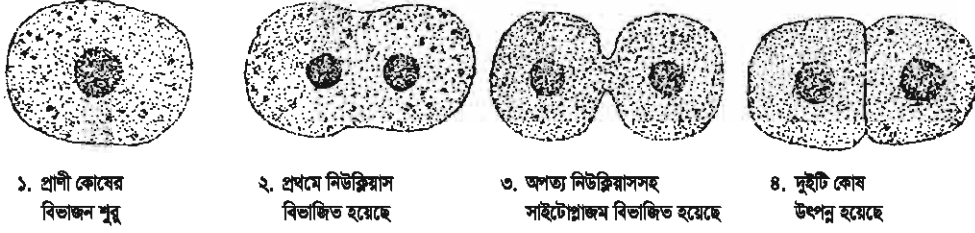
(১) মাইটোসিস কোষ বিভাজন : ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা জেনেছি কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে এবং সেই নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে মাতৃকোষ ও উৎপন্ন অপত্য কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা সমান থাকে এবং একই গুণের অধিকারী হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর অপত্য কোষ একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। তাই এ কোষ বিভাজন পদ্ধতিকে সদৃশ্য কোষ বিভাজনও বলা হয়। সহজভাবে বলা চলে যে প্রক্রিয়ায় পরিণত দেহকোষ বিভাজিত হয়ে সমআকৃতি এবং সমগুণ সম্পন্ন দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তাকে মাইটোসিস বলে।

মাইটোসিস বিভাজন প্রধানত জীবের দেহকোষে ঘটে। এ ধরনের বিভাজনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম একবার বিভাজিত হয় এবং নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমের সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে।

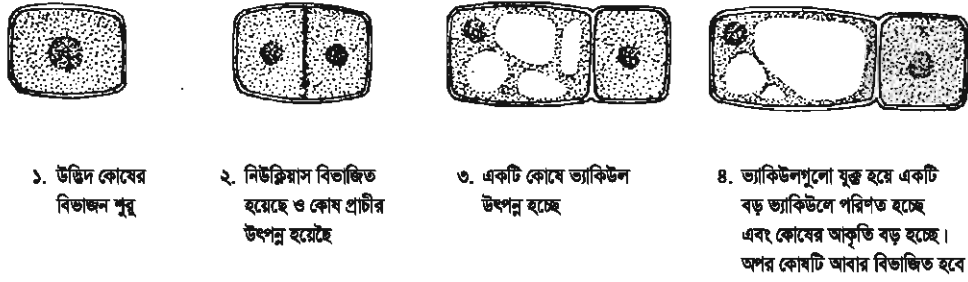
মাইটোসিস পদ্ধতিতে মূল বিভাজন নিউক্লিয়াসে হলেও এ বিভাজন পুরো কোষের বিভাজনকেই বুঝায়। মাইটোসিস বিভাজন দুই পর্যায়ে ঘটে। যথা (ক) নিউক্লিয়াসের বিভাজন এবং (খ) সাইটোপ্লাজমের বিভাজন

(ক) নিউক্লিয়াসের বিভাজন : দেহকোষের বিভাজনের শুরুর্তে নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হয়। সাথে সাথে নিউক্লিয়াস জালিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিউক্লিয়াসের বিভাজন চারটি ধাপে শেষ হয়। (ক) প্রফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) অ্যানাফেজ ও (ঘ) টেলোফেজ।

ক. প্রাণী কোষের কোষ বিভাজন



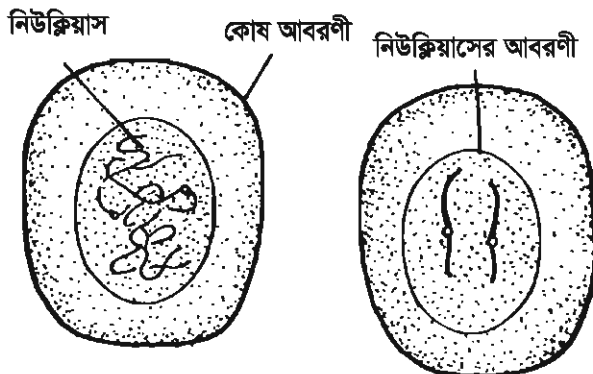
খ. উদ্ভিদ কোষের কোষ বিভাজন



চিত্র ২০.১৩ : কোষ বিভাজন

(খ) সাইটোপ্লাজমের বিভাজন : সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয় অপত্য নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে। এ পর্যায়ে বিভাজনেরত কোষের সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অপত্য নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ফেলে। প্রথম অবস্থায় কোষের মাঝামাঝি জায়গায় কোষ আবরণীতে খাজ সৃষ্টি হয়। পর্যায়ক্রমে এ খাজ গভীর হতে থাকে। এভাবে সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটো অপত্য কোষে পরিণত হয়।

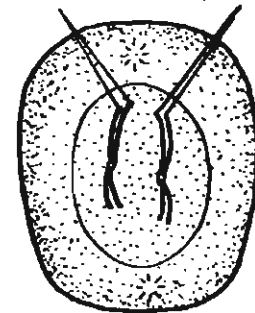
১. দুইটি ক্রোমোসম সহ



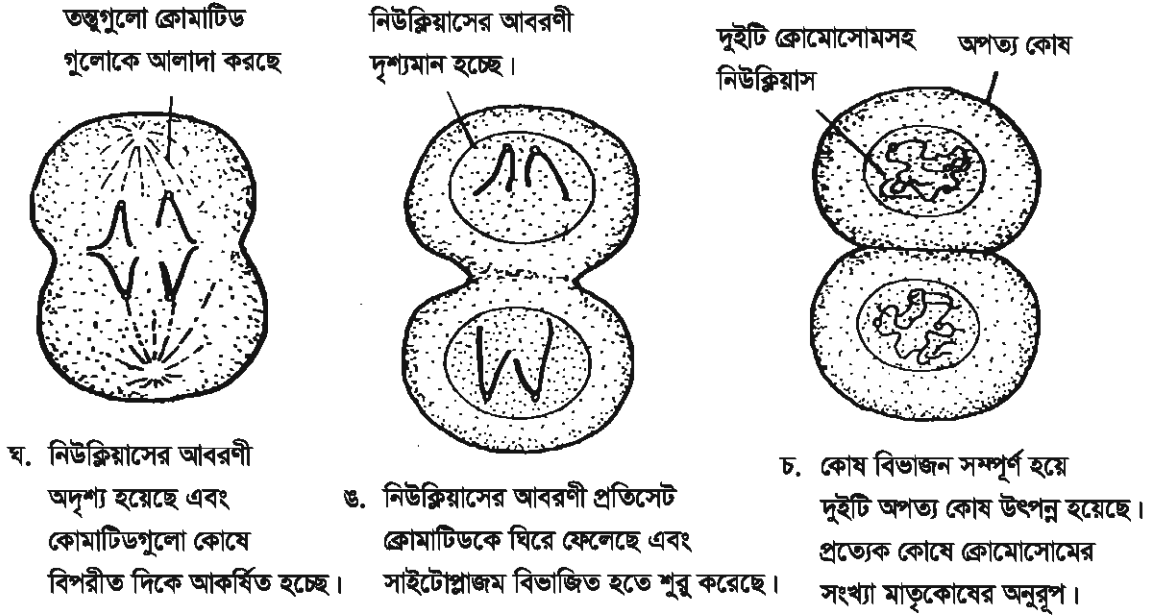
ক. কোষ বিভাজনের পূর্বে নিউক্লিয়াসে দৃশ্যমান ক্রোমোসোম

খ. ক্রোমোসোম খাটো ও মোটা হয়েছে

দুইটি ক্রোমাটিড



গ. এখানে একটি ক্রোমোসোম দুইটি ক্রোমাটিড দিয়ে গঠিত দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ২০.১৪ : মাইটোসিস কোষ বিভাজন

মাইটোসিস বিভাজনের গুরুত্ব : জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং ভ্রূণের বর্ধনের জন্য মাইটোসিস প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

(২) মিয়োসিস কোষ বিভাজন : মিয়োসিস কোষ বিভাজন সকল সময় জনন মাতৃকোষ থেকে জনন কোষ সৃষ্টির জন্য সংঘটিত হয়। এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে জনন কোষ সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা জনন মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। অর্থাৎ যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় অপত্য জনন কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা মাতৃজনন কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যার অর্ধেক হয় তাকে মিয়োসিস বিভাজন বলে। এ রূপ দুইটি জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা মাতৃকোষের অনুরূপ হয়। আর এ মিলিত দুইটি কোষ হচ্ছে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট। মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের ফলে বংশ পরস্পরায় জীবের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য হল এখানে নিউক্লিয়াস দুই বার বিভাজিত হয়।

মিয়োসিসের গুরুত্ব : যে সব জীবে যৌন প্রজনন ঘটে তাদের জনন কোষ এ পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রতিটি জীবের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে এবং নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্য

মাইটোসিস	মিয়োসিস
১। মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন দেহ কোষে ঘটে।	১। মিয়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন জনন মাতৃকোষে ঘটে। অর্থাৎ শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং পরাগরেণু উৎপাদনে ঘটে।
২। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে দেহের আয়তন বৃদ্ধি পায়।	২। বংশ পরস্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য জনন কোষ সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস

- ৩। এ পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।
- ৪। মাতৃ নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমের বিভাজন একবার ঘটে।
- ৫। মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে মাতৃ নিউক্লিয়াসে এবং উৎপন্ন অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সমান থাকে।

মিয়োসিস

- ৩। এ পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।
- ৪। মাতৃ নিউক্লিয়াসের বিভাজন দুইবার এবং ক্রোমোসোমের বিভাজন একবার ঘটে।
- ৫। অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমের সংখ্যার তুলনায় অর্ধেক হয়।

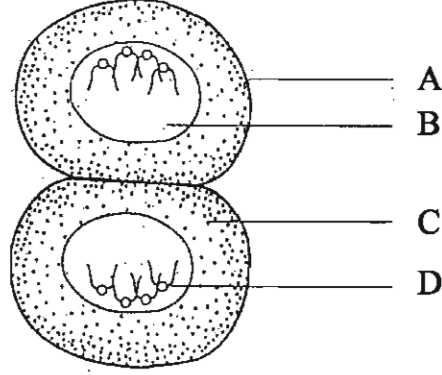
অনুশীলনী**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

১. মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে-
 ক. উদ্ভিদ কোষে
 গ. উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষে
 খ. প্রাণী কোষে
 ঘ. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জননকোষে
২. মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস কতবার বিভাজিত হয়?
 ক. এক
 গ. তিন
 খ. দুই
 ঘ. চার
৩. বীজ থেকে চারাগাছ তৈরিতে কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে?
 ক. প্রোফেজ
 গ. মেটাফেজ
 খ. মাইটোসিস
 ঘ. মিয়োসিস
৪. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য হল :
 i. মাতৃকোষ ও অপত্যকোষ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়
 ii. জীবের দেহকোষে এরূপ বিভাজন ঘটে
 iii. মাতৃ নিউক্লিয়াসের দুইবার এবং ক্রোমোসোমের একবার বিভাজন ঘটে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. i ও ii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের দাও:

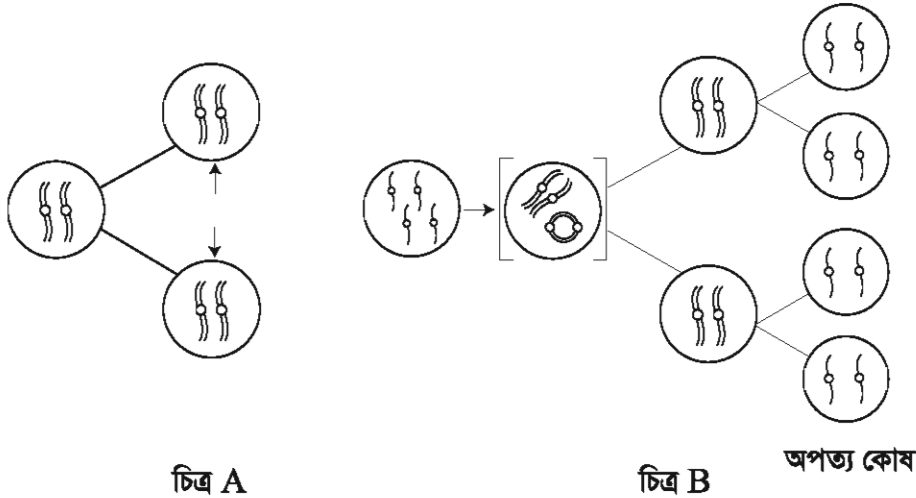


চিত্র : মাইটোসিস প্রক্রিয়ার একটি ধাপ।

৫. বিভাজনরত কোষটির মাতৃকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা কত ছিল?
 ক. ২টি খ. ৪টি
 গ. ৮টি ঘ. ১৬টি
৬. চিহ্নিত কোন অংশটি সাইটোপ্লাজম?
 ক. A খ. B
 গ. C ঘ. D

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



- ক. A চিত্রে কোন ধরনের কোষ বিভাজন দেখানো হয়েছে?
 খ. 'B' চিত্রের কোষ বিভাজন ব্যাখ্যা কর।
 গ. দেহ গঠনে A চিত্রে প্রদর্শিত কোষ বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা কর।
 ঘ. চিত্রে A ও B-এর কোষ বিভাজনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা আলোচনা কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মানব দেহ

রক্ত সংবহনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র

প্রাণী দেহের যাবতীয় জৈবনিক কাজের ক্ষুদ্রতম একক কোষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন অক্সিজেন ও খাদ্য। তা ছাড়া দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হরমোনের। দেহকোষে বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদনের সময় উৎপন্ন হয় বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ। কোষে যেমন অক্সিজেন, খাদ্য, হরমোন ইত্যাদি বহন করা দরকার তেমনি কোষে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বের করে রেচন অঙ্গসমূহ, যথা- ত্বক, ফুসফুস বৃক্কে পৌঁছানো দরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দেহের সমস্ত তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ প্রয়োজন। সংবহনতন্ত্রই এ যোগাযোগের কাজটি করে থাকে।

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে এ সব পরিবহণের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে সংবহন প্রক্রিয়া বলে। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা এবং লসিকা ও লসিকাবাহী নালীর সমন্বয়ে মানবদেহের সংবহনতন্ত্র গঠিত।

রক্তসংবহনতন্ত্র

যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাকে রক্তসংবহনতন্ত্র বলে। হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্ত নালীর সমন্বয়ে রক্তসংবহনতন্ত্র গঠিত।

রক্ত ও রক্তের উপাদান

দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে যে ঘন লাল রঙের তরল পদার্থ শরীর থেকে বের হয় তাকে রক্ত বলে। এটা এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তের উপাদান দুইটি। যথা- (১) রক্ত রস ও (২) রক্ত কণিকা।

(১) **রক্ত রস** : রক্তে রক্তরসের পরিমাণ শতকরা ৫৫% ভাগ। রক্তের হালকা হলুদাভ তরল অংশের নাম রক্ত রস। রক্ত রসে পানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। রক্ত রসে রক্তকণিকা ভেসে থাকে। এ ছাড়া রক্ত রসে রয়েছে বিভিন্ন আমিষ জাতীয় পদার্থ। অ্যালবুমিন, প্রোথ্রমবিন, ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, গ্লুকোজ, চর্বি, খনিজ লবণ, ইউরিয়া, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, তামা, হরমোন, অ্যান্টিবডি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি।

(২) **রক্ত কণিকা** : রক্তে তিন ধরনের কণিকা রয়েছে

(ক) লোহিত রক্ত কণিকা

(খ) শ্বেত রক্ত কণিকা

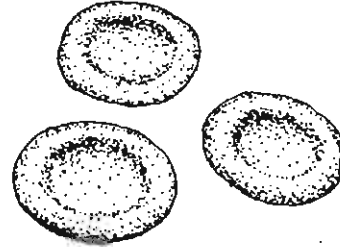
(গ) অণুচক্রিকা

(ক) **লোহিত রক্ত কণিকা** : রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ শতকরা ৪৫ ভাগ। মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা গোলাকার। এতে নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে এক ধরনের লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়। অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়। আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন।

(খ) **শ্বেত রক্ত কণিকা** : রক্ত কণিকাগুলোর মধ্যে শ্বেত কণিকা আকারে সবচেয়ে বড়। এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।

এরা নিউক্লিয়াসযুক্ত। লোহিত রক্ত কণিকার চেয়ে সংখ্যা কম। এদের কোনো রং নেই। প্লীহা ও অস্থিমজ্জাতে এদের জন্ম।

(গ) অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা দেখতে গোলাকার। এরা লোহিত কণিকার চেয়ে ছোট এবং এরা দলবন্দ্য হয়ে থাকে। এদের উৎপত্তিস্থল লোহিত অস্থিমজ্জা।



লোহিত রক্ত কণিকা

রক্তের কাজ

রক্ত প্রাণী দেহে নানা ধরনের কাজ করে থাকে। যথা-

(১) অক্সিজেন পরিবহণ : রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিটি কোষে নিয়ে যায়।

(২) কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ : দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষগুলোতে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত রস বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়।

(৩) খাদ্য পরিবহণ : খাদ্যের পরিপাককৃত অংশ দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে।

(৪) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : দেহে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

(৫) রোগ প্রতিরোধ : দেহে কোনো রোগ জীবাণু ঢুকলে রক্তের শ্বেত কণিকা সেগুলোকে মেরে ফেলে রোগ প্রতিরোধ করে। এজন্যই শ্বেত রক্ত কণিকাকে দেহের প্রহরী বলা হয়।

(৬) তাপমাত্রা ঠিক রাখা : রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে তাপ বহন করে এতে দেহের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা ঠিক থাকে।

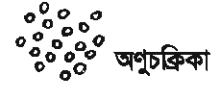
(৭) হরমোন পরিবহণ : দেহের নালীবিহীন গ্রন্থিতে উৎপন্ন হরমোন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

(৮) রক্ত জমাট বাঁধা : দেহের কোনো অংশে কেটে রক্তপাত হলে রক্তের অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে দেহের রক্তপাত বন্ধ হয়।

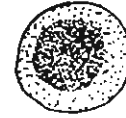
শিরা

যে সকল রক্তবাহী নালী দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত পরিবহণ করে তাকে শিরা বলে।

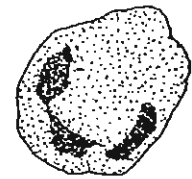
কাজ : শিরা সাধারণত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে বহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় বা পালমোনারী শিরা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে। এক্ষেত্রেও শিরা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে।



অণুচক্রিকা



শ্বেত রক্ত কণিকা



শ্বেত রক্ত কণিকা

চিত্র ২২.১ : রক্ত কণিকা

ধমনী

যে সকল রক্তবাহী নালী হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত বহন করে তাকে ধমনী বলে।

কাজ : ধমনী সাধারণত হৃৎপিণ্ড থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনী কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস বহন করে।

ধমনী ও শিরার পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	ধমনী	শিরা
প্রবাহমান রক্তের প্রকৃতি	ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে। ব্যতিক্রম ফুসফুসীয় ধমনী।	শিরা দূষিত রক্ত বহন করে। ব্যতিক্রম ফুসফুসীয় শিরা।
প্রাচীর	পুরু ও স্থিতিস্থাপক	পাতলা ও কম স্থিতিস্থাপক
নাড়ী স্পন্দন	আছে	নাই।
উৎপত্তি	হৃৎপিণ্ড	কৈশিক জালিকা।
রক্ত চাপ	রক্তের চাপ বেশি	রক্তের চাপ কম।
গহ্বর	ছোট	বড়।
কপাটিকা	গহ্বরে কপাটিকা নেই	গহ্বরে কপাটিকা আছে।

লসিকা

রক্তনালী ছাড়া দেহে আরও এক ধরনের বস্তুনালী রয়েছে যাদেরকে লসিকা নালী বলে। এ লসিকা নালীর অভ্যন্তরে যে তরল পদার্থ থাকে তাকে লসিকা বলে। লসিকা হালকা হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ এবং সামান্য ক্ষারধর্মী। লসিকায় প্রোটিনের পরিমাণ রক্ত রসের তুলনায় কম। লসিকায় এক প্রকার শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে তাকে লিম্ফোসাইট বলে।

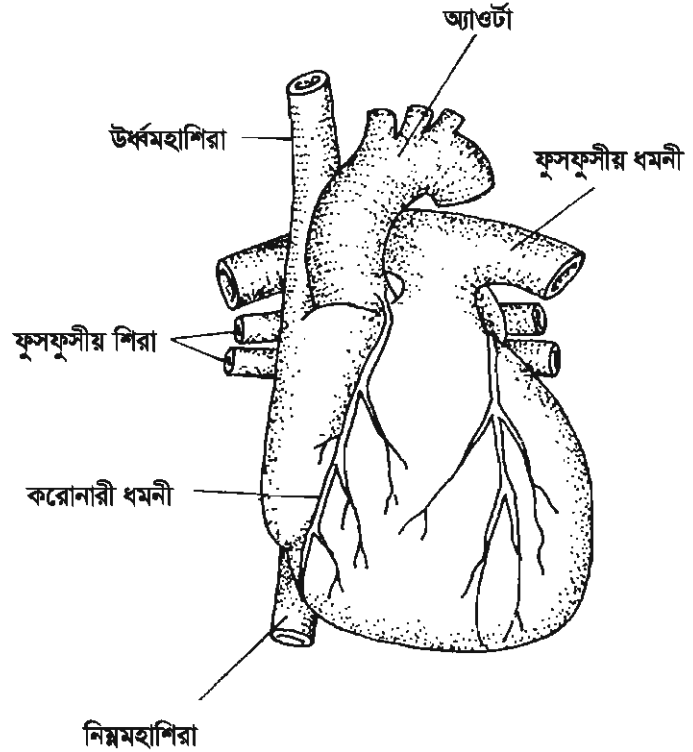
লসিকার কাজ

- ১। কোষ থেকে যে সকল বস্তু রক্তে ফেরত আসতে পারে না সে সকল বস্তু লসিকা দ্বারা রক্তে ফেরত আসে।
- ২। দেহে কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে লসিকা গ্রন্থিতে উৎপন্ন শ্বেতকণিকা এবং অ্যান্টিবডি তাকে ধ্বংস করে।
- ৩। পরিপাককৃত স্নেহ জাতীয় খাদ্য লসিকার মাধ্যমে শোষিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের গঠন

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের সামান্য বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত। ইহা বক্ষপিঞ্জরে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। হৃৎপিণ্ড দেখতে অনেকটা মোচার মত। অর্থাৎ ত্রিকোণাকার। এর উপরের দিকের অংশটা মোটা এবং নিচের দিকের অংশ সরু। হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক এক প্রকার দ্বিস্তর বিশিষ্ট পাতলা পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে। এ দুই স্তরের মাঝে রয়েছে এক ধরনের তরল পদার্থ। একে পেরিকার্ডিয়াল রস বলে। এ রস হৃৎপিণ্ডকে ভেজা রাখে এবং তাপ, চাপ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। আমাদের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এগুলোর মধ্যে দুইটি উপরে থাকে

এবং অপর দুইটি নিচে অবস্থিত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুইটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম অলিন্দ বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুইটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় বলে। অলিন্দদ্বয়ের প্রাচীর পাতলা এবং নিলয়দ্বয়ের প্রাচীর মোটা। অলিন্দদ্বয় ও নিলয়দ্বয় যথাক্রমে আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীর এবং আন্তঃনিলয় প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে। আয়তনে অলিন্দদ্বয় ছোট এবং নিলয়দ্বয় বড়। উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা ডান অলিন্দে এসে প্রবেশ করে এবং বাম অলিন্দে এসে প্রবেশ করে চারটি ফুসফুসীয় শিরা। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় এক ধরনের বিশেষ অলিন্দ নিলয় ছিদ্র দ্বারা সংযুক্ত। এ সংযোগস্থলে একটি ত্রিপত্রী কপাটিকা থাকে। রক্ত এ কপাটিকার মাধ্যমে শুধুমাত্র অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। একইভাবে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়, বাম অলিন্দ নিলয় ছিদ্র দ্বারা যুক্ত থাকে। এ সংযোগস্থলে রয়েছে দ্বিপত্রী কপাটিকা। এক্ষেত্রেও বাম অলিন্দ থেকে রক্ত শুধুমাত্র নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া মহাধমনী ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে এবং ফুসফুসীয় ধমনী এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা। এ কপাটিকাগুলো একদিকে রক্তের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

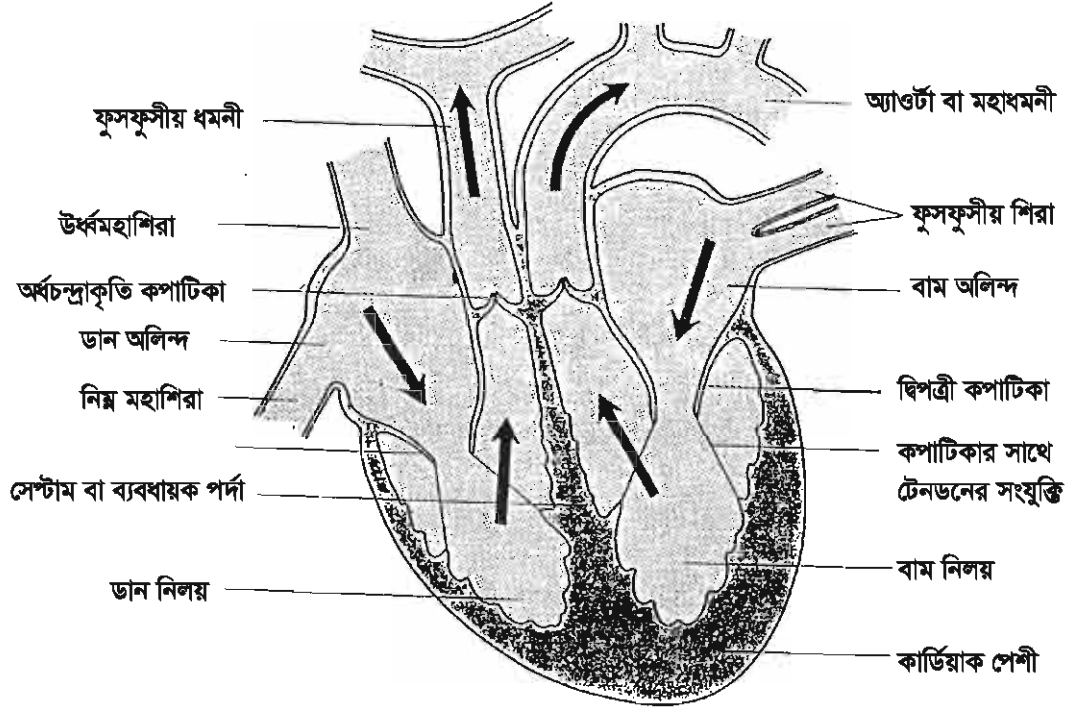


চিত্র ২২.২ : হৃৎপিণ্ডের বহিঃগঠন

হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন

হৃৎপিণ্ড হৃদদেশী নামে এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত। যখন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হয় তখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনী পথে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডে যখন প্রসারণ ঘটে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত শিরা পথে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত একবার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ অবস্থায় দেহের উর্ধ্বাঙ্গ থেকে উর্ধ্বমহাশিরা, নিম্নাঙ্গ থেকে নিম্নমহাশিরা পথে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত প্রথমে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দ রক্তপূর্ণ হলে সঙ্কে সঙ্কে সংকুচিত হয় এবং নিলয় প্রসারিত হয়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে দূষিত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসীয় শিরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে বাম অলিন্দে বহন করে নিয়ে আসে। বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে ঐ রক্ত পরে প্রবেশ করে।

নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হলে সংকুচিত হয় এবং নিলয়ে রক্তের চাপ বেড়ে যাবার কারণে অলিন্দ নিলয় কপাটিকা যথা দ্বিপত্রী ও ত্রিপত্রী কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলো খুলে যায়। ফলে ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনী পথে দূষিত রক্ত ফুসফুসে এবং বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনীতে প্রবেশ করে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। নিলয়দ্বয়ের সংকোচন অবস্থায় অলিন্দদ্বয়ের প্রসারণ ঘটে ফলে রক্ত আবার অলিন্দে প্রবেশ করে। এভাবে অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালিত হয়।



চিত্র ২২.৩ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (তীর চিহ্ন দ্বারা রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে)

বিভিন্ন প্রকার হৃদরোগ

বাতজ্বর

বাতজ্বর এক প্রকার হৃদরোগ। এ রোগ সাধারণত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেশি হয়। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসকারীদের মধ্যে এ রোগ দেখা যায়।

লক্ষণ : ঘন ঘন জ্বর হয়, খাওয়ায় অরুচি আসে, ওজন কমতে থাকে, হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ হয়, গিটে যথা- হাটু ও কনুইয়ে ব্যথা হয়। কখনও বুকে ব্যথা হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা নষ্ট হয়ে যায় ফলে স্বাভাবিকভাবে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। বাতজ্বর সন্দেহ হলে বিলম্ব না করে ডাক্তার দেখানো দরকার।

মস্তিষ্কে রক্তরক্ষণ

মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ফলে ঐ ব্যক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এতে রোগী অনেক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়ে। পক্ষাঘাতে অঙ্গ অচল হয়ে যায়। অনেকে কথা বলতে পারে না। উদ্বেজনা ও মানসিক চাপের ফলেও অনেক সময় এ রোগ হয়।

করোনারী প্রাথমিক

যে ধমনী হৃদপেশীতে রক্ত সরবরাহ করে তাকে করোনারী ধমনী বলে। করোনারী ধমনীতে চর্বি জমে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটে থাকে। ফলে হৃদপিণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হতে পারে না। করোনারী ধমনীর গহ্বর অতিরিক্ত ছোট হয়ে গেলে রক্ত চলাচলে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হয় এবং করোনারী প্রাথমিক নামক রোগ হয়। এ রোগে হঠাৎ করে অনেকে মারা যায়।

রক্তচাপ

হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনী পথে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ হয়। রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে রক্তের যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। ধমনী পথে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমে ধমনীর পথ সরু হলে স্বাভাবিকভাবে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটে ফলে ধমনীতে রক্তের চাপ বেড়ে যায়। একে উচ্চরক্তচাপ বলে।

উচ্চরক্তচাপের কারণ

- * পিতামাতার উচ্চরক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের হতে পারে।
- * দেহের ওজন বেড়ে গেলে
- * হাঁটাচলা বা দৈহিক পরিশ্রম কম করলে

উচ্চরক্তচাপের লক্ষণ

- * ঘাড় ও মাথার পিছনে দিকে ব্যথা
- * মাথা ঘোরা ও বুক ধড়ফড় করা
- * ঠিকমত ঘুম না হওয়া
- * দুর্বলতা
- * অল্প পরিশ্রমে হাপিয়ে ওঠা
- * কাঁধে ও বুকে ব্যথা হওয়া

উচ্চরক্তচাপের প্রতিকার

- * লবণ খাওয়া কমিয়ে দেওয়া এবং কাঁচা লবণ খাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা
- * প্রত্যহ ব্যায়াম করা ও দেহের ওজন কমানো
- * পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা
- * চর্বি জাতীয় গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা
- * দৈনিক কিছু সময় একটানা হাঁটার অভ্যাস করা

রক্তচাপের ফলে সৃষ্ট অসুবিধা

উচ্চরক্তচাপের ফলে সমস্ত দেহে ধমনী শক্ত হয়ে যায়। এতে ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। কখনও বা ধমনী ফেটে রক্তপাত ঘটতে পারে। ফলে নানাভাবে আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। যথা-

- (১) মাথার খুলির ভেতরের ধমনী ছিড়ে মস্তিস্কের ক্ষতি করে। এতে হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে, পক্ষাঘাত হয় ও মৃত্যুবরণ করে।
- (২) উচ্চরক্তচাপের ফলে অনেক সময় চোখের রেটিনাতে রক্ত ক্ষরণ হয়ে অনেকে অন্ধ হয়ে যায়।

হৃদরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

- (১) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা। যথা- খেলাধুলা, হাঁটাচলা, ব্যায়াম করা।

(২) অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য না খাওয়া। কারণ চর্বি ধমনীর প্রাচীর পুরু ও শক্ত করে রক্ত প্রবাহের বাঁধা সৃষ্টি করে।

(৩) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

(৪) ধূমপান ত্যাগ করা। ধূমপানের ফলে ধমনীর গা শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

(৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের যত্ন

(১) প্রত্যহ প্রয়োজনমত ব্যায়াম ও হাঁটাচলা করা উচিত।

(২) ধূমপানে বিরত থাকা। কারণ সিগারেটের ধোঁয়া হৃদপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর।

(৩) অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য না খাওয়া। কারণ অতিরিক্ত চর্বি ধমনীর ভেতরের গায়ে লেগে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়।

(৪) দেহের ওজন বাড়তে না দেওয়া। দেহের ওজন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত সঞ্চালনে চাপ পড়ে।

শ্বসনতন্ত্র

জীবদেহের কোষে অবস্থিত খাদ্যবস্তু (শর্করা) যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয়ে খাদ্যের স্থিতি শক্তিকে গতি শক্তিতে পরিণত করে এবং উপজাত হিসেবে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে তাকে শ্বসন বলে।

যে সব অঙ্গা শ্বসন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে তাদের একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। মানুষের শ্বসনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

(১) নাসাপথ

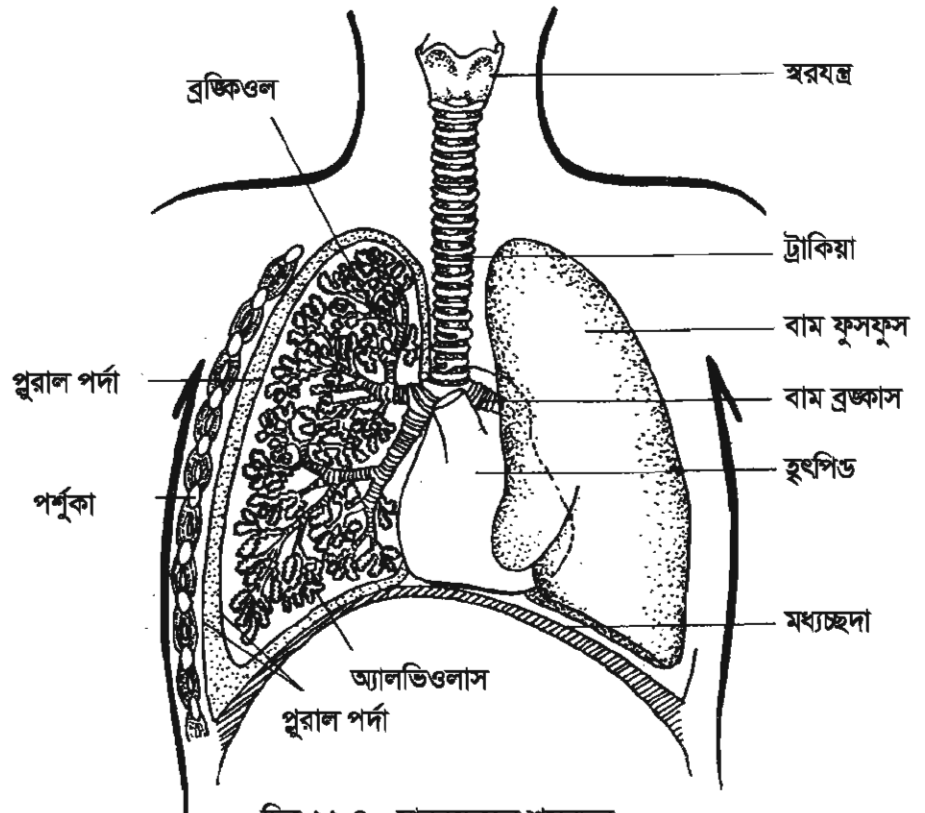
(২) নাসা গলবিল

(৩) স্বরযন্ত্র

(৪) শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া)

(৫) বায়ুনালী।

(৬) ফুসফুস।



চিত্র ২২.৪ : মানবদেহের শ্বসনতন্ত্র

(১) **নাসাপথ** : নাক মুখমণ্ডলের সামনের দিকে অবস্থিত। নাক দুইটি বহিঃনাসারশ্মের সাহায্যে বাইরের দিকে উন্মুক্ত এবং দুইটি অন্তঃনাসারশ্মের মাধ্যমে মুখ গহবরের সাথে যুক্ত। খাদ্য খাওয়ার সময় অন্তঃনাসারশ্ম দুটো আলজিব দ্বারা ঢাকা থাকে। নাসাপথ পিচ্ছিল এবং ছোট ছোট লোমে আবৃত থাকে। ফলে নিঃশ্বাসের বায়ুতে অবস্থিত ধূলিকণা ও রোগ জীবাণু আটকা পড়ে। নাসিকার আর একটি প্রধান কাজ গন্ধ নেওয়া।

(২) **নাসা গলবিল** : নাসাপথের শেষ অংশ যেখানে গলবিলের সাথে মিশেছে তাকে নাসা গলবিল বলে। গলবিল পথেই শ্বাসনালীতে বাতাস প্রবেশ করে।

(৩) **স্বরযন্ত্র** : গলবিল ও শ্বাসনালীর সংযোগস্থলে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টিকারী ভোকাল কর্ড থাকে বলে স্বরযন্ত্র বলা হয়। স্বরছিদের মুখে এপিগ্লটিস নামক একটি ঢাকনা থাকে। এ ঢাকনা খাদ্য গ্রহণের সময় স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখে যাতে এতে খাদ্য ঢুকতে না পারে। আবার শ্বাস গ্রহণের সময় খুলে যায়।

(৪) **ট্রাকিয়া** : স্বরযন্ত্র থেকে শুরু করে ক্রোম শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা নালীকে ট্রাকিয়া বলে। ট্রাকিয়া আংটির মত অনেকগুলো তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত।

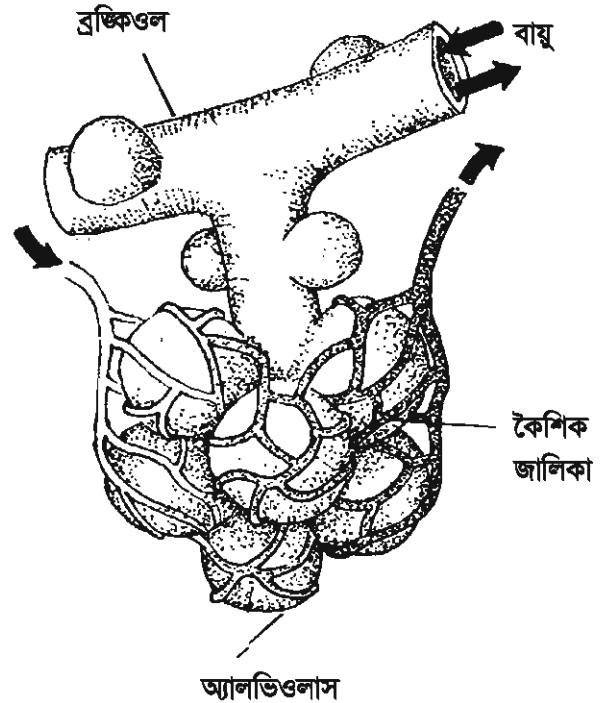
(৫) **অ্যালভিওলাস** : ট্রাকিয়া বক্ষগহবরের দুই ফুসফুসের কাছে এসে দুটো প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে তাদের ব্রঙ্কাস বলে। পরবর্তীতে এ শাখাঘর ব্রঙ্কিওল নামক শাখা - প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ক্ষুদ্রতর শাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ প্রান্তে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলুনের মত অ্যালভিওলাই সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলাই কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ বলে সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময় ঘটে।

(৬) **ফুসফুস** : ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই, শিরা, ধমনী, কৈশিক জালক ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হয় ফুসফুস। বক্ষ গহবরের ভেতর হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে একটি করে ফুসফুস অবস্থিত। ফুসফুস পুরা নামক দুই স্তর বিশিষ্ট এক ধরনের পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে। ডান পাশের ফুসফুসটি বাম পাশের ফুসফুস অপেক্ষা সামান্য বড়। ফুসফুসের রং হালকা গোলাপি। ফুসফুস প্রসারিত হলে বায়ু ফুসফুসে ঢোকে এবং সংকুচিত হলে বায়ু ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যায়। ফুসফুসের নিচে মধ্যচ্ছদা নামক একটি পর্দা আছে। এটি উদর গহবরকে বক্ষ গহবর থেকে পৃথক রাখে। মধ্যচ্ছদা উপরে ও নিচে ওঠানামা করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

মানবদেহে শ্বাসন প্রক্রিয়াকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) বহিঃশ্বাসন এবং (২) অন্তঃশ্বাসন।

(১) **বহিঃশ্বাসন** : যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে তাকে বহিঃশ্বাসন বলে।

এ প্রক্রিয়ায় ফুসফুস ও ফুসফুসীয় রক্ত জালকের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে। অর্থাৎ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে আবার রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসে প্রবেশ করে। বহিঃশ্বাসন দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা (ক) প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ এবং (খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ।



চিত্র ২.৫ : বায়ুথলি

(ক) প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ : যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু ফুসফুসে গ্রহণ করা হয় তাকে শ্বাস গ্রহণ বলা হয়। শ্বাস গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মধ্যচ্ছদা ও পিঞ্জরাস্থির মাঝের পেশী সংকুচিত হয় ফলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে প্রসারিত হয়। এতে বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস উভয়ই আয়তনে বেড়ে যায়, ফলে ফুসফুসের বায়ু থলিতে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন যুক্ত বায়ু প্রবেশ করে। পরে বায়ুথলি থেকে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে।

(খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ : যে প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত বায়ু ফুসফুস থেকে পরিবেশের বায়ুতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ বলে। এ পর্যায়ে মধ্যচ্ছদা শিথিল হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং ফুসফুস আয়তনে ছোট বা সংকুচিত হয়।

(২) অন্তঃশ্বসন : যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কোষের ভেতরের শর্করা জাতীয় খাদ্যকে দহন করে শক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে। অন্তঃশ্বসন প্রধানত কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

অক্সিজেন পরিবহণ : অক্সিজেন ফুসফুসের অ্যালভিওলাস থেকে রক্তজালকে প্রবেশ করে। এরপর লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে ধমনীর রক্তের মাধ্যমে কোষে পৌঁছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ : শ্বসনকালে দেহকোষে খাদ্য অক্সিজেন দ্বারা দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এ কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ থেকে রক্ত রসে প্রবেশ করে এবং রক্ত রসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসে আসে। তারপর নাসাপথে বাইরে যায়।

শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ

যক্ষ্মা : যক্ষ্মা একটি পরিচিত ছোঁয়াচে রোগ। যে কোনো লোক যে কোনো সময়ে এ রোগে সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল স্যাঁতস্যাঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়ে থাকে।

কারণ : মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

- (১) দেহের ওজন কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- (২) খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনও কাশির সাথে রক্ত পড়তে দেখা যায়।
- (৩) রাত্রে শরীরে ঘাম হয় এবং বিকেলের দিকে অল্প জ্বর হয়।
- (৪) বুকে বা পিঠে ব্যথা হয়।
- (৫) ভালো খাবার খেলেও শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না।
- (৬) পেটের অসুখ দেখা দেয়।

প্রতিকার

- (১) শিশুদের বিসিজি টিকা দিতে হয়।
- (২) পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
- (৩) যক্ষ্মার চিকিৎসা দ্রুত শুরু করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।
- (৪) যক্ষ্মা রোগী থেকে আলাদা থাকতে হবে।

(৫) যক্ষ্মা রোগীকে পৃথক রাখতে হবে। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হল হাসপাতালে পাঠানো। এতে সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব।

(৬) রোগীর কফ, থুথু, মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। কারণ এ সবে অসংখ্য জীবাণু থাকে।

(৭) হাঁচি বা কাশির সময় মুখ বুজাল দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

নিউমোনিয়া আর একটি রোগ

নিউমোনিয়া ফুসফুসে হতে দেখা যায়। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। হাম, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগের পরে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া রোগ হতে দেখা যায়। শিশুদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ : নিউমোককাস নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

(১) কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় নাকের ছিদ্র বড় হয়।

(২) কাশলে বুকে ব্যথা হয়।

(৩) জ্বর হয়।

(৪) আক্রান্ত রোগী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

(১) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ও পথ্য খাওয়া দরকার।

(২) বেশি করে পানি পান করতে হবে।

(৩) পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত এতে শরীর দূর্বল হয় না।

প্লুরিসি

আমরা জানি যে ফুসফুস এক ধরনের দুইস্তর বিশিষ্ট পুরা নামক পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে। পুরা পর্দা আক্রান্ত হয়ে এ রোগ হয়।

কারণ : ফুসফুসের পুরা পর্দা সংক্রমিত হলে এর গহ্বরে এক ধরনের তরল পদার্থ জমে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ

(১) পুরা পর্দা ফুলে যায়।

(২) ফুসফুসের স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

(৩) শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও ব্যথা হয়।

(৪) জ্বর হয়।

প্রতিকার

(১) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

ব্রঙ্কাইটিস

শ্বাসনালীর সংক্রমণকে ব্রঙ্কাইটিস বলে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে।

কারণ

এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

- (১) কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- (২) কাশির সাথে কফ থাকে।
- (৩) জ্বর হয়।
- (৪) শরীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়।

প্রতিকার

- (১) ধূমপান বন্ধ করতে হবে।
- (২) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

হাঁপানি

হাঁপানি ছোঁয়াচে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

কারণ : এলার্জি আছে এমন কোনো জিনিস খেলে, বাতাসে উপস্থিত ধোঁয়া, ধূলা প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ সর্দি থেকে হাঁপানি হতে পারে।

ব্যতিক্রম : বছরের বিশেষ ঋতুতে এ রোগ বেড়ে যায়।

লক্ষণ

- (১) হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
- (২) শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মত হয়।
- (৩) জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে।
- (৪) ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমত অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বলে বেশি কষ্ট হয়।
- (৫) শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভেতর দিকে ঢুকে যায়।
- (৬) কাশির সাথে কখনও কখনও সাদা কফ বের হয়।
- (৭) জ্বর থাকে না।
- (৮) রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- (১) পরিষ্কার মুক্ত বাতাসে থাকার চেষ্টা করা।

- (২) যে জিনিসের সংস্পর্শে আসলে বা খেলে হাঁপানি বাড়ে তা থেকে বিরত থাকা।
- (৩) ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা।
- (৪) ঘোঁয়া, ধুলা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।
- (৫) ধূমপান ছেড়ে দেওয়া।

ধূমপানের কুফল

- (১) ধূমপান করলে ধমনীগাত্র শক্ত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে রক্ত প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।
- (২) ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান। ধূমপায়ীদের ফুসফুস ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ধূমপান থেকে ঠোঁটে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, যারা ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থাকেন তারাও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।
- (৩) ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানি রোগীদের জন্য ধূমপান অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- (৪) ধূমপায়ী পিতামাতার সন্তানদের যে কোনো শ্বাসরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- (৫) ধূমপান শুধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাই নয়, পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতাও আনে।

শ্বসনতন্ত্রের যত্ন

দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের মধ্যে একমাত্র শ্বসনতন্ত্রের অঙ্গসমূহ সরাসরি পরিবেশের সাথে সংযুক্ত। নিম্নলিখিত উপায়গুলোর মাধ্যমে শ্বসনতন্ত্রের যত্ন নেওয়া সম্ভব।

- (১) নির্মল বায়ু সেবন করা।
- (২) ধূমপান ত্যাগ করা।
- (৩) স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস না করা।
- (৪) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কোনো না কোনো ব্যায়াম করা অথবা হাঁটাচলা বা খেলাধুলা করা।
- (৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা।
- (৬) কলকারখানায় বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সময় মুখোশ ব্যবহার করা।
- (৭) ঠান্ডা জাতীয় খাবার গ্রহণ না করা। ঠান্ডা অর্থাৎ হিমায়িত খাবার প্রধানত টনসিলের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর।
- (৮) মাঝে মাঝে হালকা গরম পানি দিয়ে কুলি করা।
- (৯) মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে স্প্রে ও মশার কয়েল ব্যবহার করা হয় তাও যতদূর সম্ভব পরিহার করা।

স্নায়ুতন্ত্র

যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং দেহের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হল মস্তিষ্ক। উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হিসেবে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোষ

বা নিউরোন দ্বারা তৈরি।

স্নায়ুকোষ

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যগত একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরোন বলে। স্নায়ুকোষ মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ। স্নায়ুকোষ দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা (ক) কোষদেহ এবং (খ) প্রলম্বিত অংশ।

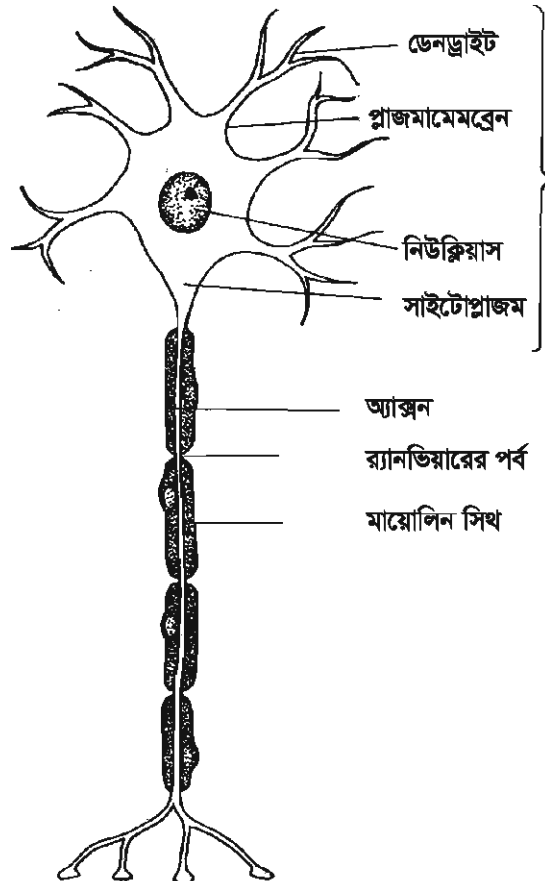
(ক) কোষদেহ : কোষদেহ স্নায়ুকোষের প্রধান অংশ। কোষদেহ বিভিন্ন আকৃতির হয়। যথা- গোলাকার, ডিম্বাকার, নক্ষত্রাকার ইত্যাদি। কোষদেহ কোষ পর্দা, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত।

(খ) প্রলম্বিত অংশ : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই প্রকার যথা- (১) অ্যাক্সন এবং (২) ডেনড্রন।

(১) অ্যাক্সন : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন লম্বা সুতার ন্যায় অংশকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সনের যে প্রান্তে দেহকোষ থাকে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে শাখা বের হয়।

(২) ডেনড্রন : কোষদেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাগুলোকে ডেনড্রন বলে। এগুলো বেশি লম্বা নয়। ডেনড্রন থেকে সৃষ্ট শাখাগুলোকে ডেনড্রাইট বলে।

একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য একটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রনের সাথে মিলিত হওয়ার স্থানকে সাইন্যাপস বলে। অর্থাৎ সাইন্যাপস হচ্ছে দুইটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল। সাইন্যাপস এর মাধ্যমেই স্নায়ু আবেগ এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে যায়।



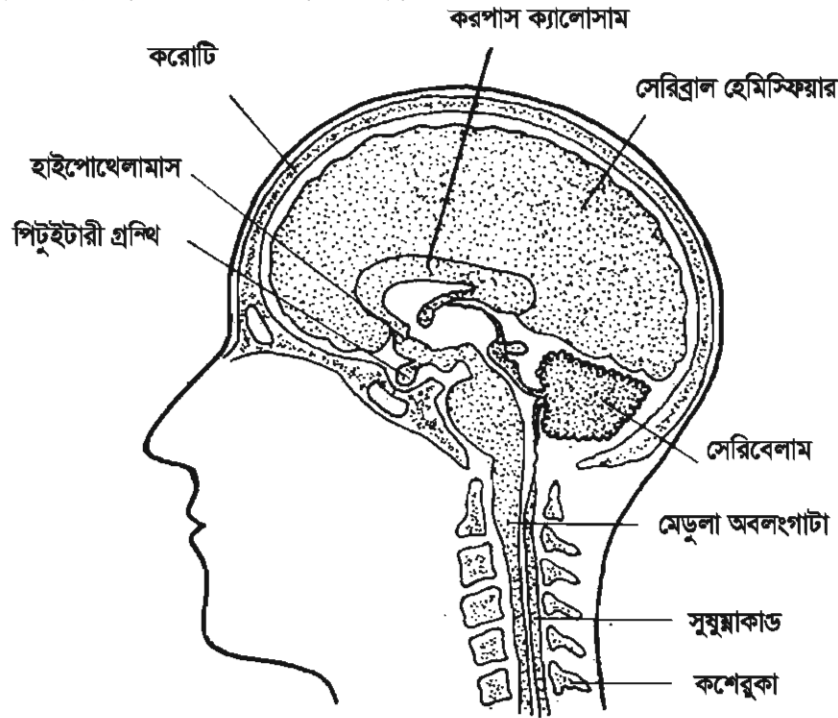
চিত্র ২২.৬ : একটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন

কাজ :

- (১) উদ্দীপনা বহন করা।
- (২) প্রাণী দেহের ভেতরের এবং বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করা।
- (৩) প্রাণী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- (৪) মস্তিষ্কে স্মৃতি ধারণ করা।
- (৫) চিন্তা করা ও বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া।

মস্তিষ্ক

মানুষের মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত। মস্তিষ্ক মেনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান অংশ তিনটি যথা- গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক এবং মেডুলা বা সুষুম্না শীর্ষক।



চিত্র ২২.৭ : মানুষের মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

গুরুমস্তিষ্ক : গুরুমস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান অংশ। গুরুমস্তিষ্কের ঢেউ তোলা অংশ এবং করোটি গহ্বরের উপরিভাগে থাকে। গুরুমস্তিষ্কের বাইরের ভাগকে ধূসর পদার্থ এবং ভেতরের ভাগকে বলে সাদা পদার্থ। গুরুমস্তিষ্কের বাইরের স্তরকে বলে কর্টেক্স। যা অসংখ্য ধূসর বর্ণের স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। ভেতরের স্তরে রয়েছে সাদা রঙের স্নায়ুকোষ তাই এর রং সাদা।

কাজ : গুরুমস্তিষ্ক দেহে চাপ, তাপ, ব্যথা, ভয়, চিন্তা, স্মৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা, খাদ্য গ্রহণ, জনন, রেচন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। বলা চলে দেহের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এ গুরুমস্তিষ্ক।

লঘুমস্তিষ্ক : গুরুমস্তিষ্কের পেছন ভাগে লঘুমস্তিষ্ক অবস্থিত। এর বহির্ভাগ ধূসর এবং ভেতরের ভাগ সাদা।

কাজ : দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা লঘুমস্তিষ্কের প্রধান কাজ। এ ছাড়া কথা বলা, চলাফেরা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্না শীর্ষক : এটা মস্তিষ্কের নিচের অংশ। এটা মস্তিষ্কের বোঁটা স্বরূপ। এর মাধ্যমে গুরুমস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক মেবুরজ্জুর সাথে যুক্ত।

কাজ : মস্তিষ্কের এ অংশ হৃদস্পন্দন, খাদ্য গ্রহণ, শ্বসন ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ু

মস্তিষ্ক থেকে যে সকল স্নায়ু উৎপন্ন হয় তাদেরকে করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম ও কাজ বিশ্লেষণ করা হল।

- (১) অলফ্যাক্টরী স্নায়ু : এটি ঘ্রাণের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।
- (২) অপটিক স্নায়ু : এটি চোখের রেটিনা থেকে দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- (৩) অডিটরি স্নায়ু : এটি কান থেকে শ্রবণ ও ভারসাম্য অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১. বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন

ক. অক্সিজেন	খ. হাইড্রোজেন
গ. নাইট্রোজেন	ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
২. কোন স্থানে অস্থিমজ্জা সৃষ্টি হয়?

ক. পাকস্থলি	খ. যকৃত
গ. অগ্নাশয়	ঘ. ক্ষুদ্রান্ত্র
৩. লসিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
 - i. লসিকায় প্রোটিনের পরিমাণ রক্ত রসের তুলনায় কম
 - ii. লসিকার মাধ্যমে পরিপাককৃত স্নেহ জাতীয় খাদ্য শোষিত হয়
 - iii. লসিকায় শ্বেত রক্ত কণিকা ও অনুচক্রিকা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও iii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৪. ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে এক ধরনের
 - i. শ্বাসনালীর সংক্রমণ
 - ii. ফুসফুসের সংক্রমণ
 - iii. ভাইরাসজনিত রোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৫. হৃদপিণ্ডের কোন স্তরটি সবচেয়ে ভিতরের?

ক. এপিকার্ডিয়াম	খ. পেরিকার্ডিয়াম
গ. এন্ডোকার্ডিয়াম	ঘ. মায়োকার্ডিয়াম
 ৬. স্নায়ুকোষের কোন অংশটি সবচেয়ে লম্বা?

ক. দেহকোষ	খ. ডেনড্রন
গ. ডেনড্রাইট	ঘ. এক্সন
 ৭. কোন রোগটি জীবাণু বাহিত নয়?

ক. যক্ষা	খ. হাম
গ. হাঁপানি	ঘ. ইনফ্লুয়েঞ্জা

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিয়াসাত খেলতে গিয়ে পা কেটে ফেলে। প্রথমে সে খেয়াল না করলেও এক সময় ব্যথা অনুভূত হওয়ায় তাকিয়ে দেখে পায়ের এক জায়গায় রক্ত জমাট বেধে গেছে।

৮. রিয়াসাতের পায়ের রক্ত জমাট বাধায় ভূমিকা রাখে

ক. শ্বেত কণিকা

খ. লোহিত কণিকা

গ. অনুচক্রিকা

ঘ. রক্ত রস

৯. রিয়াসাত ব্যথা বুঝতে পেল-

i. স্নায়ুকোষের মাধ্যমে

ii. হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে

iii. মস্তিষ্কের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

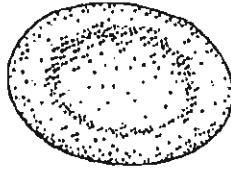
খ. i ও iii

গ. ii ও iii

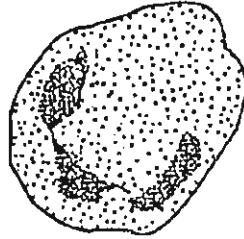
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্র -A



চিত্র -B



চিত্র - C

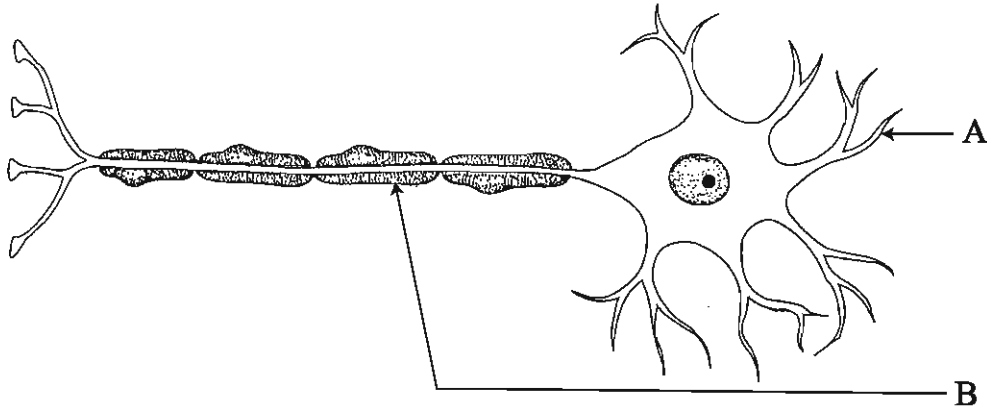
ক. C চিত্রটি কিসের?

খ. চিত্র A ও B এর মধ্যে ২টি পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

গ. আমাদের দেহে চিত্র A এর সংখ্যা কমে গেলে কী সমস্যা হবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শরীরবৃত্তীয় কাজে চিত্র A, B ও C এর ভূমিকা আলোচনা কর।

২.



ক. ওপরের চিত্রটি কিসের?

খ. চিত্রের কোষটির ২টি প্রধান কাজ বর্ণনা কর।

গ. অনুভূতি তৈরিতে চিত্রের A ও B এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কোষটি সাধারণ কোষ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কি না তা যুক্তি সহকারে লিখ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি

অন্ধত্ব : যে কোনো কারণে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে প্রথমে রোগী ঝাপসা দেখে পরে কোনো এক সময় একেবারেই দেখতে পায় না এ অবস্থাকে আমরা অন্ধত্ব বলি।

অন্ধত্বের কারণ : আমাদের দেশে অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে ছানি পড়া। কোনো কারণে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে তাকে আমরা ছানি পড়া বলি। বিভিন্ন কারণে চোখে ছানি পড়ে। তবে ছানি পড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বার্ধক্য। এ ছাড়া চোখে যে কোনো আঘাত পেলে, বহুমূত্র রোগ হলে, জন্মগত কোনো কারণে, চোখের ভেতরে কোনো অসুখ হলে ও চক্ষু রোগ হলে রেডিয়েশনের কারণে চোখে ছানি পড়তে পারে। চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে। পূর্বে বসন্ত রোগে অনেক মানুষকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে দেখা গেছে। ঘন ঘন ডায়রিয়া হলে এবং ভিটামিন 'এ'- এর অভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। এ ছাড়া রাতকানা রোগ হতে দেখা যায়।



চিত্র ২৩.১ : ছড়ি হাতে অন্ধ

অন্ধত্বের লক্ষণ : চোখে ছানি পড়লে যে সব লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হল- (১) প্রথমে চোখে ঝাপসা দেখা (২) দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া (৩) অল্প আলোতে দেখতে না পাওয়া (৪) দূরে কুয়াশার মত দেখা (৫) অনেক সময় একটি জিনিসকে দুইটি হিসেবে দেখা ইত্যাদি।

অন্ধত্বের প্রতিরোধ : বার্ধক্য ছাড়াও কোনো কোনো

কারণে চোখে ছানি পড়তে পারে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। অনেকের চোখে জন্মগত বা শৈশবকালে ছানি পড়তে দেখা যায়। যে কোনো কারণেই ছানি পড়ুক না কেন তার কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। আছে প্রতিকার বা চিকিৎসা। আজ পর্যন্ত বিশ্বে এমন কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি যা দিয়ে অন্ধত্ব নিবারণ করা যায়।

অন্ধত্বের প্রতিকার : ছানি পড়ার প্রথম দিকে চশমা দিয়ে কিছুটা ঝাপসা ভাব দূর হয়। তবে পরবর্তী সময়ে যখন ছানি বেড়ে যায় তখন একমাত্র অপারেশনের মাধ্যমেই চোখের দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায়। বর্তমানে ছানি পড়া লেন্সকে অপারেশনের মাধ্যমে বের করে সে স্থানে একটি কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়। এর ফলে রোগী তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পায়। যদি কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন না করা হয় তবে মোটা চশমা ব্যবহার করতে হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে আজকাল ছানিজনিত কারণে অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব। বর্তমানে প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে চক্ষু বিভাগ রয়েছে। তা ছাড়া জেলা শহরে চক্ষু চিকিৎসক ছানির ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন। অধিকন্তু টাকা পয়সা খরচ না করেও চক্ষু শিবিরে ছানির অপারেশন করানো যেতে পারে। কারণ যে কোনো রোগী এ সব শিবির থেকে সেবা পেতে পারেন।

চোখ ওঠার চিকিৎসা ও প্রতিকার : অন্ধত্ব ছাড়াও আমাদের দেশে চোখ ওঠা কোনো কোনো সময় ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং তা থেকে রেহাই পাবার বা আক্রান্ত হলে কী করতে হবে তা আমাদের সবার জন্য জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

চোখের পাতার ভেতরের অংশ এবং চোখের গোলাকার অংশের বাইরের অংশ এক প্রকার ঝিল্লি দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ঝিল্লি বা পর্দার নাম কনজাংটিভা। এ পর্দার প্রদাহকে চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস বলে। চোখের এ পর্দায় বিভিন্ন কারণে প্রদাহ হতে পারে। তবে প্রদাহ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সংক্রান্ত এবং কখনও এলার্জিকজনিত কারণে হয়ে থাকে।

লক্ষণ বা উপসর্গ : (১) চোখ লাল হয় (২) কখনও কখনও চোখের পাতা ফুলে যায় (৩) চোখ দিয়ে পানি পড়ে (৪) চোখে ময়লা পিচুটি বা কেতুর হয় (৫) চোখে ঝাপসা দেখে (৬) চোখে কাঁটা কাঁটা ভাব বা খচখচে বোধ হয়।

ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিশেষ লক্ষণ : উপরিউক্ত লক্ষণ ছাড়া ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিশেষ লক্ষণ হল চোখে পিচুটি জমে চোখের পাতা দুইটি বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসায় বিলম্ব হলে মণিতে ঘা হতে পারে।

চিকিৎসা : (১) পরিষ্কার পানিতে তুলা ভিজিয়ে চোখ পরিষ্কার করা (২) চোখে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা (৩) ডাক্তারের পরামর্শমত চোখের ড্রপ বা মলম যথাযথভাবে ব্যবহার করা।

ভাইরাসের লক্ষণ : চোখ লাল হওয়া, প্রথমে এক চোখ পরে দুই চোখ আক্রান্ত হয়। খচখচে করা ও পানি পড়া, সমান্য ফুলে ওঠা, চোখে কেতুর হওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা : পরিবারের কারো ভাইরাসজনিত কারণে চোখ উঠলে তার আলাদা থাকা দরকার। ব্যবহার্য বুমাণ ও তোয়ালে আলাদা রাখা দরকার। ঈষৎ উষ্ণ পানিতে তুলা ভিজিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শমত চোখে নিয়মিত ওষুধ লাগাতে হবে। প্রয়োজনে ওষুধ খেতেও হতে পারে। কোনো ক্রমেই শামুকের পানি, পাতার রস, গোলাপ জল ইত্যাদির দেওয়া উচিত নয়।

এলার্জিকজনিত চোখ ওঠা : চোখে কাজল, আইবু, মাসকারা এমনকি সুরমা ব্যবহারে এলার্জি হতে পারে।

লক্ষণ : (১) চোখ অত্যন্ত চুলকায় এবং ফুলে লাল হয়ে যায় (২) চোখ দিয়ে পানি পড়ে (৩) কেতুর বা পিচুটি হয়।

চিকিৎসা : পানি ঝাপটা দিয়ে চোখ ভালভাবে ধুয়ে ফেলা। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ক্যান্সার : ক্যান্সার একটি জীবনঘাতী রোগ। বিশ্বের দূরারোগ্য ব্যাধির মধ্যে এইডস- এর পরই ক্যান্সারের স্থান। এখন পর্যন্ত ক্যান্সারে তেমন কোনো স্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। ক্যান্সারের ঠিক কারণ এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে। ফুসফুস, যকৃত, পাকস্থলি, জিহবা, স্তনে ক্যান্সার হতে দেখা যায়। টিউমার বা ক্ষত দীর্ঘদিন ভালো না হলে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। যে স্থানে ক্যান্সার হয় সেখানকার কোষগুলো বিশেষ ধরনের। খুব দ্রুত বিভাজিত হয় এবং দেহের পুষ্টিকর উপাদান ব্যবহার করে নেয়। পরবর্তী ধাপে ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গ থেকে ক্যান্সার কোষ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। লিউকোমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ অসংখ্য শ্বেত কণিকা রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাগুলো ধ্বংস করে ফেলে।

ক্যান্সার কী ও কীভাবে হয় ?

ক্যান্সারের লক্ষণ

- (১) দিন দিন ওজন কমে যাওয়া।
- (২) খুসখুসে কাশি কিংবা ভাঙা কঠিন।
- (৩) ক্ষত সহজে না শুকানো।
- (৪) ক্ষতস্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হওয়া।
- (৫) শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিণ্ডের সৃষ্টি হওয়া।

(৬) গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং হজমে ব্যাঘাত হওয়া ।

(৭) তিল বা আঁচিলের স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দেওয়া ।

ক্যান্সার নির্ণয় পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় । যেমন-

(১) অল্পে ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য এন্ডোসকপি করানো ।

(২) লিভার ক্যান্সার আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে সরাসরি নিডল বায়োপসি করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে শনাক্ত করা যায় ।

(৩) জরায়ুর ক্যান্সার পাপটেস্টের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় ।

তবে ক্যান্সার নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হল রক্ত ও অস্থিমজ্জা পরীক্ষা করা ।

ক্যান্সারের প্রতিকার : আজ পর্যন্ত ক্যান্সার রোগের তেমন কোনো স্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি । তবে ক্যান্সার প্রতিরোধ করার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

ক্যান্সারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বিশেষজ্ঞগণের মতে ক্যান্সার সৃষ্টির পেছনে ধূমপান, মদ্যপান, অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া, পাশাপাশি শাকসবজি কম খাওয়া, শারীরিক শ্রম না করা ইত্যাদি জড়িত । কেবলমাত্র ধূমপান ও তামাক সেবন বন্ধ করা হলে শতকরা ৩০ ভাগ ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন ।

১৯৮১ সালে দুইজন ব্রিটিশ রিচার্ড হল এবং রিচার্ড পেট্রো জানান যে পরিমিত শাকসবজি খাওয়ার মাধ্যমে ক্যান্সারে মৃত্যুর শতকরা ৩৩ ভাগ কমানো সম্ভব । আমেরিকার ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ট্রেল এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বিভিন্ন শাকসবজি বিভিন্ন রকম ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে । যেমন-

(ক) **অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার :** টমেটো, তরমুজ, বাতাবি লেবু, কমলা, কাগজি লেবু, ইত্যাদি সবজি ও ফল অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ।

(খ) **বুক, পাকস্থলি ও মল্লারের ক্যান্সার :** গাজর, পেঁপে, লালশাক, পুঁইশাক, কচুশাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সরিষার পাতা, শালগম, এবং সবুজ ও রঙিন শাকসবজি ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ।

(গ) **মূত্রথলি বা মূত্রথলির ক্যান্সার :** সয়াবিন, শিম, মটরসুটি, মসুর, বরবটি ও অন্যান্য শিম জাতীয় খাদ্য মূত্রথলি বা মূত্রথলির ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক ।

(ঘ) **স্তন ও মস্তিষ্কের ক্যান্সার :** বাঁধাকপিতে জেনিস্টেন নামক উপাদান স্তন, প্রোস্টেট ও মস্তিষ্কের ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে ।

পরিশেষে বলা যায়, ক্যান্সার নামক ঘাতক ব্যাধির কার্যত কোনো চিকিৎসা না থাকলেও প্রতিরোধ আছে । তাই সবার খাদ্য তালিকায় এ সব শাকসবজি ও ফলমূল প্রধান্য পাওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস : অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে যে গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামক হরমোন তৈরি হয় । এ হরমোন শরীরের শর্করা পরিপাক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি না হয় তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হওয়ার দরুন যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে ।

খালি পেটে না থাকা অবস্থায় একজন লোকের রক্ত রসে যদি ৭.৮ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ এবং খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে রক্ত রসে যদি ১১.১ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ থাকে তবে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়। ডায়াবেটিস সাধারণত বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিসের লক্ষণ

কোনো ব্যক্তি বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হলে তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যাবে- (১) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া (২) খুব বেশি পিপাসা লাগা (৩) ক্ষুধালাগা (৪) প্রচুর খাওয়া সত্ত্বেও শরীরের ওজন কমে যাওয়া (৫) ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা (৬) চোখে কম দেখা (৭) চামড়া রুক্ষ হয়ে যাওয়া (৮) কেটে গেলে বা খোস পাঁচড়া হলে সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস কাদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা

যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বয়সে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(১) কোনো ব্যক্তির বংশে যেমন- বাপ, মা, নিকট আত্মীয়ের বহুমূত্র রোগ থাকলে তাদের বহুমূত্র রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(২) কোনো ব্যক্তির অতিরিক্ত ওজন থাকে তাদের বহুমূত্র রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

(৩) যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে না তাদের বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা

ডায়াবেটিস রোগ পুরোপুরি নিরাময় করা যায় না কিন্তু এ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবেটিস রোগীদের তিনভাবে চিকিৎসা করা যায়। শুধু খাবার, খাবার বড়ি এবং ইনসুলিন।

(ক) শতকরা ৬০ ভাগ নতুন রোগীদের শুধু খাবার নিয়ন্ত্রণ করে চিকিৎসা করা যায়।

(খ) শতকরা ২০ ভাগ রোগীকে খাবার এবং খাবার বড়ি খেয়ে সুস্থ রাখা যায়।

(গ) শতকরা ২০ ভাগ রোগীর ইনসুলিন ও খাবার নিয়ন্ত্রণ করে চিকিৎসা করা সম্ভব।

সুতরাং ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা হল তিনটি 'ডি' অর্থ্যাৎ (১) ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা (২) ডায়েট বা খাবার (৩) ড্রাগ বা ঔষধ।

ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

ডায়াবেটিস রোগ প্রধানত তিনটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

(১) **শৃঙ্খলা** : শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর মহৌষধ স্বরূপ। এ রোগীকে সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। এ ছাড়া আর যে সব দিকে যত্নবান হতে হয় তা হচ্ছে (ক) নিয়মিত ও পরিমিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা (খ) নিয়মিত ব্যায়াম করা (গ) রোগীর সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা (ঘ) পায়ের যত্ন নেওয়া (ঙ) নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা এবং (চ) কোনো প্রকার শারীরিক অসুবিধা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তার দেখানো।

(২) **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ** : খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান ব্যবস্থা। ডায়াবেটিস রোগীকে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খাওয়া সম্পূর্ণ বর্জন করা। সুষম খাদ্য নিয়মিত সময়মত খাওয়া।

(৩) ওষুধ : ডাক্তারের পরামর্শমত নিয়মিত ওষুধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেওয়া।

জন্ডিস

আমরা প্রায় সবাই কম বেশি জন্ডিস নামের সাথে পরিচিতি। আসলে কিন্তু জন্ডিস কোনো রোগ নয় এটি রোগের উপসর্গ মাত্র।

জন্ডিসের কারণ : যকৃত বা লিভারের কোষগুলো কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা নেশা উদ্দেহকারী বস্তু কারণে ধ্বংস হলে রক্তে পিগুরস বা বিলিবিউবিনের মাত্রা বেড়ে জন্ডিসের উৎপত্তি হয়। জন্ডিসের উৎপত্তি চারভাবে হতে পারে। যথা- (১) লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙ্গন (২) যকৃতের পিগুরস বা বিলিবিউবিন ঠিকমত পরিবহণ না হলে (৩) লিভার কোষ নষ্ট হলে এবং (৪) লিভার থেকে পিগুরস ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে বাধা পেলে।

জন্ডিস প্রধানত এ বি সি ডেল্টাই ভাইরাসের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে বি ভাইরাস মারাত্মক।

জন্ডিসের লক্ষণ

(১) শরীর ম্যাজম্যাজ করা (২) মাথা ব্যথা করা এবং শীত শীত ভাব অনুভব করা (৩) হঠাৎ করে বমি বমি ভাব অনুভব করা (৪) ক্ষুধা মন্দা হওয়া এবং দুর্বলতা অনুভব করা (৫) বমি ও পাতলা পায়খানা হওয়া এবং পায়খানার রং সাদাটে হওয়া (৬) যথেষ্ট পানি পান করা সত্ত্বেও চোখ, ত্বক ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হওয়া (৭) ডান দিকের পাজরের নিচে ব্যথা হওয়া (৮) লিভার বড় হয়ে যাওয়া।

জন্ডিসের প্রতিকার

জন্ডিসের কোনো ওষুধ নাই। জন্ডিসের রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা যায়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম জন্ডিস নিরাময়ের একমাত্র ব্যবস্থা। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে রোগীকে ঘুমের ওষুধ এমনকি প্যারাসিটামল জাতীয় বড়িও দেওয়া ঠিক নয়। রোগীকে চর্বি জাতীয় খাদ্য ছাড়া পুষ্টিকর খাদ্য যার মধ্যে পর্যাপ্ত আমিষ ও শর্করা থাকে এবং ফলের রসও দেওয়া যেতে পারে।

অধুনা লিভার বিশেষজ্ঞরা গ্লুকোজ শরবত, আখের রস, ডাবের পানি ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়াতে বারণ করেন। কারণ এতে রোগীর পেট ফেঁপে যায় এবং ক্ষুধামন্দা হয়। পরিণামে রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।

জন্ডিসের প্রতিরোধ

হেপাটাইটিস 'এ' ভাইরাসের কারণে লিভার আক্রান্ত হয়ে থাকলে যথাযথ বিশ্রামেই সেরে যায়। হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত হলে 'বি' ভাইরাসের টিকা সব কয়টি ডোজ গ্রহণ করতে হবে।

রক্তচাপ

মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ড সংকোচনের ফলে রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হওয়ার দরুন শিরা থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে। যখন কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ নিচে ৮০ মিলিমিটার এবং উপরে ১২০ মিলিমিটার মার্কারীতে থাকে তখন তাকে স্বাভাবিক রক্তচাপ বলে। অবশ্য বয়স ও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে রক্তচাপ মাত্রা এর কম বা বেশি হতে পারে।

উচ্চরক্তচাপ

উচ্চরক্তচাপের কোনো বাধাধরা সংজ্ঞা নেই। তবে উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন এর অর্থ স্বাভাবিক চাপের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ স্বাভাবিক বিশ্রামের অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের রক্তচাপ যদি স্থায়ীভাবে নিচে ৯০ মিলিমিটার এবং উপরে ১৪০ মিলিমিটার মার্কারী বা তদুর্ধ্ব থাকে তখন তাকে উচ্চরক্তচাপ বলা হয়। সাধারণত রক্তচাপ বয়সের ওপর

নির্ভরশীল। যেমন-

- (১) একজন নবজাতকের রক্তচাপ উপরে ও নিচে যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে থাকে।
- (২) বিশ বছর বয়স্ক একজন লোকের রক্তচাপ উপরে ও নিচে যথাক্রমে ১২০ ও ৭০ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে থাকে।
- (৩) চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন লোকের রক্তচাপ উপরে ও নিচে যথাক্রমে ১৫০ ও ৯০ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে থাকে।

উপরিউক্ত চাপের বেশি হলে উচ্চরক্তচাপ বলে গণ্য করা হয়।

রক্তচাপ পরিমাপ পদ্ধতি : রক্তের স্বাভাবিক চাপ দুইটি ভিন্ন অবস্থায় পরিমাপ করা হয়। যেমন-

- (১) যখন হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয় তখন বেশ কিছু পরিমাণ রক্ত হঠাৎ করে ধমনীসমূহে প্রবেশ করে তখনই যে রক্তচাপের পরিমাপ নেওয়া হয় তাকে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোলিক প্রেসার বলে।
- (২) হৃৎপিণ্ড সংকোচনের পর মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড শ্লথ এবং নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে প্রসারণ বা ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে। যেমন- সংকোচন ১২০ এবং প্রসারণ ৮০ মিলিমিটার মার্কারী হয়।

উচ্চরক্তচাপে কী কী ক্ষতি হতে পারে ?

উচ্চরক্তচাপে মানুষের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন- হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং বৃক্ক। উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে (১) হৃদরোগ (২) ব্রেন স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা এবং (৩) কিডনির রোগ হতে পারে। তা ছাড়া চোখেরও সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে।

উচ্চরক্তচাপের কারণ

উচ্চরক্তচাপের কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজানা রয়েছে। আজও ৯০% উচ্চরক্তচাপ রোগীর ঠিক কারণ বোঝা যায় না- যাকে চিকিৎসকগণ প্রাইমারী হাইপারটেনশন বলে থাকেন। অবশিষ্ট ১০% রোগীর কারণ জানা যায়। তবে এদের মধ্যে অধিকাংশেরই কিডনির কারণে উচ্চরক্তচাপ হয়ে থাকে। কিডনি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থি রোগের জন্যও রক্তচাপ হতে পারে। এ ছাড়া গর্ভবতী মহিলাদের উচ্চরক্তচাপ হতে পারে।

উচ্চরক্তচাপের লক্ষণ বা উপসর্গ

উচ্চরক্তচাপের রোগীর মধ্যে যে সব লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় তা হচ্ছে-

- (১) মাথা ব্যথা হয় এবং কোনো কোনো সময় মাথার পিছনে ঘাড়ে তীব্র থেকে তীব্রতর ব্যথা হয়।
- (২) হঠাৎ করে শরীর ঘাম দিয়ে নিম্নেতজ হয়ে যায়।
- (৩) বুক ধড়ফড় করে এবং ব্যথা হয়।
- (৪) ক্লান্তিবোধ করে এবং চক্ষু অনায়াসে বন্ধ হয়ে আসে।
- (৫) আওয়াজ বা শোরগোল অসহ্য বলে মনে হয়।
- (৬) কোনো কোনো সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
- (৭) একজন মধ্য বয়সী লোকের যখন ক্রমাগত রক্তচাপ উপরে ১৬০ এবং নিম্নে ৯৫-এর বেশি হয় তবে তার

উচ্চরক্তচাপ আছে বলা যায়। রক্তচাপ তীব্রতর হলে তা ২০০ পর্যন্ত উঠে এবং নিচে ১২০ বা তদূর্ধ্ব থাকে।

উচ্চরক্তচাপের প্রতিরোধ : উচ্চরক্তচাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

- (১) যথাসময়ে উচ্চরক্তচাপ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্বিত হলে অনেক সময় রোগী প্যারালাইসিস, হৃদরোগ এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। সে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- (২) নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম, আহার গ্রহণ এবং মেদবহুল খাদ্য গ্রহণ ও ধূমপান ইত্যাদি পরিহার করলে উচ্চরক্তচাপ থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।
- (৩) চিকিৎসকের পরামর্শমত উচ্চরক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত।

উচ্চরক্তচাপের প্রতিকার

- (১) চিকিৎসার মাধ্যমে উচ্চরক্তচাপ কমিয়ে রোগীকে প্যারালাইসিস, হৃদরোগ এবং কিডনি রোগ থেকে রক্ষা করা।
- (২) ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ গ্রহণ বা বর্জন করা কোনো ক্রমেই ঠিক নয়।
- (৩) শরীরের ওজন ঠিক রাখা, ধূমপান বন্ধ করা এবং খাদ্যে লবণের পরিমাণ কমানো এবং অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখা।
- (৪) সামুদ্রিক মাছ, মুরগির মাংস, ডিমের সাদা অংশ, ননীহীন দুধ, ডাল জাতীয় খাদ্য, ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় থাকা উচিত।

হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে গেলে কী করা দরকার

- (১) শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া।
- (২) কোনো ক্রমেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না।
- (৩) অস্থিস্তিবেধ করলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

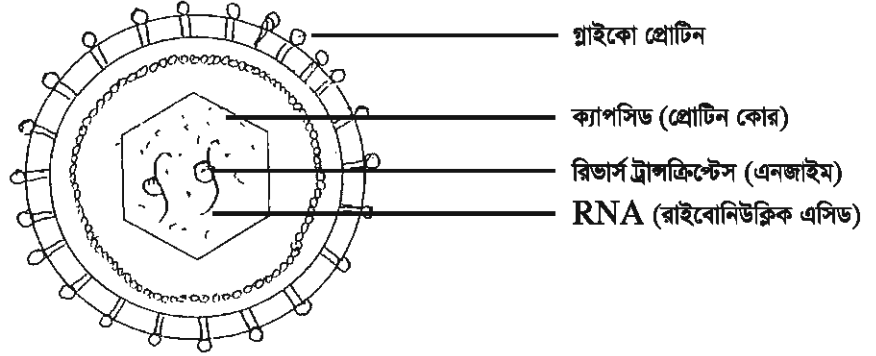
এইডস

বিশ্বে যে কয়টি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে এইডস অন্যতম। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে প্রথম এইডস রোগীর সম্মান পাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময় ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ওষুধ এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। ফলে, এইডস-এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু।

এইচআইভি ও এইডস কী?

মানবদেহে HIV-Human Immunodeficiency Virus এর আক্রমণে এইডস AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) রোগ হয়। HIV এক ধরনের রেন্ট্রো (Retro) ভাইরাস (চিত্র) যা নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যান্য রোগে (যেমন : নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এই রোগ ভাল হয় না। এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

এইচআইভি গঠন :



চিত্র : Retro virus

ভাইরাসটি গোলাকার এর ওপরে পিনহেক সদৃশ গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় বস্তু উপস্থিত। এই গোলাকার গঠনের ভিতরে ষড়ভুজাকৃতির ক্যাপসিডের RNA ও রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেসি অবস্থিত।

এইচআইভি সংক্রমণের উপায় :

নিচে সংক্রমণের উপায়সমূহ উল্লেখ করা হল :

- এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত এবং অপারেশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, যেমন :
 - * এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত কোনো দেহে পরিসঞ্চালন (Transfusion)
 - * এইচআইভি সংক্রমিত রোগীর ব্যবহৃত সুচ, সিরিঞ্জ অথবা অপারেশনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
 - * এইচআইভি সংক্রমিত অঙ্গ বা কোষসমষ্টি (Tissue) কোনো ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন
- অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে
- এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়ে এবং মায়ের দুধ পানে) তার শিশু সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস-এর লক্ষণসমূহ

- শরীরের ওজন দ্রুত কমে যাওয়া
- অজানা কারণে দুমাসেরও অধিক সময় ধরে জ্বর থাকা
- দীর্ঘদিন ধরে শুকনা কাশি থাকা
- দুমাসেরও অধিক সময় ধরে পাতলা পায়খানা হওয়া
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেওয়া
- লসিকা গ্রন্থি (Lymph Gland) ফুলে যাওয়া

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত একাধিক লক্ষণ দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সকল লক্ষণ দেখা দেয় তাহলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যাবে না। তবে, এ জাতীয় লক্ষণগুলো দেখা দিলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

যৌন রোগ এবং এইচআইভি

যেসব রোগ সাধারণত নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশার মাধ্যমে ছড়ায় সেসব রোগকে যৌনরোগ বলা হয়। যেমন-গনোরিয়া, সিফিলিস, জেনিটাল হারপিস ইত্যাদি। উল্লেখ্য যাদের যৌন রোগ নেই তাদের তুলনায় যাদের যৌন রোগ রয়েছে তাদের এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

এইডস-এর প্রতিরোধ

এইডস-এর এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা নেই। তাই, এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দৈনন্দিন জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করা। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা হল :

১. আমাদের সকল আচরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
২. কোনো কারণে রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কি- না তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নেওয়া।
৩. প্রতিবারই নতুন সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
৪. অপারেশনের সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করা।
৫. এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া।
৬. নারী এবং পুরুষের মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধতা, বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৭. এইচআইভি/এইডস-এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

এইডস নিয়ন্ত্রণে আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা হওয়া

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আত্মসচেতন ও দৃঢ়চেতা হওয়া অত্যাবশ্যিক। বয়ঃসন্ধিকালে যৌনাবেগ থাকে প্রবল। নিজেদের শরীর সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের যথেষ্ট কৌতুহল থাকে এবং নানাভাবে তারা তা নিরসন করতে চেষ্টা করে। ফলে কী হতে পারে সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা থাকে না। এই কৌতুহল নিবারণ করতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই নিজের শরীর সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে এই কিশোর-কিশোরীরা তাদের অশালীন আবেগ সংযত রাখতে সচেষ্ট হবে। এজন্য কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা হতে হবে। ফলে কোনো বন্ধু বা সঙ্গী তার সাথে কোনো অসংযত আচরণ করলে বা এরূপ কোনো ইজ্জিত দিলে সে তখন দৃঢ়চিত্তে তা প্রতিহত করতে পারবে। জানবে এইডস এর পরিণতি কী। তাই সে সঙ্গীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। আমরাও দৃঢ়চেতা হব এবং এইডস-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

এইচআইভি/এইডস : বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারসহ চীন, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল এবং থাইল্যান্ডেও এইচআইভি/এইডস এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে। এইডস এমনই মারাত্মক ও ভয়াবহ যে, এটি মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এইডস মানবসভ্যতা এবং এর ক্রমাগত উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা।

শিক্ষার্থীদের করণীয় (শ্রেণীর কাজ) :

বিশ্ব মানচিত্রে এইচআইভিতে আক্রান্ত দেশ/ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করা। চিহ্নিত করার কাজটি তিনটি ভাগে দেখানো যেতে পারে :

HIV/AIDs-এর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত অঞ্চল
HIV/AIDs-দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এমন দেশ/অঞ্চল

বাংলাদেশের প্রতিবেশী যে সব দেশে HIV/AIDs-বিস্তার লাভ করছে সেগুলো চিহ্নিত করা।

২০০৭ সালের শেষ অবধি বিশ্বে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩.৩ মিলিয়ন। বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১১,০০০ মহিলা ও পুরুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। UNAIDS ২০০৭ এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী প্রতি বছর নতুনভাবে এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই হচ্ছে ২৫ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরী/যুবক-যুবতী। এর কারণ তাদের শারীরিক পরিবর্তন ও বয়সের আবেগ। এছাড়া আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন কারণ, যেমন-শিক্ষা সুযোগের অভাব, স্বাস্থ্যসেবা সুযোগের অভাব ও আর্থিক অসামর্থ্য বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের অল্প বয়সী জনগোষ্ঠীকে এইচআইভি সংক্রমণে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তবে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি এখনো মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। কিন্তু একই সূচ ও সিরিজ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার মহামারী পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের একটি বড় অংশই হচ্ছে দেশের কিশোর ও যুবসমাজ। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে মারাত্মক আকার ধারণ না করলেও বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো অবকাশ নেই। ২০০৭ সালে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৭৫০০। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে এবং এইচআইভি প্রতিরোধের উপায়গুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নারীর দুর্বল অবস্থান, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব, অল্প বয়সে বিয়ে, পুরুষের আধিপত্য, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীদের গৌণ ভূমিকা ইত্যাদি কারণে পুরুষের তুলনায় নারীরা এ দেশে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের জন্য একটি কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করার এখনই যথার্থ সময়। নতুবা অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে এইচআইভি প্রাদুর্ভাবের (Prevalence) হার অত্যন্ত উচ্চমাত্রা ধারণ করবে এবং এর নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে।

শিক্ষার্থীদের করণীয় (বাড়ির কাজ/শ্রেণীর কাজ) :
শিক্ষার্থী তার আত্মীয়-পরিজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। তারা কোন কোন উপায়কে অধিক কার্যকর মনে করে এবং কেন করে তা শুনবে। এর আলোকে প্রতিবেদন লিখবে এবং শ্রেণীতে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

মাদকাসক্তি

মাদকদ্রব্য : মাদকদ্রব্য সম্পর্কে সর্বজন গৃহীত কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে বিভিন্ন দেশ তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিকের ওপর ভিত্তি করে নানা ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। তবে বিভিন্ন দিকের সার কথা থেকে যা পাওয়া যায় তা হল-

যে সব দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা আনয়ন করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি এবং ব্যথা উপশম করে তাই হল মাদকদ্রব্য। যখন কোনো ব্যক্তি এ সব দ্রব্য সেবন ছাড়া চলতে পারে না অর্থাৎ এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন ঐ ব্যক্তিকে আমরা মাদকাসক্ত ব্যক্তি বলে থাকি।

মাদকদ্রব্য কোনগুলো?

আমাদের দেশে সাধারণত গাঁজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, হেরোইন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া বিশ্বে কোকেন ও আফিম থেকে তৈরী পেথেড্রিন, থিরাইন, কোডেইন এবং বার্বিচুরেট ও এলএসডি থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী মেথাডন, ডায়াজেপাম (সিডালেক্সন, রিলাক্সেন) তৈরি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে আরও রয়েছে তরল অ্যালকোহল শ্রেণীর মদ, যেমন- রাম, ভদকা, হুইস্কি ইত্যাদি।

মাদকের প্রতি আসক্ত হয় কেন?

মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। এ সব কারণসমূহকে পরিবেশগত, সামাজিক, মানসিক, ওষুধ সংক্রান্ত ইত্যাদি শ্রেণীতে আওতাভুক্ত করা যায়। মানুষ যে সব সুনির্দিষ্ট কারণে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার করে নেশাগ্রস্ত হয় সেগুলো হল:

(১) মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহল (২) বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব (৩) নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশা (৪) সহজ আনন্দ লাভের বাসনা (৫) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা (৬) নৈতিক শিক্ষার অভাব (৭) কৈশোর ও যৌবনের বেপরোয়া মনোভাব (৮) পরিবারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার (৯) পারিবারিক কলহ ও অশান্তি (১০) বেকারত্ব, আর্থিক অনটন ও জীবনের প্রতি হতাশা (১১) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা।

মাদকাসক্তির কুফল

মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানুষের যে যে দিকে ক্ষতি হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল:

- (১) **মানসিক** : উত্তেজনা, চরম অবসাদ, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অসংলগ্ন ব্যবহার, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।
- (২) **শারীরিক** : ক্ষয় রোগ, রক্ত দূষণ, কর্মক্ষমতা হ্রাস, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা মন্দা, স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা যায়।
- (৩) **সামাজিক** : জীবনের প্রতি হতাশা, কাজে অনীহা, পারিবারিক অশান্তি, অপরাধ প্রবণতা, সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ইত্যাদি।
- (৪) **আর্থিক** : সর্বস্বান্ত পরিবার পরিজনকে অনটনে ফেলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রবণতা বৃদ্ধি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পাতা, শেষ বয়সে অতিকষ্টে ও নিঃসজ্জা জীবনযাপন ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়

- (১) নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।
- (২) বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- (৩) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা।
- (৪) মাদকদ্রব্যের কুফল সবার কাছে তুলে ধরা।
- (৫) অসৎ বন্ধুদের নিকট থেকে দূরে থাকা।
- (৬) মাদকদ্রব্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।
- (৭) সমাজে মাদকদ্রব্যের প্রসাররোধে সামাজিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- (৮) কাহিনী, গল্পের আকারে মাদকদ্রব্য সেবনকারীর পরিণতি তুলে ধরা।
- (৯) মাদকাসক্তদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।
- (১০) মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোধে গৃহীত পদক্ষেপ

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধিদপ্তর ২রা জানুয়ারি ১৯৯০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। মহাপরিচালক হলেন এ অধিদপ্তরের প্রধান। দেশের মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় চারটি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এ সব আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধে যথেষ্ট অবদান রাখছে। নিম্নে প্রধান প্রধান অবদান উল্লেখ করা হল :

(১) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ সনে প্রবর্তন করে। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ৪টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রে বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগ রয়েছে। বাকি তিনটিতে কেবল বহিঃবিভাগ আছে। আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার জনকে চিকিৎসা করা হয়েছে বলে জানা যায়।

(৩) বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিরোধকল্পে গৃহীত মহাপরিকল্পনার প্রধান তিনটি অঙ্গ হল (ক) আইন প্রয়োগ এবং আইনগত সহায়তামূলক প্রকল্প (খ) নিরোধ শিক্ষা এবং তথ্য প্রকল্প এবং (গ) মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রকল্প।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ইনসুলিন কোন রোগের ঔষধ ?

ক. বহুমূত্র

খ. জন্ডিস

গ. উচ্চ রক্তচাপ

ঘ. ক্যান্সার

২. ক্যান্সার সম্পূর্ণভাবে নির্ণয়ে একমাত্র পরীক্ষা হল

ক. বিলিরুবিন পরীক্ষা

খ. রক্তচাপ পরিমাপ

গ. অস্থিমজ্জা পরীক্ষা

ঘ. প্রস্রাবের গ্লুকোজ পরীক্ষা

৩. জন্ডিস রোগীর করণীয়

i. চর্বিযুক্ত খাওয়া পরিহার করা

ii. সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া

iii. নিয়মিত ঔষধ সেবন করা

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. অশ্বত্থ হতে পারে-

- i ভিটামিন A এর অভাবে
- ii উচ্চ রক্তচাপের কারণে
- iii. বহুমূত্র রোগের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

শামীনের দাদা হঠাৎ অসুস্থ হলে একজন চিকিৎসক ডাকা হয়। চিকিৎসক তার রক্তচাপ মেপে ১৭০/৯৫ মিলিমিটার দেখতে পান। তিনি তাকে চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহারসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

৫. রক্তচাপ ১৭০/৯৫ মিলিমিটার দ্বারা বুঝায়

- ক. নিম্নরক্তচাপ
- খ. স্বাভাবিক রক্তচাপ
- গ. উচ্চ রক্তচাপ
- ঘ. উপরে ৯৫, নিচে ১৭০ মিলিমিটার

৬. ডাক্তার চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন কারণ এটি-

- i লসিকা নালীতে জমা হয়ে রক্তের প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায়
- ii ধমনীর পথ সরু করে রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়
- iii. শিরার পথ সরু করে রক্তের চাপ কমিয়ে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। রমার কয়েক মাস যাবত পেটে অসুখ, সর্দি-কাশি, জ্বর ও ঘা সারছে না। এখন তার ওজনও অনেক কমে গেছে। ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেল তার শরীরে HIV পজিটিভ। ডাক্তার রমার আত্মীয় স্বজনদের তার সুচ, সিরিঞ্জ ইত্যাদি বাসার অন্যদের ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন এবং সামাজিকভাবে সচেতন হতে বললেন।

- ক. HIV পজিটিভ কী
- খ. রমার পেটে অসুখ, সর্দি-কাশি, জ্বর ও ঘা সারছে না কেন?
- গ. HIV পজিটিভ এর পরিণতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ডাক্তারের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।

২। জামাল সাহেবের পায়ের ক্ষত অনেকদিন ধরে শুকাচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন। রক্তে অতিরিক্ত শর্করা পাওয়া যায়। ডাক্তার শর্করা নিয়ন্ত্রণে পরিমিত আহার গ্রহণ এবং জীবন যাপনে শৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেন।

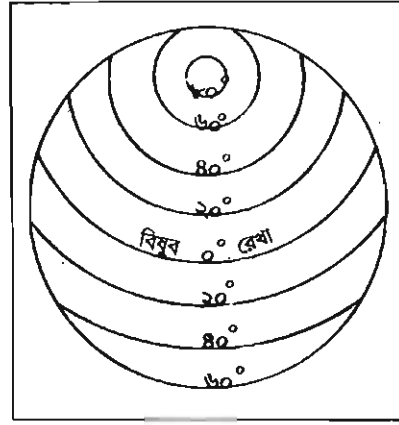
- ক. জামাল সাহেবের কী রোগ হয়েছিল?
- খ. জামাল সাহেবের পায়ের ক্ষত না শুকাবার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. রক্তে শর্করার বৃদ্ধি জামাল সাহেবের জন্য আর কী ক্ষতি করতে পারে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. জামাল সাহেবের প্রতি ডাক্তারের পরামর্শ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
২. রহিম একজন নির্মাণ শ্রমিক। পরিবারে সে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। কৌতুহল বশত বন্ধুদের সাথে সিগারেটের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। ফলে ক্রমশ সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরিণতিতে সে চাকুরিচ্যুত হয়। অতঃপর মাদকের টাকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।
- ক. ‘মাদকাসক্ত’ কথাটির অর্থ কী?
- খ. মাদক গ্রহণে একই সিরিঞ্জ ব্যবহারের পরিণতি ব্যাখ্যা কর।
- গ. কীভাবে রহিমের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রহিমের পরিণতি আমাদের কী শিক্ষা দেয় তা আলোচনা কর।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পৃথিবীর আবর্তন : সময় ও ঋতু পরিবর্তন

মেরু, অক্ষ ও দ্রাঘিমা

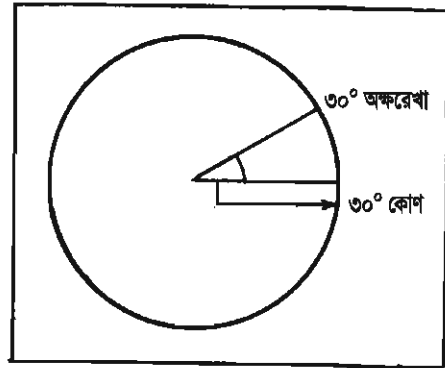
পৃথিবীর ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। এ অক্ষরেখার উত্তরের প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণের প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলে। পৃথিবীর এ দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পূর্ণবৃত্তের মত পৃথিবীকে বেঁটন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাকে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। এ নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধাংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের পৃথিবীর অর্ধাংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।



চিত্র ২৪.১ : সমাক্ষরেখা

সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা : নিরক্ষরেখার সমান্তরাল উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাকে সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা বলে (চিত্র ২৪.১)। নিরক্ষরেখাকে ০° ধরে এর উত্তর ও দক্ষিণে ৯০° পর্যন্ত এক, দুই করে উভয় দিকে ৯০টি সমাক্ষরেখা কল্পনা করা হয়েছে।

অক্ষাংশ : ভূপৃষ্ঠের যে কোনো দুইটি স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত অঙ্কিত দুইটি ব্যাসার্ধের অন্তর্গত কোণকে ঐ দুই স্থানের কৌণিক দূরত্ব বলে (চিত্র ২৪.২)। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০° ধরে উত্তর মেরুর অক্ষাংশ ৯০° উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর অক্ষাংশ ৯০° দক্ষিণ ধরা হয়।



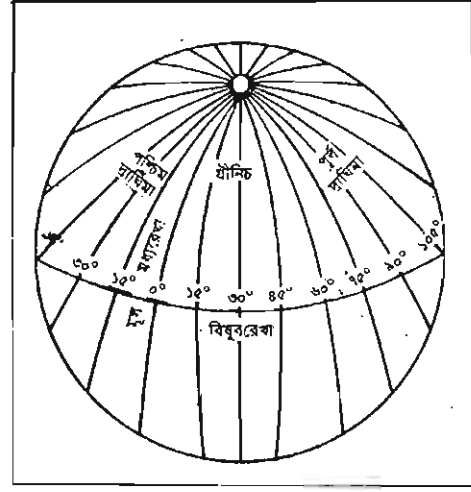
চিত্র ২৪.২ : কৌণিক দূরত্ব

দ্রাঘিমারেখা ও দ্রাঘিমা : সমাক্ষরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্য ভূপৃষ্ঠের উত্তর দক্ষিণ মেরুকে যুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে কতকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাগুলো নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। লম্বভাবে ছেদকৃত রেখাগুলোকে দ্রাঘিমারেখা বা মধ্যরেখা বলে (চিত্র ২৪.৩)। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ মান মন্দিরের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হয়েছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। মূল মধ্যরেখাকে ০° ধরে পূর্ব-পশ্চিমে উভয় দিকে ১৮০° পর্যন্ত এক, দুই করে অন্যান্য মধ্যরেখাগুলো গণনা করা হয়ে থাকে। গ্রীনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে যে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা বলে। পূর্ব দিকের কৌণিক দূরত্বকে পূর্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিম দিকের কৌণিক দূরত্বকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০° পরিধি অতিক্রম করে। এ হিসেবে ১° পরিধি অতিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৪ মিনিট।

অক্ষাংশ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি

কোনো স্থানের অক্ষাংশ দুইটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যথা- (১) নক্ষত্রের সাহায্যে এবং (২) সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে।

১। নক্ষত্রের সাহায্যে : উত্তর গোলার্ধে ধ্রুবতারার সাহায্যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। কোনো সমতল ক্ষেত্রে একটি খুঁটি এবং তার উত্তরে আর একটি বড় খুঁটি এমনভাবে পুঁততে হবে যেন খুঁটি দুইটির অগ্রভাগ ধ্রুবতারার সঙ্গে একই সরলরেখায় অবস্থান করে। খুঁটি দুইটি ছোটবড় হওয়ায় ছোটটির অগ্রভাগের ভূমির সমান্তরাল রেখা বড় খুঁটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে। আবার বড় খুঁটির অগ্রভাগ ও ছোটটির অগ্রভাগ সংযুক্ত রেখা, ভূমির সমান্তরাল রেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাই নক্ষত্রের উন্নতি (চিত্র ২৪.৭) এবং এ উন্নতিই ঐ স্থানের অক্ষাংশ। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ মেরু নির্দেশক হ্যাডলির অকট্যান্ট নামক নক্ষত্রের সাহায্যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। দিনের বেলায় এ নিয়ম কার্যকর নয়।



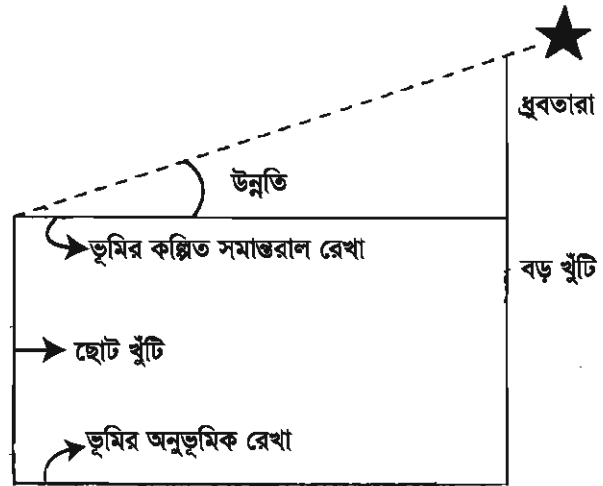
চিত্র ২৪.৭ : দ্রাঘিমা রেখা

২। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে : সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পদ্ধতি

কোনো স্থানের দ্রাঘিমা দুইটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যথা- (১) স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দ্বারা এবং (২) গ্রীনিচের সময় দ্বারা।

১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দ্বারা : পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে ঘূর্ণয়নের জন্য পূর্বে অবস্থিত স্থানসমূহে আগে সূর্য উদিত হয়। এ কারণে পূর্ব দিকে অবস্থিত ও পশ্চিমে অবস্থিত স্থান সমূহের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় 360° পরিধি অতিক্রম করে। এ হিসেবে পৃথিবী ৪ মিনিটে 1° পরিধি অতিক্রম করে থাকে। যদি কোনো দুইটি স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ১ ঘণ্টা হয় তা হলে স্থান দুইটির দ্রাঘিমার পার্থক্য 15° হবে। যে স্থানের সময় অগ্রগামী বা বেশি হবে সে স্থানটি অপর স্থানটি থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত হবে। অনুরূপভাবে একটি স্থানের দ্রাঘিমা জানা থাকলে অপর স্থানের দ্রাঘিমা স্থানীয় সময়ের মধ্যে পার্থক্য দ্বারা নির্ণয় করা যায়।



চিত্র ২৪.৮ : নক্ষত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়

২। গ্রীনিচের সময় দ্বারা : ক্রনোমিটার নামক ঘড়ির সাহায্যে গ্রীনিচের সময় নির্ণয় করা যায়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের অবস্থান নিরূপণ করে স্থানীয় সময় বের করা যায়। গ্রীনিচের সময় ও স্থানীয় সময়ের পার্থক্য থেকে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়। স্থানীয় সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা অগ্রগামী হলে সে স্থানটি পূর্বে এবং পশ্চাপদ হলে স্থানটি পশ্চিমে অবস্থিত হবে। কারণ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হল।

- ১। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানা থাকলে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।
- ২। অক্ষাংশের পরিমাপে কোনো স্থানের উত্তাপ বা শৈত্য আন্দাজ করা যায়।
- ৩। দ্রাঘিমার সাহায্যে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।
- ৪। একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে মধ্যাহ্ন হয়।

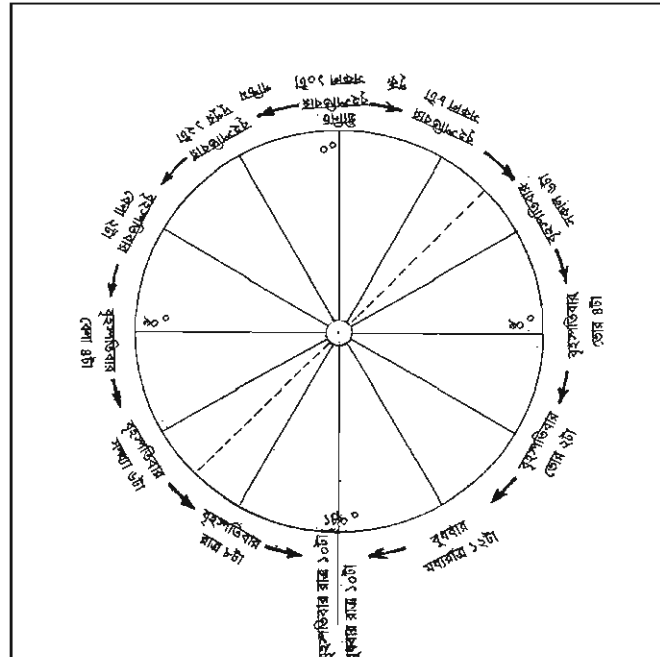
পরিশেষে বলা যায় যে, অক্ষাংশের পার্থক্যের ওপর উত্তাপ এবং দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে। এ ছাড়া উড়োজাহাজ বা সমুদ্রগামী কোনো জাহাজ কোনো বিপদে পড়লে বেতার মারফত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উল্লেখ করে স্থানটির ঠিক অবস্থান জানানো হয়। এর ফলে সাহায্যকারী দল ঠিক স্থানে দ্রুত পৌঁছতে পারে।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

(১) **স্থানীয় সময়** : যখন কোনো স্থানে সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে, তখন সেই স্থানে মধ্যাহ্ন হয়। অর্থাৎ তখন সেখানের ঘড়িতে দুপুর ১২টা বাজে। এ আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, কোনো স্থানে আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থানের উপর ভিত্তি করে যে সময় স্থির করা হয় তাকে ঐ স্থানের স্থানীয় সময় বলে। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, 1° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। সব দ্রাঘিমার ওপর সূর্য একই সময়ে আসে না। সে কারণে বিভিন্ন দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, করাচীতে যখন সকাল সাড়ে ১০ টা ঢাকায় তখন সকাল সাড়ে ১১টা। কারণ করাচী ও ঢাকার দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য 15° । একই দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত সকল স্থানে একই সময়ে মধ্যাহ্ন হয়।

(২) **প্রমাণ সময়** : একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত স্থান সমূহের স্থানীয় সময় এক। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় সময় বিভিন্ন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই দুই বা ততোধিক দ্রাঘিমারেখার মাঝে বিস্তৃত। সুতরাং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় সময় থাকে। কিন্তু একটি দেশের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি সময় প্রয়োজন। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোনো প্রধান শহরের স্থানীয় সময়কে দেশের সকল স্থানের ব্যবহারিক সময় ধরা হয়। এ নির্দিষ্ট সময়কে প্রমাণ সময় বলে। যথা- 90° পূর্ব দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময়, 82.5° পূর্ব দ্রাঘিমার স্থানীয় সময় এলাহাবাদের স্থানীয় সময়কে ভারতের প্রমাণ সময় ধরা হয়।



আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

পূর্ব দ্রাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী এবং পশ্চিম দ্রাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের

চিত্র ২৪.৫ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

পশ্চাদবর্তী। অতএব, গ্রীনিচে যখন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা তখন ৩০° পূর্ব দ্রাঘিমায় বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা। এ হিসেবে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় দেখা যাবে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা। আবার ৩০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় হবে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা। এ হিসেবে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় তখন সময় বুধবার রাত ১০টা। কিন্তু ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিম রেখা দুইটি একই রেখা। এ জন্য একই দ্রাঘিমা রেখাতে একই সঙ্গে বুধবার রাত ১০টা এবং বৃহস্পতিবার রাত ১০টা হতে পারে না (চিত্র ২৪.৫)। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কল্পনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হল।

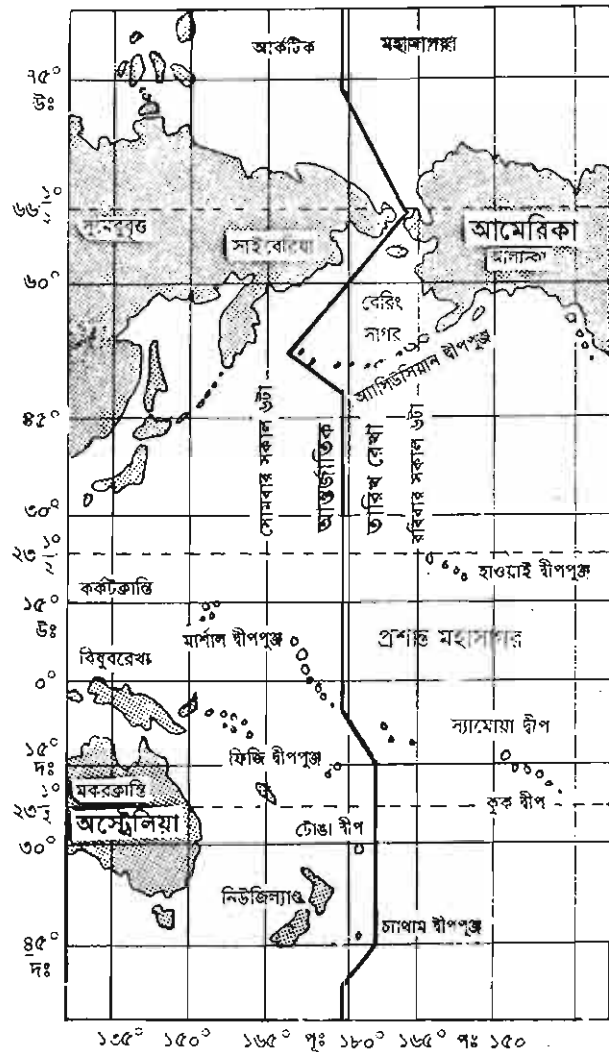
মনে কর, চিত্র ২৪.৫ এ গ্রীনিচের দ্রাঘিমায় অবস্থিত কোনো স্থান থেকে দুইটি বিমান একই সময় যাত্রা করল। একটি পূর্ব দিকে এবং অপরটি পশ্চিম দিকে সমগতিতে চলেছে। এখন, ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যরেখা একই। কিন্তু পূর্বগামী বিমান এখানে এসে তারিখ পাবে সোমবার এবং পশ্চিমগামী বিমান এসে তারিখ পাবে রবিবার।

পূর্বগামী বৈমানিকগণ ঐ সোমবার ১৮০° অতিক্রম করে দেখতে পাবে যে, তারা রবিবারে এসে গেছে পক্ষান্তরে পশ্চিমগামী বৈমানিকগণ ঐ রবিবার ১৮০° অতিক্রম করে দেখতে পাবে মুহূর্তের মধ্যে তারা সোমবার এসে গেছে। এ গোলযোগ দূর করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে, ১৮০° মধ্যরেখা অতিক্রম করেই পূর্বগামী জাহাজটি একদিন পিছিয়ে এবং পশ্চিমগামী জাহাজটি একদিন এগিয়ে তারিখ হিসাব করবে। এ রেখাটির নামই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (চিত্র ২৪.৬)। এ রেখা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে।

এ ১৮০° মধ্যরেখা এশিয়ার উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণে কোথাও কোথাও স্থলভাগের ওপর দিয়ে গেছে। স্থলভাগে ১৮০° মধ্যরেখার দুই পাশে যদি দুইটি বার হয় তা হলে অসুবিধা হয়। এ অসুবিধা ও গোলযোগ দূর করার জন্য ১৮০° দ্রাঘিমারেখা স্থলভাগ এড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে অ্যালিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে কিছু আঁকাবাঁকা করে অঙ্কন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার গুরুত্ব : নিম্নের বর্ণিত কারণে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

(ক) এ রেখা আন্তর্জাতিক সময় নির্ণয় ও সময় সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণে সাহায্য করে।



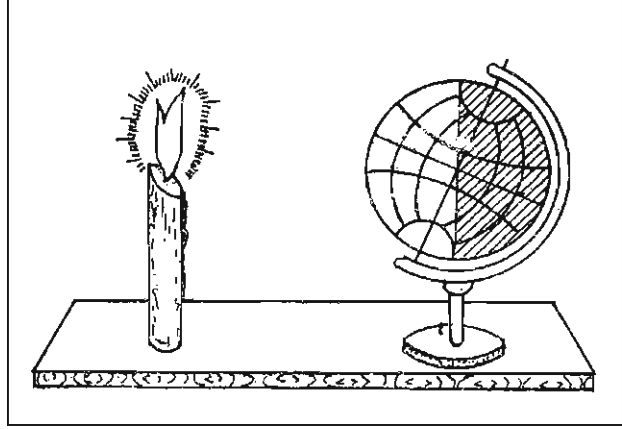
চিত্র ২৪.৬ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

(খ) পশ্চিমগামী জাহাজ এ রেখা অতিক্রম করলে একদিন বেড়ে যায় এবং পূর্বগামী জাহাজ এ রেখা অতিক্রম করলে একদিন কমে যায়।

পৃথিবীর গতি

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে অবিরাম ঘুরছে। অর্থাৎ আমাদের এ পৃথিবী গতিশীল তা এখন প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীর দুইটি গতি আছে। যথা- (১) আবর্তন বা আন্থিক গতি এবং (২) পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি।



চিত্র ২৪.৭ : দিনরাত্রি সংঘটন

আন্থিক গতি : পৃথিবী আপন অক্ষে বা মেরুরেখায় প্রতিনিয়ত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। এক বার ঘুরতে বা আবর্তন করতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ একদিনে এক বার আবর্তন হয় বলে পৃথিবীর এ গতিকে আন্থিক গতি বলে এবং এই ২৪ ঘণ্টা সময়কে সৌরদিন বলে। পৃথিবীর এ আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অর্ধাংশ সূর্যের সম্মুখে থাকে সেখানে দিন হয় এবং অপর অর্ধাংশে রাত হয়।

আন্থিক গতির ফল

১। আন্থিক গতির ফলে পৃথিবীর পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত সংঘটিত হয়। পৃথিবীর যেদিকে যখন সূর্য থাকে সেখানে তখন দিন এবং অপর অংশে সূর্যের আলোর অভাবে রাত হয়। পৃথিবীর এ আলোকিত অংশ ও অন্ধকার অংশের মিলনস্থানকে ছায়াবৃত্ত বলে। দিন ও রাত সংঘটিত হওয়াকে আমরা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারি। একটি অন্ধকার ঘরে টেবিলের ওপর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে তার সামনে একটি ভূগোলক (চিত্র ২৪.৭ এর অনুরূপ) ঘুরালে দেখা যাবে যে বাতির সামনের অংশ আলোকিত এবং বিপরীত অংশ অন্ধকার। অর্থাৎ আবর্তনশীল পৃথিবীর যে অর্ধাংশে সূর্যের কিরণ পড়ে, সে অংশে দিন হয় এবং তার বিপরীত অর্ধাংশে রাত হয়।

২। আন্থিক গতির ফলে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়।

৩। আন্থিক গতির ফলে সময় গণনার সুবিধা হয়। সৌরদিনকে ২৪ দিয়ে ভাগ করে প্রতি ভাগকে ঘণ্টা এবং তা থেকে মিনিট, সেকেন্ডে প্রভৃতি গণনা করা যায়।

৪। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি ও এর আবর্তনের ফলে সূর্যকিরণ পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশে বছরের কিছু সময় লম্বভাবে পড়ে তখন সেই অংশ বেশি উত্তপ্ত হয়। এর উত্তরে বা দক্ষিণে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়ে বলে কম উত্তপ্ত হয়।

৫। আন্থিক গতির ফলে জোয়ার-ভাটা হয়।

বার্ষিক গতি : পৃথিবী আপন কক্ষপথে বছরে একবার সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীর এ পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি বলে। এভাবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একটি পরিক্রমণকালকে সৌরবছর বলে। বার্ষিক গতির গড় বেগ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১,০৬,২৬০ কিলোমিটার বা প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার। পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে প্রকৃতপক্ষে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে। সে কারণে ইংরেজি হিসেবে প্রতি ৪ বছরে ১ দিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনের বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিন ধরা হয় এবং সে বছরকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap Year) বলা হয়।

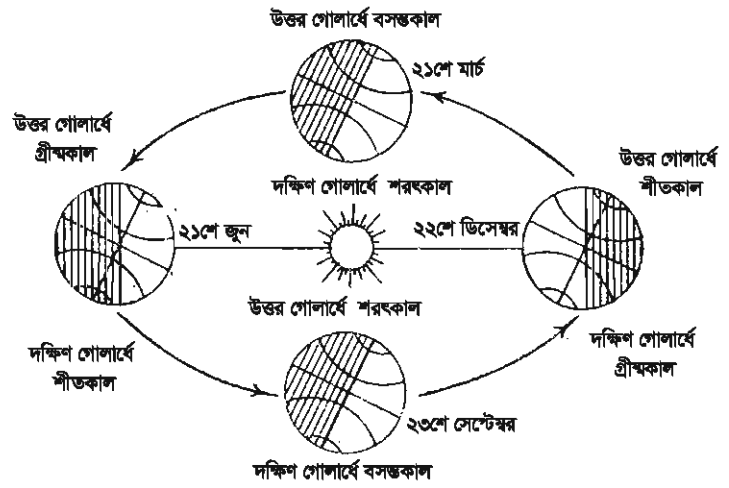
বার্ষিক গতির ফল : বার্ষিক গতির ফলে-

- ১। দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে,
- ২। ঋতুর পরিবর্তন ঘটে,
- ৩। তাপের তারতম্য ঘটে।

ঋতু পরিবর্তন

সূর্য থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই। কোনো স্থানের ঋতু পরিবর্তন প্রধানত সেই স্থানে প্রাপ্ত সূর্যতাপের ওপর নির্ভর করে। দিন বড় হলে অধিক সময় এবং দিন ছোট হলে অল্প সময় সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। অতএব দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হলে উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তন হয় সুতরাং যে সকল কারণে দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সে সকল কারণেই ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং সূর্যকিরণ বিভিন্ন দিনে কোথাও লম্বভাবে, কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ২১শে জুন তারিখে সূর্য কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে তখন উত্তর গোলার্ধের সকল স্থানেই সূর্যরশ্মি কম তির্যকভাবে পড়ে। এ তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। ২১শে জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড়



চিত্র ২৪.৮ : ঋতু পরিবর্তন

মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকে। কারণ উত্তর গোলার্ধের অর্ধেকেরও বেশি অংশ সূর্যকিরণ পায় এবং ঐ সময় দক্ষিণ গোলার্ধের অর্ধেকেরও কম অংশ সূর্যকিরণ পায় অর্থাৎ কম তাপ গ্রহণ করে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। এ ছাড়া দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় সূর্যকিরণ অধিক তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে দিন ছোট ও রাত বড় হয়। সুতরাং এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে তাপের পরিমাণ কম হয় বলে এখানে তখন শীতকাল।

২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পড়ে এবং এ তারিখে সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। অতএব এ তারিখের দেড় মাস পূর্বে ও দেড় মাস পরে উত্তাপ মধ্যম রকমের হয়ে থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

২২শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। অতএব ২১শে জুন ও এর কাছাকাছি সময়ে উত্তর গোলার্ধে ঘেরূপ সর্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়, ২২শে ডিসেম্বর ও এর কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে সেইরূপ সর্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়। অতএব ২২শে ডিসেম্বরের দেড় মাস পূর্বে ও পরে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং বিপরীত কারণে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

২১শে মার্চ তারিখে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এ দিন সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত এই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়-

ক. দ্রাঘিমাংশ সাহায্যে	খ. স্থানীয় সময়ের সাহায্যে
গ. অক্ষ রেখার সাহায্যে	ঘ. নক্ষত্রের সাহায্যে
২. যেসব কারণে দিন রাত্রির ত্রুটি বৃদ্ধি হয় সে সব কারণে-

ক. আর্থিক গতি	খ. ঋতু পরিবর্তন
গ. জোয়ার ভাটা	ঘ. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা
৩. কোন দুইটি তারিখে দিন রাত্রি সমান হয়?

ক. ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ	খ. ২১শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বর
গ. ২২শে ডিসেম্বর ও ২১শে মার্চ	ঘ. ২১শে জুন ও ২৩শে সেপ্টেম্বর
৪. ঢাকা এবং পঞ্চগড়ের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ৮ মিনিট হলে পঞ্চগড় কত ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত?

ক. ৮৬	খ. ৮৮
গ. ৯০	ঘ. ৯২
৫. মি. হল ব্রুক ২৮শে মে আমেরিকা থেকে জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ১০দিন পর অস্ট্রেলিয়া পৌঁছালেন। তিনি কত তারিখে সেখানে পৌঁছালেন?

ক. ৭ই জুন	খ. ৮ই জুন
গ. ৯ই জুন	ঘ. ১০ই জুন
- ৬। কোনো দেশের উষ্ণতা সম্বন্ধে ধারণা পেতে জানতে হবে
 - i. অক্ষাংশের অবস্থান
 - ii. দ্রাঘিমাংশের অবস্থান
 - iii. স্থানীয় ও প্রমাণ সময়

নিচের কোনটি সঠিক?

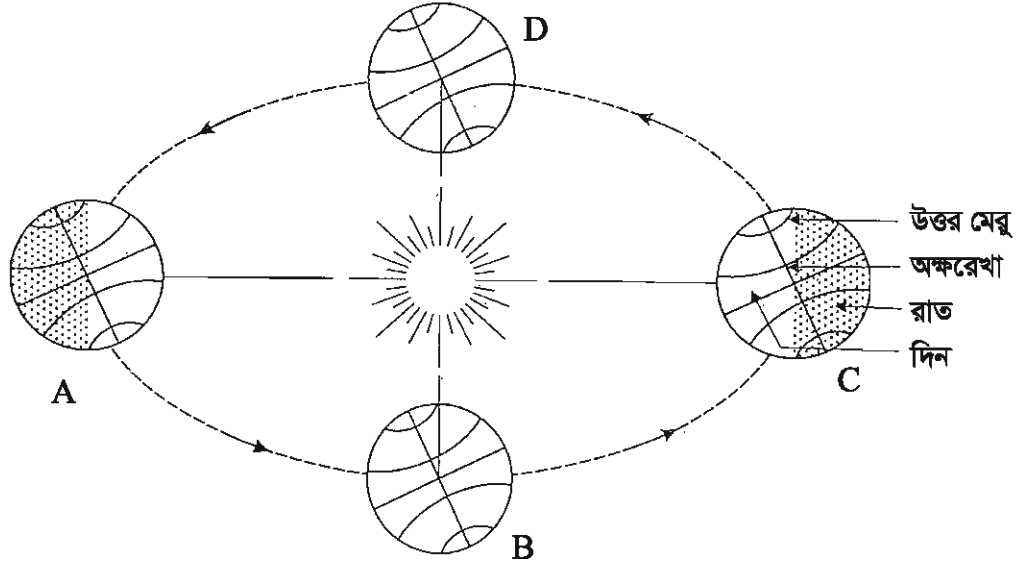
- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

- ১। ফাহিম তার বাবার পাশে বসে লন্ডনের ওভাল মাঠে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলা দেখছিল। খেলা দেখতে দেখতে সে লক্ষ করল তাদের এখানে সমুদ্র নেমে আসলেও ওভালের মাঠ রৌদ্রোজ্জ্বল। সে তার বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে বাবা বললেন এর জন্য পৃথিবীর আবর্তন, স্থানীয় সময় এবং প্রমাণ সময় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ওভাল মাঠ ০.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এবং ওভালের সাথে আমাদের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ছয় ঘণ্টা।

ক. পৃথিবীর আবর্তন কী?
খ. পৃথিবীর কোন ধরনের আবর্তনের জন্য তাদের বাসার সাথে ওভাল মাঠের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ব্যাখ্যা কর।
গ. ফাহিমদের বাসা কত ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত?
ঘ. উপরিউক্ত ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য স্থানীয় সময় এবং প্রমাণ সময় জানা প্রয়োজন কেন? যুক্তি দাও।

২.



- ক. উপরের চিত্রটিতে কী দেখানো হয়েছে?
- খ. ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হয় কেন?
- গ. চিত্রের 'C' স্থানে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কোন কোন ঋতু বিরাজ করবে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "চিত্রের 'D' স্থানে কর্কটক্রান্তিতে বসন্তকাল এবং মকরক্রান্তিতে শরৎকাল" —যুক্তি দাও।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশ উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল। ভৌগোলিক ও অবস্থানগত কারণে এ দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, টর্নেডো ও ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলই কমবেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। প্রাকৃতিক কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে। যেমন, নদী প্রবাহিত এলাকায় বন্যা ও নদীর ধ্বস সৃষ্টি হতে পারে। আবার সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনে থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি স্থির করার পর সে ব্যাপারে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বন সম্ভব।

ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় হল উষ্ণ কেন্দ্রীয় লঘুচাপ, যার চারদিকে উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাস উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রচণ্ডভাবে ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাসার্ধ সাধারণত ৫০০-৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। হালকা বাতাস ও হালকা মেঘ দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র ‘অয়ন’ (Eye) নামে পরিচিত। ‘অয়ন’- এর ব্যাসার্ধ ২০-১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কেন্দ্রের চারদিকে ঘূর্ণায়মান বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬২ থেকে ১১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বা তার বেশি হতে পারে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাগরে সাধারণ বিষুবরেখার ৫° থেকে ৮° উত্তর অক্ষাংশে বা তার ওপর দিকে যেখানে সাগরের পানির তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াসের বেশি থাকে সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিষুব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম থাকার কারণে সেখানে লঘুচাপ বিদ্যমান থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে প্রবাহিত দুই ধরনের মৌসুমী বায়ু বিষুব অঞ্চলের লঘুচাপ এলাকায় একে অপরের মুখোমুখি হয়। এ ধরনের সংযোগমূলক এলাকাকে আন্তঃগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অভিসারী অঞ্চল বলে। প্রবাহিত বিপরীতমুখী বায়ুর সংযোগস্থলে ছোট ছোট ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণি এলাকার বায়ুচাপের যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ এলাকার ঠান্ডা ও ভারি বাতাস সজেয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। পৃথিবী ঘোরার ফলে প্রবাহিত ঠান্ডা ও ভারি বাতাস ঘূর্ণি এলাকার কেন্দ্রে ঘুরতে ঘুরতে প্রবেশ করে। কেন্দ্রে বায়ুচাপ অত্যন্ত কম থাকায় ঘূর্ণায়মান বাতাস সেখানে আসার পরই অস্থিতিশীল হয়ে প্রবলবেগে ওপরের দিকে উঠতে থাকে বলে ঘূর্ণির তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

বিষুবরেখা থেকে যত উত্তরে ঘূর্ণি সরে যেতে থাকে পৃথিবীর আর্বতনজনিত বলের (করিওলিস ফোর্স) প্রভাব ঘূর্ণিগুলোর ওপর বেশি পড়ে বলে এদের চারপাশে আরও বেশি ঘূর্ণিপাক খেতে থাকে। ঘূর্ণিপাক খাওয়ার কারণে ঘূর্ণিগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি নিম্নচাপে রূপান্তরিত হয়। নিম্নচাপ সাগরে যত বেশি সময় অবস্থান করে তত বেশি তার শক্তি সঞ্চয় হয়। এ শক্তির উৎস হল সাগরের বিপুল জলরাশি। এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাস বাষ্পায়িত পানির কণা বহন করে। পানি বাষ্পায়িত হওয়ার সময় সুস্থতাপের সঞ্চয় হয় এবং বাষ্পকণা বাতাসে মিশ্রিত হওয়ার সময় ‘সুস্থতাপ’ শক্তি হিসেবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ওপরের আকাশের বায়ুমণ্ডল এ সময় শীতল থাকে। বায়ুমণ্ডলের শীতল স্পর্শে উত্তীর্ণ জলীয়বাষ্প ক্রমাগত ঘনীভূত হয়ে মেঘকণায় পরিণত হয়। এর ফলে ‘সুস্থতাপ’ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায় বলে সেখানে শক্তির আধিক্য ঘটে এবং বায়ুমণ্ডলের এ অংশে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধির ফলে নিম্নচাপ এলাকায় বাতাসের চাপ হ্রাস পায় এবং ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হওয়ার সময় যে সব এলাকার ওপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে সে সব এলাকায় তিন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ তিন ধরনের প্রভাব হচ্ছে : প্রবল বাতাস, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস।

জলোচ্ছ্বাস

ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে উপকূলের কাছাকাছি যে উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাকে জলোচ্ছ্বাস বলে। জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সাগর গর্ভে ভূমিকম্পের ও অগ্ন্যুৎপাতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ সালের পয়লা নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১৩.৭২ মিটার পর্যন্ত উঠেছিল। ঘূর্ণিঝড় উপকূল অতিক্রমের সময় উঁচু জলোচ্ছ্বাস উপকূল এলাকার অসংখ্য জীবনহানি ও সম্পদ বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের কারণে জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি হয় তার শতকরা নব্বই ভাগ জলোচ্ছ্বাসের কারণে ঘটে থাকে।

সাগরে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কারণ

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সাগরের পানি যে সব কারণে স্ফীত হয়ে জলোচ্ছ্বাস ঘটায় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা যায়।

- (ক) তীব্র বায়ুতাড়িত অভিসারি সমুদ্রস্রোত।
- (খ) ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের চাপের অস্বাভাবিক হ্রাস।
- (গ) ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার সম্ভাব্য উপকূলের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের কৌণিক অবস্থান।
- (ঘ) সাগরের অগভীর অংশে বা মহীসোপানে ঘূর্ণিঝড়ের আগমন।
- (ঙ) উপকূলের আকৃতি।
- (চ) ভরা জোয়ার (ভরা কাটাল)

অঞ্চলভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ

বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় অন্তর্ভুক্ত এলাকা। সে জন্য লক্ষ করা যায় যে প্রায় প্রতি বছরই বিশেষ বিশেষ সময়ে কোনো না কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় এবং উপকূলবর্তী চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, কক্সবাজার, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালি, পটুয়াখালি, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে সাপের ছোবলের মত প্রচণ্ড আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় সব সময় যে উপকূলবর্তী অঞ্চলেই আঘাত করবে তা নয়, বরং কোনো কোনো সময় উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অঞ্চলের অভ্যন্তরে আঘাত হানতে সক্ষম। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় প্রবলবেগে সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে অগ্রসরের সময় বাতাসের প্রবাহে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি উঁচু হয়ে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ অসংখ্যবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নোয়াখালি, বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালি অঞ্চলের অধিবাসীরা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত। এ দুইটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। ১৯৭০, ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এ দেশের প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ জীবন হারায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়কাল

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণত বাংলাদেশের উপর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল ও মে) এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে আঘাত হেনে থাকে। সমুদ্রে নিম্নচাপের ফলে ঝড় সৃষ্টি হওয়ার পর সমুদ্রের বিশাল প্রবাহ প্রবল গতিতে উঁচু হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে। এভাবেই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতির প্রকৃতি

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এ শ্রেণীর সাধারণ মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় এলাকার অধিকাংশ কাঁচা বাড়িঘর ধ্বংস হয়। বাড়ির প্রকোপ বেশি হলে পাকা ও আধাপাকা ঘরবাড়িরও ক্ষতি হয়ে থাকে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি খড় বা টিন দিয়ে তৈরি হয় বলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঘরের ছাউনি ও টিন উড়ে যায় এবং ঘর ভেঙে যায়। মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে, উড়ন্ত টিনের আঘাতে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অধিকাংশ মানুষকে শুধু গৃহহারা করে তা নয়, গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটিয়ে ও সর্বস্ব ধ্বংস করে মানুষকে খোলা আকাশের নিচে অসহায়ভাবে বসবাসে বাধ্য করে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলবর্তী মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়। জলোচ্ছ্বাসের সময় খাদ্য, আসবাবপত্র, বস্ত্রসামগ্রী, বইপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পানিতে ভেসে যায়। এ সময় অনেক গাছপালা উৎপাটিত হয়। জমির ফসল নষ্ট হয় ও পশুপাখি মারা যাওয়ার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ভেঙে যায় এবং বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সমগ্র এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় অফিস, আদালত, শিল্প কারখানা, স্কুল-কলেজ, বাঁধ, সেতু, সাঁকো, কাঁচাপথ, এমনকি রেলপথের ক্ষতি হওয়ায় জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুর্যোগজনিত সূক্ষ্ম রোগসমূহ এবং তার প্রতিকার

জলোচ্ছ্বাসের সময় জলাশয় ও নলকূপের পানি দূষিত হয় বলে বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। সে জন্য দুর্যোগ শেষে সাধারণ মানুষ দূষিত পানি পান ও ব্যবহারের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় এবং এ রোগ অনেক সময় মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। এ শ্রেণীর রোগের প্রকোপে অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কারণে মাটির লবণাক্ততা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় বলে জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দেয়। এ ছাড়া, গবাদি পশুর মৃত্যুর ফলেও সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষতি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার জন্য বিভিন্ন রোগ দেখা দেওয়ার পর রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ট্যাবলেট, স্যালাইন বিতরণ প্রয়োজন। এ সময় বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির অভাব দেখা দেয় বলে পানি ফুটিয়ে পান করা উচিত। যেখানে টিউবওয়েলের পানি পাওয়া যায় সেখানেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করা প্রয়োজন।

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বের ও পরের অবস্থা মোকাবেলার জন্য চার পর্যায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। যেমন- দুর্যোগ পূর্বকালীন ব্যবস্থা, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থা, দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা ও দুর্যোগের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক. দুর্যোগ পূর্বকালীন ব্যবস্থা : যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরুর আগে সম্ভাব্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ১৯৯৮ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে তাতে বহু সংখ্যক প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রাণহানির ব্যাপকতা অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাব্য সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস শুরু হওয়ার আগে থেকে উপকূলবাসীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্কতা ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কাজ করছে। সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে আবহাওয়া দপ্তর বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দিনে ও রাতে অসংখ্যবার পূর্বাভাস প্রচার করে থাকে। সে জন্য দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বিশেষ করে জেলে নৌকায় ও ট্রলারে রেডিও থাকা প্রয়োজন। সতর্ক অবস্থা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দুর্যোগ পূর্বকালীন প্রস্তুতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১। অবহনযোগ্য সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে বাড়ির ভিতরে আবৃত করে ভারী দ্রব্যাদি চাপা দিয়ে রাখতে হবে।
 - ২। খাবার পানি কলসিতে ভরে ভালো করে ঢাকনা দিয়ে পলিথিন দিয়ে বেঁধে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।
 - ৩। গবাদি পশু সঙ্গে করে উঁচু টিলা বা কিল্লাতে নিয়ে যেতে হবে।
 - ৪। টাকা, পয়সা বা মূল্যবান বস্তু হাড়ির ভিতরে ভরে পলিথিন দিয়ে আবৃত করে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে।
 - ৫। আশ্রয় কেন্দ্রে খাওয়ার জন্য চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, গুড়, বাতাসা, পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
 - ৬। বাড়িতে নারকেল গাছ থাকলে ডাব ও নারকেল পেড়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিতে হবে। দুর্যোগ শেষে ডাবের পানি বিশুদ্ধ পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
 - ৭। কাঁচা বাড়ি যাতে সহজে ভেঙে না পড়ে সে জন্য দড়ি দিয়ে শক্ত করে মাটির সঙ্গে খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে। বাড়ির চালার টিনও এভাবে বেঁধে রাখলে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
 - ৮। দুর্যোগ শেষে বাড়িতে ফেরার পর যাতে প্রাথমিকভাবে খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা না হয় সে জন্য শুকনো খাবার, কাপড়-চোপড়, গবাদি পশুর খাদ্য বড় পলিথিন ব্যাগে ভরে মাটির নিচে পুঁতে রেখে যেতে হবে।
 - ৯। অনবরত বেতার শুনে নিজেদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বেতার ও টেলিভিশনে বিপদ সংকেত শোনার পর জেলেদের নদী ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে নদীবন্দরের জন্য ১ থেকে ৪ নম্বর এবং সমুদ্রবন্দরের জন্য ১ থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা হয়। নিচের হুঁশিয়ারি সংকেত ও তার অর্থ দেওয়া হয়েছে।

সংকেত	অর্থ
দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর - ১	দূরের সমুদ্রে প্রবাহিত বাতাস ঝড়ে পরিণত হতে পারে।
দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর - ২	দূর সমুদ্রে ঝড় উঠেছে।
স্থানীয় সতর্ক সংকেত নম্বর - ৩	বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা।
স্থানীয় সতর্ক সংকেত নম্বর - ৪	বন্দরে ঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে।
বিপদ সংকেত নম্বর- ৫	ছোট বা মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে এবং মংলায় পূর্ব উপকূল দিয়ে অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে।
বিপদ সংকেত নম্বর- ৬	ছোট বা মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন ঝড়ের জন্য বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের উত্তর উপকূল ভাগ দিয়ে ও মংলায় পশ্চিম উপকূল অংশ দিয়ে অতিক্রম করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মহাবিপদ সংকেত নম্বর - ৭	বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে প্রত্যাশিত ছোট বা মাঝারি গতি সম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে।
মহাবিপদ সংকেত নম্বর- ৮	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে এবং মংলায় পূর্ব উপকূল দিয়ে অতিক্রম করবে বলে সম্ভাব্য প্রবল ঝড়ের জন্য বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে।

মহাবিপদ সংকেত নম্বর - ৯

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের উত্তর উপকূল ও মংলার পশ্চিম উপকূল দিয়ে অতিক্রমকারী প্রবল ঝড়ের জন্য তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে।

মহাবিপদ সংকেত নম্বর - ১০

বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী তীব্র গতি সম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে।

মহাবিপদ সংকেত নম্বর - ১১

আবহাওয়া সতর্ক কেন্দ্রের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে করতে হবে যে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে উদ্যত।

নদীবন্দরগুলোর জন্য সাধারণত চার ধরনের সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়। এক নম্বর সতর্ক সংকেত এলাকার উপর দিয়ে অস্থায়ী দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, দুই নম্বর হুঁশিয়ারী সংকেতের মধ্য দিয়ে ১৯.৪১ মিটার ও তার কম দীর্ঘ নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, তিন নম্বর বিপদ সংকেতের মাধ্যমে এলাকায় ঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনা বলে নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা ও চার নম্বর মহাবিপদ সংকেতের মধ্য দিয়ে এলাকায় অতি শিগগির প্রচণ্ড আঘাত হানবে বলে সব নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে নিজের বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বাড়িতে কোনো মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী না রাখা উচিত এবং স্যালাইন ওয়াটার, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি, প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ও বাড়িতে সংরক্ষণ করলে দুঃসময়ে কাজ দেয়। বাড়িতে চুলোর আগুন অবশ্য নিভিয়ে বাইরে যেতে হবে।

খ. দুর্যোগকালীন ব্যবস্থা : দুর্যোগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানের সময় নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতাবোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যের প্রয়োজন হলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজেদের জিনিসের অংশ অন্যকে দিলে অভাবগ্রস্তদের মনোবল দৃঢ় হয়। এ সময় নিজেদের সমস্যা দূর করার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের শেষে কীভাবে সবাইকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যায় তা পূর্বাভাসেই এখানে পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়ের শেষে দিশেহারা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানরত নারীদের বিভিন্ন সূচিকাজে ব্যস্ত রাখলে এবং ছোট ছেলেমেয়েদের সকাল ও বিকালে পড়ানোর ব্যবস্থা করলে দুর্যোগকালীন ভীতি হ্রাসে সহায়তা করে।

গ. দুর্যোগ পরবর্তীকালীন ব্যবস্থা : দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতির হার নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন প্রধান দায়িত্ব হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তালিকা তৈরি করে ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গৃহহারাদের জন্য গৃহনির্মাণ, খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য, ওষুধপত্র বিতরণ, স্বল্পকালীন ঋণ দান ও অর্থ সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

দুর্যোগের পর নিখোঁজ মানুষের অনুসন্ধান করা এবং মৃত মানুষ ও গবাদি পশুর সৎকার দ্রুত না করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে, দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। তাড়াতাড়ি পশুপাখির মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেললে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

দুর্যোগের পরে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, গণ্যমান্য বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে রিলিফ পরিচালনা, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, ভাঙা বাড়ি, স্কুলগৃহ নির্মাণ কাজে দ্রুত অগ্রসর হলে অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সহজ হবে। সব সময় চেষ্টা করা উচিত সরকার বা অন্য কোথাও থেকে কোনো ত্রাণসামগ্রী আসার আগে নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণসংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করাও প্রয়োজন।

ঘ. স্থায়ী ব্যবস্থার পরিকল্পনা : স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ছাড়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে উপকূলবাসীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ শ্রেণীর আশ্রয় কেন্দ্র এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত যাতে দুর্যোগের সময় উপকূলবাসীদের

অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং অন্য সময় স্কুল বা গ্রামের সমবায় সমিতির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এ প্রক্রিয়া গৃহীত ও অনুসৃত হলে সারা বছর আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় নষ্ট হবে না।

বাংলাদেশে প্রতি বছরই একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনে উপকূলবর্তী অধিবাসীদের জীবনের চিত্র পরিবর্তন করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমানে নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে এ সম্পর্কে এলাকাবাসীদের সচেতন ও সতর্ক করে তোলা বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জন্য দরকার গ্রামে গ্রামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও নিয়মিত আলাপ আলোচনায় বসে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানার সময় সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিলে তারা আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বনে সক্ষম হবে। আলাপ আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সতর্ক সংকেত ও তার অর্থ, দুর্যোগের পূর্ব-প্রস্তুতি এবং দ্রব্যাদি সংরক্ষণে সতর্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য পূর্বাংগে সাঁতার শেখা প্রয়োজন। নারীদেরও শাড়ির সঙ্গে ঘরে কামিজ, পায়জামা রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য পূর্বাংগেই মাইকের সাহায্যে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জলবায়ুর জন্য বাংলাদেশে প্রতি বছর কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এ দুর্যোগে এ দেশের জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ পুরোপুরি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও এগুলো মোকাবেলার উপায়সমূহ জানা থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য সকলের মধ্যে সচেতনতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে কোন সময় ঘূর্ণিঝড় হয়?

ক. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	খ. আষাঢ়-শ্রাবণ
গ. ভাদ্র-আশ্বিন	ঘ. পৌষ- মাঘ
২. মহাবিপদ সংকেত হল-

ক. দুইটি	খ. তিনটি
গ. চারটি	ঘ. পাঁচটি
৩. ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল-

ক. ১২.১৯ মিটার	খ. ১৩.৭২ মিটার
গ. ১৫.২৪ মিটার	ঘ. ১৬.৭৬ মিটার
৪. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সাধারণত ঘূর্ণিঝড় হয়?

ক. উত্তরাঞ্চলে	খ. পশ্চিমাঞ্চলে
গ. দক্ষিণাঞ্চলে	ঘ. পার্বত্যাঞ্চলে
৫. জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি কোনটির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত?
 - i. সাগর গর্ভে ভূমিকম্প
 - ii. ভরা পূর্ণিমা
 - iii. পূর্ণ অমাবস্যা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জামালদের বাড়ি ভোলার চরফ্যাসনে। প্রতি বছরই তাদের এলাকার ঘূর্ণিঝড় আবার কখনও ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাসও আঘাত হানে। ২০০৭ সালে সিডরের আঘাতে তাদের এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হলেও প্রাণহানি কম হয়েছে। বাবা তাকে জানাল, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে তাদের এলাকায় সিডরের তুলনায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক প্রাণহানি ঘটে এবং তার দাদা-দাদি এবং মা প্রাণ হারায়।

- ক. ঘূর্ণিঝড় কী ?
 খ. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।
 গ. প্রতি বছরই জামালদের এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ১৯৯১ সালের তুলনায় এবার সিডরে জামালদের এলাকায় ক্ষয় ক্ষতি কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

- ২। তানজিলের মামার নতুন কর্মস্থল পটুয়াখালী। সে লঞ্চ করে পটুয়াখালী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মামী এসে বলল, আজকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। টেলিভিশনের খবরে নদীবন্দরের জন্য ২ নং বিপদ সংকেতের কথা বলা হয়েছে। মামা বললেন ২ নং বিপদ সংকেতে কোনো সমস্যা হবে না। মামা লঞ্চ যাত্রা করার পর প্রচণ্ড ঝড়ে লঞ্চটি ডুবে গেল। মামা কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও অধিকাংশ যাত্রী মারা যায়।

- ক. বিপদ সংকেত বলতে কী বুঝায়?
 খ. ২ নং হুশিয়ারি সংকেতে কোনো সমস্যা হবে না —এর কী অর্থ ব্যাখ্যা কর।
 গ. লঞ্চটি ডুবে যাবার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. লঞ্চ দুর্ঘটনাটি এড়ানো এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

জনসংখ্যা ও পরিবেশ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য

দেশের জনসংখ্যা কি বাড়ছে? এ প্রশ্নটির জবাব পাবার জন্য আমাদের কিছু জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় উপাত্ত দরকার। এ উপাত্ত যোগাড় করার জন্য আমাদের একটু কাজ করতে হবে।

(ক) আমাদের বিজ্ঞান স্যার / আপাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ উপাত্ত কোথায় পাওয়া যাবে?

(খ) তিনি বাংলাদেশের আদমশুমারির রিপোর্ট পড়তে বললেন।

(গ) ১৯৯১ ও ২০০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট যোগাড় করি।

(ঘ) ২০০১ এর প্রাথমিক রিপোর্টে দেশের মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২.৯৩ কোটি। *

(ঙ) ১৯৯১- এর রিপোর্টে দেশের মোট জনসংখ্যা কত দেওয়া ছিল? ১১.১৫ কোটি।

(চ) এ দুইটি তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, ১৯৯১ হতে ২০০১ পর্যন্ত ১০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ১.৭৮ কোটি। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার প্রায় ১.৪৮ **। ২০১০ সালে জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫ কোটি হবে।

জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে তোমরা নিচের ক্লাসে জেনেছ। এসো এগুলোর সারাংশ মনে করার চেষ্টা করি। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা। এ সকল মৌলিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার ও সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

আবার বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মক্ষম লোকের জন্য কর্মসংস্থান করতে গিয়েও সরকার রীতিমত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রধানত নির্ভর করে আর্থিক সামর্থ ও সম্পদের ওপর।

মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যা ছাড়াও আরও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে জনসংখ্যা বেশি বেড়ে যাবার কারণে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান না থাকায় গ্রামের বহুলোক শহরে ভিড় জমাচ্ছে। তাই শহরে গড়ে উঠেছে অপরিষ্কৃত ও অস্বাস্থ্যকর বসতি। বসতিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া শহর ও পল্লী অঞ্চলে আইন শৃংখলার অবনতির ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে গেছে। ফলে শান্তিতে বসবাস করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনগনের প্রধান ও প্রথম মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য। এখন কথা হল বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা কীভাবে সহজে মিটানো সম্ভব? উত্তরে বলা যায় খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে।

হাঁ, কথাটি সত্য। তবে এ কথাও সত্য যে জনসংখ্যা যতই বাড়বে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে খাদ্য উৎপাদন ততই বাড়তে হবে। কিন্তু এ উৎপাদন বাড়ানোর সীমা কতটুকু?

আমাদের দেশে কোনো আবাদযোগ্য ভূমি পতিত নেই। অতিরিক্ত আবাদযোগ্য জমি পাবার সম্ভাবনাও নেই। ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে বনভূমির দরকার তার অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। সুতরাং আরও বন কেটে ফেললে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১

** আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১

বাংলাদেশের জনসংখ্যা গত ৪০ বছরে (১৯৬১-২০০১) ৫.৫২ কোটি হতে ১২.৯৩ কোটিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি হয়েছে। এ দ্বিগুণ জনসংখ্যার জন্য ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে দ্বিগুণেরও বেশি পরিমাণ খাবার দরকার হয়েছে। খাবারের এ চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি করা প্রয়োজন।

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কী করা প্রয়োজন? এর জন্য উচ্চ ফলনশীল নীরোগ বীজ, ফসলের সার, পোকা মাকড় মারার ওষুধ, আগাছা দমনের ওষুধ ব্যবহার করা ছাড়াও জমিতে প্রচুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমরা ইরি ও ব্রি ধানের কথা নিশ্চয়ই শুনছ? এগুলো উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত। ইরি ও ব্রি ধান চাষ করতে হলে জমিতে সার প্রয়োগ ছাড়াও প্রচুর পানি দিতে হয়। জমিতে পানি সরবরাহ করার জন্য কী প্রয়োজন? প্রয়োজন হল পানির উৎস ও সেচ ব্যবস্থা।

পানির উৎস হিসেবে আমরা বৃষ্টির পানির কথাই প্রথমে বলি। এ পানি ধরে রাখতে পারে এ রকম জলাশয় যেমন- নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির কথা ভাবতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে এ সকল উৎস থেকে সনাতন পদ্ধতিতে জমিতে পানি সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মোট কৃষি জমির মাত্র ৩৭% জমিতে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত সকল জলাশয়ে যে পানি ধরে তা দিয়ে সারা বছর সকল মৌসুমে সেচ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এগুলোর বেশ কিছু শীত ও গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। অন্যদিকে ইরি ও ব্রি জাতীয় ধান সারা বছরই চাষ করা হয়। আবার এ সকল ধানের ফলন ভাল হবার জন্য ক্ষেতে প্রচুর পানি লাগে। আর এ পানি সরবরাহ করা হয় সেচের মাধ্যমে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত পানির এ উৎসগুলো সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা এ সকল উৎসের বিকল্প আবিষ্কার করেছেন। এ বিকল্প কি জান? ভূগর্ভস্থ পানি এ বিকল্প।

এখন ভূগর্ভস্থ পানি প্রচুর পরিমাণে সেচের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সব ধরনের জমিতে সারা বছর বিভিন্ন রকমের ফসল ফলাতে ভূগর্ভস্থ পানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ পানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হবার ফল কী দাঁড়িয়েছে? আমরা এখন বেশ ভালো ফসল পাচ্ছি এবং আমাদের খাদ্য চাহিদাও মিটছে। তবে এ পানি অত্যধিক ব্যবহারের একটি ক্ষতিকর দিকও আছে। এ ক্ষতিকর দিকটি কিন্তু আপাতত আমরা ভালো করে বুঝতে পারছি না। এ ক্ষতির পরিমাণও আমরা এখন জানি না। এসো এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি ও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করি।

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ যে তোমাদের আশেপাশে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি উঠানো হচ্ছে। এ পানি সেচের নালা দিয়ে ফসলের ক্ষেতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

তোমাদের গ্রামের আশেপাশে যে সমস্ত এলাকায় গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি উঠিয়ে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে সকল এলাকায় অগভীর নলকূপ, ইঁদারা ও কুয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। শীত ও গ্রীষ্মে খাল-বিল ও নদী-নালায় অবস্থান পর্যবেক্ষণ কর। কী দেখতে পেল? দেখবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্মকালে নদী-নালা, খাল-বিল অগভীর নলকূপ, ইঁদারা এবং কুয়ায় পানি নেই। এসো এর কারণ খুঁজে দেখি। গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উঠিয়ে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনবরত ও বেশি পরিমাণে এ পানি সংগ্রহ করার দরুন ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে করে গভীর নলকূপ সংলগ্ন এলাকায় পানির স্তরও দ্রুত নিচের দিকে নামছে। ফলে ইঁদারা ও অগভীর নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরের আলোচনা থেকে কী বুঝা যাচ্ছে? তোমরা বুঝতে পারছ যে বেশি জনসংখ্যার জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে সেচ দিতে হচ্ছে। সেচের জন্য অগভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে পানির স্বাভাবিক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। আর পানির অভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ বর্ণনা ও আলোচনা থেকে আমরা জানলাম ও বুঝলাম দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের ওপর হাত দিতে হচ্ছে। পরিণামে একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ থেকে বাঁচার জন্য

আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারি। তাহলে সমস্যা সৃষ্টিও হবে না বরং কমবে এবং জীবনের গুণগতমান বাড়বে।

বেশি লোকের জন্য কাজ চাই

আমাদের দেশে দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মক্ষম লোকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কী উপায়ে তা করা সম্ভব?

কৃষি দেশের বেশিরভাগ লোকের পেশা। দেশের মোট কর্মজীবীদের কম-বেশি ৬০% কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত আছে। সুতরাং কৃষি আর অধিকসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে না। তাই কৃষির বিকল্প পেশার কথাই ভাবতে হবে। এ বিকল্প হতে পারে শিল্পকর্ম ও বাণিজ্যভিত্তিক পেশা এবং সেবামূলক পেশা। এ ছাড়াও স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সরকার শিল্পের দিকে নজর দিয়েছে।

নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। দেশের শিল্প-কারখানার মধ্যে রয়েছে পাটকল, কাপড় ও সুতাকল, ইস্পাত মিল, কাগজের মিল, রাসায়নিক ও ঔষধ ফ্যাক্টরি, সার কারখানা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে নির্মাণ সংস্থা, জাহাজ তৈরির কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পিভিসি পাইপ শিল্প, রং ও বার্মিশ তৈরির কারখানা, নাইলন ও প্লাস্টিক তৈরির কারখানা, তেল উৎপাদন কল, পার্টেক্স ও হার্ডবোর্ড মিল, মোটর মেরামত কারখানা প্রভৃতি।

উপরে উল্লিখিত শিল্প কারখানা, মিল ফ্যাক্টরি ও কাজকর্মের জন্য প্রচুর পরিমাণ কোমল পানির দরকার। কোনো কোনো শিল্প কারখানায় ততটা বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন নেই। আবার কোনো কোনো মিল ফ্যাক্টরিতে পৃথিবীর উপরিভাগে পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য পানি হলেও চলে যেমন ট্যানারি ইত্যাদি। এ ছাড়াও সিমেন্ট কারখানাতেও অনেক পানি দরকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক টন কাগজ তৈরির জন্য প্রয়োজন ৯০,৯২০ লিটার পানি। আবার এক টন ইস্পাত তৈরির কাজে দরকার ৪৫,৫০০ লিটার পানি।

ভূগর্ভস্থ পানি ক্রমান্বয়ে বেশি পরিমাণে কলকারখানা ও নির্মাণ কাজে ব্যবহারের দরুন এ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের অগভীর স্তরের সুপেয় পানি জমা হচ্ছে না। অগভীর স্তরে পানি না জমা হওয়াতে বহু জায়গায় সুপেয় পানির অভাবে মানুষের কষ্ট হচ্ছে।

জনসংখ্যা দ্রুত অপরিকল্পিত বৃদ্ধির পরিণাম

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার ও কৃষকদের যে সকল প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য উন্নত ধরনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে সে সম্বন্ধে তোমরা পড়েছ। এ সকল ব্যবস্থার ভাল মন্দ উভয় দিকই আছে। এ সবার ভাল দিক হল যে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধীরে ধীরে অর্জন করতে পারছি। এর খারাপ দিক হচ্ছে যে, কীটনাশক ও সার ব্যবহার, খাল বিল ও অন্যান্য উঁচু নিচু সকল জমি চাষের আওতায় আনা, সেচ কাজের জন্য ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার এ সবার দরুন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। গো-খাদ্যের জন্য রক্ষিত ভূমি এখন খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে গো-খাদ্যের প্রকট অভাব দেখা যাচ্ছে।

পানি সঁচে খাল-বিল শুকিয়ে ফেলার দরুন এবং কীটনাশক ও সার ব্যবহার করায় মাছের বাসভূমি ও পোনা দেবার স্থান নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সরবরাহ কমে যাওয়াতে আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ও বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য স্থাপিত কলকারখানায় ভূগর্ভস্থ পানি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার দরুন পানি স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে পানির স্বাভাবিক সরবরাহ কমে যাচ্ছে। অনেক স্থানে পানির অগভীর স্তর বেশি নিচে নেমে যাওয়ার দরুন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের আর্দ্রতা খুবই কমে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি এভাবে শুকিয়ে যাবার কারণে পানির অভাবে গাছপালা জন্মানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় গাছপালা না জন্মানোর দরুন বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। আবহাওয়া শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গাছপালাহীন জায়গায় মরুভূমির মত অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

জনমিতির মৌলিক ধারণা

একটি দেশে নারী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ বণিতা যত লোক বাস করে তাদের সমষ্টিকেই বলা হয় ঐ দেশের জনসংখ্যা। পৃথিবীর সকল দেশের জনসংখ্যার সমষ্টিই হল বিশ্ব জনসংখ্যা। সময়ের সাথে বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা ৬০০ কোটিরও বেশি। কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি কোনো দেশে কম। কাজেই জনসংখ্যা কোনো স্থিতিশীল সংখ্যা নয়, বরং এটি একটি গতিশীল ধারণা। মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তরের কারণেই একটি দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য বিশ্ব জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিতে দেশান্তরের কোনো প্রভাব নেই। বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার তারতম্যই জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির প্রধান কারণ। জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি একটি দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন গঠন বৈশিষ্ট্য জানা আবশ্যিক। বিজ্ঞানের যে শাখা জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় জনমিতি।

স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার

সাধারণত স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহারের পার্থক্য থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়।

$$\text{সূত্র : স্থূল জন্মহার} = \frac{B}{P} \times 1000 \quad \text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{D}{P} \times 1000$$

এখানে, $B = 1$ বছরে জীবন্ত জন্মগ্রহণ করেছে এ রকম শিশুর সংখ্যা।

$D = 1$ বছরে মৃত্যুবরণ করেছে এমন জনসংখ্যা

$P =$ বছরের মধ্যে সময়ের জনসংখ্যা

জনমিতিতে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার প্রতি হাজারে হিসাব করা হয়। তাই মোট জনসংখ্যার সাথে জন্ম সংখ্যার ও মৃত্যুসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হিসাব করা হয় প্রতি শতে। তাই স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহারের বিয়োগফলকে ১০ দ্বারা ভাগ করে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়।

$$\text{স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার} = \frac{\text{স্থূল জন্মহার} - \text{স্থূল মৃত্যুহার}}{10}$$

স্থূল জন্মহার ও মৃত্যুহার নির্ণয় না করে সরাসরি জন্ম-মৃত্যু সংখ্যা থেকেও স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার নির্ণয় করা যায়;

$$\text{স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার} = \frac{B - D}{P} \times 100$$

অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষ, বিধবা নারী ও বৃদ্ধ দম্পতি সাধারণত জনসংখ্যায় কোনো প্রভাব রাখার কথা নয়। কিন্তু জন্মহার নির্ণয়ে তাদেরকেও হিসাবে ধরা হয় বলে জন্মহারে স্থূল বিশেষণটি যোগ করা হয়। অপরদিকে সকল বয়সের লোকের মৃত্যুহার সমান নয়। বয়সভিত্তিক শ্রেণীর মৃত্যুহার নির্ণয় না করে সব বয়সের লোকদের একই রূপ মৃত্যুহার বিবেচনা করে মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় বলে তাকে স্থূল মৃত্যুহার বলা হয়। জন্ম মৃত্যু ছাড়া দেশান্তরের কারণেও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এটিকে বিবেচনায় না নিয়ে স্বাভাবিক জন্ম মৃত্যু সংখ্যা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয় বলে তাকে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলা হয়।

উদাহরণ - ১

বাংলাদেশের কোনো গ্রামে কোনো এক বছরে জন্ম গ্রহণকারী মোট জীবন্ত শিশুর সংখ্যা ২০৭। ঐ গ্রামে ঐ বছরের মধ্য সময়ের জনসংখ্যা ৬০০০। স্থূল জন্মহার কত?

সমাধান

$$\text{এখানে, } B = ২০৭$$

$$P = ৬০০০$$

$$\begin{aligned}\text{অতএব, স্থূল জন্মহার} &= \frac{B}{P} \times ১০০০ \\ &= \frac{২০৭}{৬০০০} \times ১০০০ \\ &= ৩৪.৫ \text{ জন}\end{aligned}$$

উদাহরণ - ২

বাংলাদেশের কোনো একটি অঞ্চলে এক বছরে ৩৩৫ জন লোক মৃত্যুবরণ করে। ঐ বছরের মধ্য সময়ের সেই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ২৫,০০০ জন। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় কর।

সমাধান

$$\text{এখানে, } D = ৩৩৫,$$

$$P = ২৫০০০$$

$$\begin{aligned}\text{অতএব, স্থূল মৃত্যুহার} &= \frac{D}{P} \times ১০০০ \\ &= \frac{৩৩৫}{২৫০০০} \times ১০০০ \\ &= ১৩.৪ \text{ জন।}\end{aligned}$$

উদাহরণ - ৩

বাংলাদেশের কোনো একটি অঞ্চলের কোনো বছরের মধ্য সময়ের জনসংখ্যা ৫০,০০০ জন। ঐ অঞ্চলে ঐ বছর ১৭২৫ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ৬৭০ জন লোক মারা যায়। স্থূল জন্মহার এবং স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় কর।

সমাধান

$$\text{এখানে, } B = ১৭২৫$$

$$P = ৫০,০০০$$

$$\begin{aligned}\text{অতএব, স্থূল জন্মহার} &= \frac{B}{P} \times ১০০০ \\ &= \frac{১৭২৫}{৫০০০০} \times ১০০০ \\ &= ৩৪.৫\end{aligned}$$

$$\text{এখানে, } D = ৬৭০$$

$$\therefore \text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{D}{P} \times ১০০০ = \frac{৬৭০}{৫০০০০} \times ১০০০ = ১৩.৪$$

$$\begin{aligned}
\text{স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} &= \frac{\text{স্থূল জন্মহার} - \text{স্থূল মৃত্যুহার}}{10} \\
&= \frac{38.5 - 17.8}{10} \\
&= \frac{20.7}{10} \\
&= 2.07 \text{ জন}
\end{aligned}$$

(জনমিতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বুঝাতে সর্বদা % চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না।)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ভূগর্ভস্থ পানি সেচ কাজে ও কলকারখানায় বেশি ব্যবহার করার ফলে নিচের কোনটি ঘটবে?
 - প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে
 - সেচের জমিতে লবণাক্ত হতে পারে
 - ভবিষ্যতে অগভীর নলকূপে পানি পাওয়া যাবে না
 - প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা কম
- অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে -
 - গো খাদ্যের প্রকট অভাব দেখা দেবে
 - আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি হবে
 - পৃথিবী পৃষ্ঠের আদ্রতা বেড়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
- স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় প্রতি -

ক. ১ জনে	খ. ১০০ জনে
গ. ১,০০০ জনে	ঘ. ১০, ০০০ জনে
 - স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিসাব করা হয় প্রতি-

ক. ১ জনে	খ. ১০০ জনে
গ. ১,০০০ জনে	ঘ. ১০, ০০০ জনে

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১% হলে এ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময়

ক. ৫০ বছর

খ. ৭০ বছর

গ. ৭৫ বছর

ঘ. ১০০ বছর

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি গ্রামের কোনো এক বছরের মধ্য সময়ে জনসংখ্যা ১৮০০ জন। এই গ্রামে এক বছরে ৯০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ৮০ জন মারা যায়।

৬. গ্রামটির স্থূল জন্মহার -

ক. ৪৮ জন

খ. ৫০ জন

গ. ৫২ জন

ঘ. ৫৩ জন

৭. গ্রামটিতে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

ক. ৪৪.৪৪

খ. ৪৫.০০

গ. ৪৫.২৩

ঘ. ৪৬.০০

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. চাঁন মিয়ার নিমতলী গ্রামে ২০ বৎসর আগে লোকসংখ্যা ছিল ১,৭০০ জন। বর্তমানে এ গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,২০০ জন। তার গ্রামে এ বছর ২৮০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ৭০ জন লোক মারা যায়। ইদানিং তার গ্রামে ফসলি জমিতে বসত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এছাড়া গ্রামে অভাব অনটনও বেড়ে যাচ্ছে।

ক. জনসংখ্যা কী?

খ. ফসলি জমি কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ঐ গ্রামটির জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কত?

ঘ. ৪০ বৎসর পরে চাঁন মিয়ার গ্রামের অবস্থা কেমন হবে-মূল্যায়ন কর।

২. শিক্ষিত কাশেম উত্তরাধিকার সূত্রে তেমন কোনো জমি পায়নি। গ্রামে কোনো কাজ নেই। কাশেম শহরে আসে। কাশেম লক্ষ করল প্রতিদিন প্রচুর শাক সবজি গ্রাম হতে শহরে আসে এবং উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। কাশেম গ্রামে ফিরে যায় এবং স্থানীয় কৃষি সুপারভাইজারের সাথে পরামর্শ করে। সুপারভাইজার অপরিবর্তিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সৃষ্ট সমস্যার কথা বলেন এবং কাশেমকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। কাশেম বাড়ির আজিনায় শাকসবজির চাষ করে এবং অল্পদিনে স্বাবলম্বী হয়। কাশেমকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেক যুবক স্বাবলম্বী হয়।

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়?

খ. কাশেমের শহরে আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কাশেম কেন আবার গ্রামে ফিরে গেল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্বাবলম্বী হবার জন্য কাশেমের উদ্যোগকে মূল্যায়ন কর।



পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা